B3878



vissenser almungsis

ভিৰেশী প্লকাশ্ব ২ খামাচরণ দে শুটি, কলিকাভা-১২

প্রথম সংস্করণ: চৈত্র, ১৩৬৪ বিতীয় মূলণ: ভাক্র, ১৩৬৫ তৃতীয় সংস্করণ: মাঘ, ১৩৬৫

প্রকাশক শ্রীকানাইলাল সরকার ২ খ্যামাচরণ দে দ্রুটি কলিকাতা ১২

RR L-25.880

মুদ্রাকর

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বস্থ
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩০১, মোহনবাগান লেন
কলিকাতা ৪

ব্লক ও প্ৰচ্ছদ মুদ্ৰণ বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি ২১৩ কৰ্ম ওয়ালিস ফ্ৰীট কলিকাতা ৬

বাঁধাই তৈছুর স্বালি মিঞা স্যাণ্ড ব্রাদার্স

প্ৰচ্ছদ-সজ্জা

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL

प्यार्थन् प्रख WEST BENG CALCUTTA.

দাম সাত টাকা ৮. ২ . ৬০

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র পরমমিত্রবরেযু

দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৪

প্রচ্চদপটে

শ্রীত্মজিত ঘোষের সৌজন্তে অষ্টাদশ শতান্দীর একটি প্রাচীন কাংড়া চিত্র এবং নামপত্রে উনবিংশ শতান্দীর কালীঘাটের একটি প্রাচীন পট ব্যবহৃত হইয়াছে।

আঠারো শতকের তৃতীর দশক তথন শেষ হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে মুথল আমল। স্থবে বাংলা-বিহার-উড়িক্সার রাজধানী মুরশিদাবাদ; একাধারে দেওয়ান ও স্থবাদার 'মতোমন্ উল্ মূল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর থা নসিরী নাসির জঙ্গ মুরশিদকুলী খাঁ' তখন বাংলা-বিহার-উড়িয়ায় এক অনাম্বাদিত্র-পূর্ব শাস্তি ও শৃত্থলা স্থাপন করে সভা বিগত হয়েছেন। বাংলার মসলীকৈ তথন সন্থ বসেছেন জাকর থাঁর একমাত্র জামাতা স্থজাউন্দীন্—'মতোমন্ উল্ মূল্ক স্থলাউন্দীন বাহাদ্র আসদ্ **অক'**। রাজা সীতারাম রায় থেকে ওঞ করে বাংলার সমস্ত জমিদারের সামস্ততান্ত্রিক স্বাধীনতা দমন করে তাঁদের ঘোড়ার মত মুথে লাগাম পরিয়ে হ্রবে বাংলার রথে জুড়ে বাংলার নবাবী তথন জনুসের বাত্তির শোভাষাত্রার মত চলেছে। দেশে তথন নিরঙ্গুশ শাস্তি—চোর-ডাকাতেরা দিনের বেলায় সাপের মত লুকিয়েছে; ডাকাড ধরা পড়লে তাকে ছভাগে ভাগ করে চিরে পথের ধারের গাছের ভালে ঝুলিয়ে দেওর। হয়। রাত্রিকালেও পথের ধারে গাছের তলাফ স্লাস্ত পথিক নিশ্চিত্ত মনে নিজা যায়। মুরশিদাবাদ শহরে তথন টাকায় পাঁচ মন চাল। খাভদামগ্রীর বাজার-দর বাঁধা। কোন ব্যবদারী বাঁধা-দরের উপর দর চড়িরে লাভ করতে চেষ্টা করলে ধরা পড়তে দেরি হয় না, তাকে গাধার পিঠে চড়িরে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে আনা হর। দে-আমলের ইতিহাদের কেতাবে পাওয়া যায় যে, মালে এক টাকা আয় হলে একজন লোক ছ বেলা পেট পুরে পোলাও-কালিরা খেতে পারত। ১৭২৬/২৭ খ্রীষ্টান্ধ-মাত্র তিবিশ বছর পর পলাশীর যুদ্ধ; কিন্তু তখনই বোধ কবি হুবে বাংলার মূসলমান

নবাবশাহার ওজ্জলতম জোলুসের আসর। বোধ কার বেলোয়ারা কাচের ঝাড়লঠনে সামদানে বাতিগুলি নেববার আগে শেষবারের মত উজ্জল। হরে উঠেছে।

়ি জিলা বীরভূমে অজয় নদীর ধারে গঞ্জ ইলামবাজার। বড় জমজমাট গঞ্জ তথন ইলামবাজার। ইলামবাজার থেকে পশ্চিমে জহুবাজার, উত্তরে স্থবাজার পর্যস্থ নিয়ে একনাগাড় এক মন্ত জমজমাট গঞ্জ।

দেশ তথন সমৃদ্ধ। বর্গীর হাকামা তথনও বছর বিশেক দ্রে। ব্লব্ল কি টিয়াপাধিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ধান খেয়ে গ্রেজ্বও লোকে খাজনা দেবার জন্তে ভাবে না। দেশে তথন অনাবৃষ্টিও ছিল না। বৃদ্ধও না। বাংলা দেশের ক্ষেতে তথন শহ্মের সমারোহ; থামারে খামারে ধানের বাধার, ছোলা-মুস্থরের বাধার, ভাঁড়ারে জালার জালার গুর্ড মজুদ। ঢাকার মসলিন, ব্রশিদাবাদ-বিষ্ণুপুরে রেশম, গ্রামে গ্রামে আটপৌরে কাপড়ের তাঁত চলে ভোর ভাকে সদ্ধে পর্যন্ত। ফিরিলীরা এ দেশে এসেছে, বসেছে, কিন্তু তার ভিত পোক্ত হতে পারে নি।

আজকাল ইলামবাজারে যে ইংরেজ-কুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তার
কথা কেউ তথন স্বপ্নও দেখত না; ওধু কথনও-সখনও ত্-একখানা নৌকে
এনে লাগত; তার উপর থেকে ত্-চারজন আশ্চর্য সাদা রঙের মাহুহ
এনে নেমে ত্র্বোধ্য ভাষায় কথা বলত। এখানকার মাল নিয়ে চলে
যেত। ওদের বলত ফিরিকী। তাদের কারবার ছিল তুলোর আর
কাপডের।

তাঁতের কারবারে ইলামবাজ্ঞাবের তুলোর বাজ্ঞার তথন মন্ত বড় মোকাম বেন-দেন চলে হাজার হাজার টাকার। তার সঙ্গে আশপাশের চারীদের বঙ্গের পলুর চাবের রেশমের কারবারও কিছু ছিল। কিন্তু ইলামবাজ্ঞারে সবচেট বঙ্গু কারবার লাক্ষার। অজয়ের কুলের কুলগাছ আর পলাশগাছে লায়ে চার চরুত। লা থেকে রঙ আলতা গালা তৈরী হয়ে চালান যেত দিই পর্বস্ত। এখানকার গালার কদর ছিল খুব। মুরশিদাবাদের দরবারে রে গালার উপর মোহর ছাণ দিরে গোপনীয় পত্র পাঠানো হত সে গালা ছি ইলামবালারের। নবাব ফ্লাউদ্বিনের রঙমহল চেহেলসভূনে যে সব গালা जानवाद एकमा हिन, विनामस्यक कत्रवादारंग भागात यः विद्वार्धे . यस जनक्र পাছটি ছিল, যার সর্ল পত্রপল্লবের বুস্তে বুস্তে ছিল লাল ফুল আন টোপা টোপা हनूम कन अवः यात्र छेभत्र अक बाँक काला कुठकूरक सोठ्छेक्न भूमें शिक्ष महारवत শাকাবের রাঙা চোথ আর প্রবাল রঙের ঠোঁট নিয়ে বসে ছিল. যার ভারিফ নাকি দিল্লী-দরবারের আমীরেরা এসেও করে যেতেন, দে গাছটি ইলামবাজারের शांना पिरा এथानकात्र कांत्रिशस्त्रताष्ट्रे रेजित करबिक्न । मुश्चपादारपत्र नवारवत्र রঙমহল থেকে আমীর-ওমরাহ-রাজা-জমিদার-বাজির মেয়েরা দে সময় পুরুজা ভেঙে নিতাই যে নতুন গালার চুড়ি পরতেন্য ছড়োরা চুড়ির পাশেও যে চুড়ি ष्ट्रजात हात मान्छ ना, त्म हृष्ट्रिश हिन हेनामवाक्रीरंजक्र , सुत्रशिनाबारात তওয়াএফ বাইজী কদবীদের হাতে যে একহাত করে সালার টুটি বাহরে দিত সেও তাই। তার সঙ্গে তার গড়ন-রঙ-ডঙের' দিত্যই ছিল পরিবর্তন। **७** मित्क रेनामराजात्वत कात्रिशतरान्त्र त्यमन हिन कात्रिशतित्र अत्नम 🕌 ছিল নিত্য নৃতন ঢঙ আবিষ্ণারের উপযুক্ত সাফা মগন্ধ। নবাব-বাদ দরবারে খেলাতের ফর্দে বড় বড় বাড়ির কুট্মিতার তব্তজাসের দকার ম ইলামবাজারী গালার জিনিস কিছু-না-কিছু না-থাকলে চলতই না। খঞ্চ নবাৰ আমীর শেঠই নর, গালার তৈরী থালার উপর,কল ছুল, আরু পুরুরে কল- আম জাম কাঁঠাল এসব সচ্চল গৃহত্তের হারে মা:ধার্মলে ভার্মের মান্ত ছুঁতরুঁত कत्रछ । हेनामराजारतत्र राजारत अत्र कन्नहे हिन क्ष-'श्रतिकारित उन्नेगानानि । चात्रक वनक, हेनायबाजात नम्, अटनसराजात हे स्मान सम्बद्धी हेनायवाचारत সেদিন অমাবস্থার ভোরবেলা।

ফান্তন মাসের বিতীয় সপ্তাহের প্রথম সোমবার। সোমবার অমাবস্তা।
শিব-চতুর্দশীর পরদিন মৌনী অমাবস্তা। পঞ্জিকার নির্দেশ আছে মন্তরা ও
বন্দরসান। এই রাজিতে গলাসানে অক্সপুণা। রাজি-প্রভাতে অসপক্ষের
প্রতিপদে আরম্ভ হবে মাধবপক্ষ, পক্ষের পূর্ণতিথি পূর্ণিমার নামরের ক্রতের
থলা, হোলি উৎসব, আবীরে রঙে ক্রমকুমে পৃথিবী সেইটা ইন্তেই ক্রান্তর,
নাধবীলতার কোমল সব্জ শাথাপ্রগুলির গ্রন্থিতে অন্তিতে ক্রিনেই ক্রান্তর
ক্রম্প্র মাধবীপুলা ভবকে ভবকে কৃটে উঠবে। সৌরীপজির ক্রমের্টনাই ক্রম্প্র

লে পলাশের কোটা শেব হরেছে শিব-চতুর্দশীতে, তার ঝরার পালা শুক্ল
আন্ধ থেকে। রাঙা পলাশ শুকিরে রঙে পরিণত হবে, তারই কণা উড়িয়ে
বাতাস থেলবে হোলি। সংকল্প করে যারা মাধবার্চনা করবে তারা এই
আমাবস্তার রাজিতে স্থান করে ঝরা-পলাশ কুড়িরে বাড়ি আনবে, রোদে
শুকিয়ে গুঁড়ো করে তাই দিয়ে তৈরি করবে মাধবরঞ্জনের জন্তু রাঙা রঙ।
আবীর কুমকুম আসবে বাজার থেকে। ইলামবাজারে অজরের ঘাটে বড় বড়
নৌকা এসে লাগবে। আবীর কুমকুম বেচে তার বদলে আলতা গালার
থেলনা, চুড়ি আর তুলো বোঝাই নিয়ে ফিরবে। কাশ্মীরী জাফরান
নিয়ে আসবে পাঞ্জাবের শেখ সঞ্জাগরেরা—ইয়া ঢিলেঢালা পায়জামা, হাঁচুঝুল
পাঞ্জাবির আন্তিন, তার উপরে হাতকাটা জরির কামদার ফতুরা পরে শাহী
কোরান সব। জাফরানের সঙ্গে আনবে আতর। বড় বড় গদির মালিকেরা,
স্মিদারেরা আতর কিনবে; তাদের হোলিতে আবীরের সঙ্গে আতর না
চলে না। পাঞ্জাবীরা আরও পণ্য আনে, ঘোড়া আনে। জমিদারব্যবসাদারেরা কেনে সে সব।

আকাশের পূর্বকোণে শুক্তারা দপদপ করছে তথনও; অমাবস্থার অন্ধনার শীবে কিকে হতে শুক্ত করেছে, রাত্রির নিরুম থমথমানি এখনও কাটে নি। শাধিরা সবে একবার ডাক দিরে আবার ডাকি-ডাকি করছে; বাজারের গালার কারখানার চুলীর ছাই কাড়া—অর্থাৎ পরিকার করা তথনও পর্যস্ত শুক্ত হয় নি; এরই মধ্যে সেদিন মৌনী অমাবস্থার মন্বস্তরা-স্থান উপলক্ষ্যে বাজারের ঘরে মাড়া পড়ে গেছে। কাল থেকে মাধবার্চনা পক্ষ। আজ স্থান না করলে চলে? দোল-পূর্ণিমা হোলি-উৎসব। ভগবান বিফ্র ঘাদশ মাসে ঘাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ বাত্রা দোলবাত্রা। ঘাপরের কানহাইমালালের ব্রন্ধনীলার শ্রেষ্ঠ লীলা দোললীলা; ভারতের বসন্তোৎসব হোলি; বাংলার প্রাণ্টেতক্ত শচীনন্দন ক্ষাপ্রস্তর জন্মভিথি। হোলি-উৎসবের প্রস্তৃতির জন্ত প্রথম স্থান।

প্রের দিন ধরে এখন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত কলায় কলায় উল্লাস আনন্দ শুংসব বাড়তে থাকবে। বালফু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, বালিকা থেকে বৃদ্ধা শুক্ষি। রঙ পিচকারি থেকে কাদা আলকান্তরা পর্যন্ত। সরঞ্জাম সংস্থৃহীত শুক্ষা। শুরুবত থেকে ক্ষুরা পর্যন্ত। ভগ্নানের জন্ত নৈবেল্ড থেকে নেশার মূখের স্বাদের জন্ম নানাবিধ স্থুল ও তীব্রস্বাদী আহার্য পর্যন্ত । নামগান ক্রতনগান থেকে বাঈজী-কসবী, থেমটা-কুমুর পর্যন্ত ।

দেশের জীবনের শুধু এইখানটিতে সর্বনাশের সংকেত পরিক্ষৃট হরে উঠেছে। জীবনে পচ ধরেছে; একটু অবহিত হলেই তার গজে অস্তরাত্মা শিউরে ওঠে। কিন্তু সে দিকে অবহিত হবার মত দৃষ্টির স্বচ্ছতাও নেই কারও।

বাংলা দেশে মহাপ্রভুর যে বৈশুবধর্ম মহাপ্লাবন এনেছিল, জীবনকে সাগর-সঙ্গমের মহাতীর্থে পৌছে দিয়েছিল, সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজে এসেছে, ফলে দেশ-জীবনের অবস্থা হয়েছে বিলের মুক্ত। মাছেরা যেমন এ ক্ষেত্রে সাগরসঙ্গমে পৌছতে পারে না, সাগরের স্থাদ পায় না—বিলের জলতলেই চক্রাকারে পাক খেয়ে উছল মেরে অসীমের সীমা ও অতলের তল পাওয়ার ল্রান্ত আস্থাদে বিভোর থাকে—মাহ্মষেরাও তেমনি আচার-আচরণপালনের মধ্যেই পরম-প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। বিলের জলেন নিক্ষিপ্ত গৃহস্থের উচ্ছিট বাঞ্জনের লবণের স্থাদেই যেমন বিলের মাছের সক্ষ্মিজনের আস্থাদ বলে ল্রম হয়—মাহ্মযেরও ঠিক সেই অবস্থা।

স্থান। স্থান। অক্ষর-স্থান। ইলামবাজারের প্রান্তদেশে অজয়; জোশ তিনেক দ্রে শ্রীমন্ জয়দেব গোস্থামীর শ্রীপাট কেন্দুলী। কেন্দুলী পর্বন্ত অজয় নদ গলা-মহিমার মহিমারিত; পৌষ-সংক্রান্তিতে, মকরবাহিনী নাকি উজ্ঞান বেয়ে কাটোরা থেকে কেন্দুলী ঘাট পর্যন্ত আসেন; এই ম্বাট পর্যন্ত অজয়-স্থানে গলা-স্থানের পুণ্য হয়; সেই বিশ্বাসে দলে দলে স্থানার্থীরা স্থানপুণ্য সঞ্চরের জন্ম জেগে উঠেছে সেদিন।

— ওদিকে নয়। এইদিকে। আরও খানিকটা নীচে ঘাই চল্। লোক থৈ-থৈ করছে ওদিকে। এদিকটা নিরিবিলি হবে। কী ? দাঁড়ালি বে?

— হঁ! অভিযোগের স্থরে হঁ বলে স্থর টানলে মোহিনী। অভিযোগের সঙ্গে আবদার: হঁ, ঘাটের বাজারে গালার চুড়ি পরব যে!

মা আর মেরে। কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমোহিনী। সংক্ষেপে দাসী আর মোহিনী। জন্মবাজার ও ইলামবাজারের ক্যাড়ানেড়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদারের একটি বড় আখড়ার অধিকারিণী। কিন্তু লোকে চুপি চুপি বলে বৈষ্ণবী নটী। কথাটা

পরিকার হল না। ছিল ওরা বৈষ্ণবী। মা ক্রফদাসী তরুণ বরুসে নামের দলের দলে নামগান গেরে বেড়াত; ক্রমে ইলামবাজারের ঐশর্যের মোহে चाक नि इद्य मां फ़िल्डिक्ट । ज्य भूदा नि नन्न, निभाषात्र वाम करत ना, নটীর সাজে সাজে না, বৈষ্ণবীর মত তিলক কাটে, চূড়া বেঁধে চুলও বাঁধে, তুই বাজারের বাজার-এলাকার বাইরে একটি শাস্ত বৈঞ্ব-পলীতে আথড়াতেই বাস করে; সেখানে প্রভুর সৈবাও আছে। তবে এ সমন্তের আড়ালে এদের আর-একটি রূপ আছে। সেটি নটার রূপ। অনেককাল পর্যন্ত সেটি সাধারণ্যে অপ্রকাশ ছিল। কিন্তু কুফ্ট্দাসীর আখড়ার চারিদিক পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকা সছেও সে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পাঁচিল পার হয়ে বাতাসে ভেসে এসেছে মুরশিদাবাদী জদার গন্ধের সঙ্গে দামী আতরের গন্ধ। আরও ভেসে এদেছে অনেক-কিছু, যা নাকি কানাকানি করে প্রায় ঘরে ঘরেই ছড়িয়ে দিয়েছে, কুফুদাসীদের স্বরূপের ব্যাখ্যা। তাতে কুফ্দাসীর কোন অনুশোচনা নেই; কিছ লজা বা শলা ছইয়ের একটা, হয়তো বা ছটোই এখনও আছে। তার কারণ সে হল এ অঞ্লের আথড়াধারী বৈরাগী বাউলদের শীর্ষস্থানীয় সিদ্ধসাধক প্রেমদাস বাবাজীর আথড়ার উত্তরাধিকারিণী। তার থেতাব হল—মা-জী। শার্থড়ায় প্রেমদাসের সিদ্ধাসন আছে; তাঁর প্রতিষ্ঠা-করা মহাপ্রভুর দারু-বিগ্রহ আছে। সেই কারণে সে অত্যন্ত সাবধানে থাকে। কোন গদিওয়ালা ধদীর বাড়িতে যথন সে যায় তখন যায় অত্যন্ত গোপনে। যায় তুলিতে, সঙ্গে লোক থাকে। বিরল পথে যাতায়াত করে। পথে লোকে ব্যঙ্গ করলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। বাজারের লোক দেশাস্তরের আগস্তুক হু:সাহসী मधनागद्रापत्र शिष्ट्रन धतिरा नित्न विश्वन इत्त । धरनद का कान वाधावस निर्दे, পথের মাঝখানেই এসে হাঁকবে—এ লম্বরদারনী !

তাদের সম্প্রদারের অনেককে এই অসাবধানতার জ্বন্তে গিয়ে দাঁড়াতে হরেছে বাজারে। একেবারে সম্প্রদায় থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারা। সব চেয়ে ভর তার এই মেয়ে মোহিনীকে। মোহিনীকে রুঞ্চাসী অতি সম্ভর্পণে গোপন সম্পদের মত রাখতে চায়। মেয়েকে নিয়ে তার অনেক আশা অনেক করনা; সে শুধু জানে তার মন আর জ্বানেন যিনি সব জ্বেনেও কিছু-লা-জানার ভান করে বসে আছেন; লুকিয়ে থাকেন পাথরের বিগ্রহের

মধ্যে। মোহনার দিকে কৃষ্ণদাসী তাকার আর বুকের ভিতর সেই কথার আলোড়ন ওঠে। মেরে তো নর, সাক্ষাৎ আগুনের শিখা। ঘরের দেওরালের আড়ালে কাচ-ঘেরা লঠনের ভিতরের প্রানীপুর মত ঢেকে রেখেছে তাই। ঘেরা না থাকলে এত পাথাওরালা পিঁপড়ে-ফড়িং ছুটে এসে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যে তাতে শিখাই নিবে যাবে নয়, স্ক্রিফিট হবে। সেই কারণেই বাজার পার হয়ে ইলামবাজারের সদরঘাটে যাহ্ব না কৃষ্ণদাসী। বাজারকে পিছনে রেখে মাঠ পার হয়ে শালবন-কুলবনের ভিতর দিয়ে গাঁরের ঘাটে স্নান করবে। আর মেয়ে আবদার ধরেছে ঘাটের বাজারে যাবে চুড়ি পরতে!

ভাল করে চাদরখানা গারে জড়িয়ে নিয়ে মেয়ের চাদরটাও ঠিক করে দিলে। মেয়েটার বয়স সতে পনের। তার কুড়ি বছর বয়সের সস্তান।

—চুড়ি আমি আনিয়ে দেব।

মৃত্যরে মেয়ে তেমনি অহুযোগের স্থরেই বললে, আনিয়ে দেবে! পরের আনা জিনিস বুঝি পছন্দমত হয়? দোকানে কত রকম চুড়ি—

বাধা দিয়ে মা বললে, কত রকম চুড়ি! মরণ তোমার! দোকানে স্বার সামনে লোক দেখিয়ে চুড়ি প্রবি কী? আমাদের বুঝি তাই প্রতে আছে?

- —নেই তো, এত চুড়ি পরে তুমি ডুলি চেপে যাও কেন ?
- যাই কেন? কচি খুকী নাকি তুই? সে যাই লুকিয়ে। আমরা বৈরেগী-বোষ্টুম, ফ্রাড়ানেড়ী সম্প্রদায়। আমাদের অলকার না, আভরণ না। শুধু তেলক আর মালা। বড়জোর দরবেশী ফকিরকাটী ফটিকের মালা। দশকে দেখিয়ে গালার চুড়ি পরে 'ভাবন' করতে গেলে পতিত করবে। চল্, আর কচি খুকীর মত দাঁড়িয়ে খ্যান-খ্যান করিস নে। ঝুঁঝিকি কেটে ফরসা হয়ে আসছে।

আকাশ সত্যই ফরসা হয়ে আসছে; গতি ক্রত থেকে ক্রততর হচ্ছে। দিক্চক্রবালের ওপার থেকে স্থদেবতার রথ ছুটে আসছে মৃহুর্তে মৃহুর্তে বছ যোজন পথ অতিক্রম করে। পাথিরা বাসায় বসে মুখ বাড়িয়ে কলরব করা পেন করে ছটি চারটি করে বাইরে উড়তে শুক করেছে। কাকেরা বেরিয়েছে সব চেরে আগে। পাঁচা এবং বাড়ভেরা বাসায় ফিরছে। খ্বই কাছাকাছি মাখার উপর দিরে ক্রুত কুছ-কুছ-কুছ-কুছ ডাক ডেকে উড়ে গেল একটা কোকিল। কাকে ভাড়া করেছে

মোহিনী কাকটাকে গাল किला, মর মুখপোড়া হিংস্কটে।

ক্বঞ্চাসী বললে, ওই অমনি করে তেড়ে ঠোকরাতে আসবে বাজারের যত নচ্ছারের দল। শিস কাটবে। তখন মানটা থাকবে কোথার ?

বাজারের পথে সাধারণ নটারা যখন সেজেগুজে বের হয় তখন বাজারের অবস্থাটা যে কী হয় ! মা গো ! শিস, হাসি, অশ্লীল কথা যেন হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে গড়িয়ে বেড়ায় অবক্ষম্ব পচনরসের মত । ওই বিদেশীদের ত্-একজন ত্ঃসাহসী দাঁত মেলে পথ আগলে দাঁড়ায়, হাত ধরে টানে । সাধারণ নটী-কসবীরা মূখে কাপড় দিয়ে হেসে গুপ্ত প্রশ্রের ইন্ধিত দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাই কি কুঞ্লাসীর সহু হয় ?

মেরের পিঠে ঠেলা দিয়ে ক্নফদাসী হাঁটতে শুরু করলে। রাত্রির স্নান।

আলো কুটলে হবে না। এতেই অন্তার হল। বাত স্নার নেই। পাথি
জেকেছে। পাথি ভাকলে আর রাত্রি থাকে না। 'ভাকে পাথি না ছাড়ে
বাসা, খনা বলেন সে হল উষা।' উষাকাল রাতও নয়, দিনও নয়।
পাথি বাসা ছেড়ে বাতাসে পাথা মেললেই উষা শেষ, দিন শুরু হয়ে যায়।

—চল্, চল্, পা চালিয়ে চল্ বাছা। তা বলে দেখে চলিস। দেখছিস না,
কেমন খোঁরা-খোঁরা 'কুরো' (কুরাসা) জাগছে।

কৃষ্ণদাসী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ ধরলে। চারিপাশে পাতলা শালবনের ভিতর মাঝে মাঝে থানিকটা-থানিকটা চাষের ক্ষেত্ত। তারই আলের উপর দিয়ে শালবনের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ। গঞ্জ-বাজারকে বেড় দিয়ে চলে গেছে। ওই পথ ধরে কৃষ্ণদাসী মেয়েকে নিয়ে এক নির্জন ঘাটে গিয়ে নামবে। বাঁয়ে বোলপুর স্বপুর পর্যন্ত বিস্তৃত শালবনের এলাকাটা পার হয়ে সে নিশ্চিম্ভ হবে। বনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে এই গাড়ির রান্ডাটি। ওই রান্ডায় সারিবন্দী গরুর গাড়ি চলছেই—চলছেই। ধান আর চাল, চাল আর

ধান। উত্তর দিক থেকে আসে এই ইলামবাজার জত্মবাজার গঞে। ওই পথে ঠিক এই সময়ে একটা ভয়ের সম্ভাবনা আছে! ওই পথে এই সময়ে দেখা যায় এক ঘোড়সওরারকে। রাধারমণ দাস সরকারের পাষ্ঠ বংশধর অক্রের সরকারকে। অজুর অহকার করে বৃক বাজিয়ে বলে—অজুর নেহি, হাম জুর সরকার হার। রাধারমণ সরকার ধনী ব্যবসাদার, ইলামবাজারে তার মন্ত গদি; রাধারমণের সাধনকুঞ্জে রুঞ্দাসীর যাতারাত আছে। ছেলে অক্র কুলধর্ম মানে না; সে বৈঞ্ব-বংশের ছেলে হয়েও ছুর্দান্ত মাতাল, নারীদেহের প্রতি তার প্রচণ্ড প্রলোভন এবং ক্ষচিও বিচিত্র; তার ক্ষচিতে সে নিক্ষ কালো বল্ল বর্বর-জাতীয়া মেরেদের পিছনে উন্মত্ত লালসায় ছোটে। এই বনের পথ ধরে কিছুদুর গিয়ে বাঁ দিকে বনের ভিতর তার এক বিলাসকুঞ্জ আছে, সেইখানে তার অমূচবেরা সংগ্রহ করে আনে নিত্য-নৃতন শবরী-জাতীয় যুবতী। সেই ভোগ করে এই ভোরবেলা সে ইলামবাজার ফেরে। রাধারমণ পুত্রের মতি ফেরাবার जञ মোহিনীকে চাম कृष्णांनीत काছে। এই শবরীলালসালোলুপ অক্রের বিক্বজ্বকৈ মধ্যেও বিচিত্র ব্যতিক্রমের মত ভাল লেগেছে মোহিনীকে। বাপকে সে কথা দিরেছে যে, মোহিনীকে সে যদি পরকীয়া-সাধনের সঙ্গিনী হিসেবে পার তবে দীক্ষা নিয়ে সব ব্যক্তিচার ছেড়ে দেবে। কৃঞ্চদাসী মুখে সরকারকে 'না' বলতে পারে না, কিন্তু ওই অক্রুরের হাতে মোহিনীর মত সোনার পুতলীকে তুলে দিতে পারবে না।

মোহিনীকে নিয়ে তার অনেক বাসনা, অনেক কামনা।

পথের ধারে এসে দাঁড়াল ক্বঞ্চাসী। মেয়েকে বললে, দাঁড়া। ঘন শাল-বনের মধ্য দিরে রাঙা মাটির গকর-গাড়ি-চলা কাঁচা সড়ক। কাঁয়—কাঁচ—কাঁচ শব্দে গকর গাড়ি চলেছে—ধুলো উড়ছে; লাল ধুলোর সব ঢেকে গেছে। গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে ক্বঞ্চাসী যথাসম্ভব স্থিরনিশ্চর হয়ে নিলে। না, ঘোড়ার ক্ল্রের শব্দ পাওয়া যাছে না, ঘ্র্ণির মত ধুলোর ঝড়ও আসছে না, কোন প্রমন্ত কণ্ঠের শাসনবাক্যও শোনা যাছে না। না। আসছে না অক্রের! এবার সে মেয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললে, আয়।

সড়ক রাস্তাটা পার হয়ে ওধারে জন্মলের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিশ্চিম্ভ হল

কৃষ্ণদাসী। জন্দলের একেবারে প্রান্তদেশ এখানটা। ডাইনে পড়ে রইল ইলামবাজারের বাজার। সড়কের মুখে গঞ্জের ঘাট; সামনেই একটু ডান দিকে দক্ষিণ মুখে এদেই পড়ল জন্ধরের তটভূমি। তটভূমিতে শালজনল পাতলা হয়ে গেছে; বোধ করি বালুপ্রধান জমিতে শালগাছ ভাল জন্মায় নি। নইলে অজয়ের দক্ষিণ দিকে যে শালজনল তাকে জন্দল বলা চলে না—বন বলতে হয়; বিশাল শালবন। জ্যোশের পর জ্যোশ চলে গেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে সাঁওতাল পরগনার অবণ্যভূমের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার দক্ষিণে বাদশাহী সড়ক পার হয়ে গেছে দামোদরের ধার পর্যন্ত। দামোদরের ওপারে আবার শুরু হয়েছে বন। বাঁকুড়া জেলা জুড়ে এঁকে-বেঁকে এক দিকে চলে গেছে মানভূম-হাজারিবাগের অভিমুখে, অহু দিকে চলে গেছে মেদিনীপুর হয়ে উড়িছা সীমান্ত ধরে নাগপুরের দিকে। মূল শালবন প্রকৃতপক্ষে অজয়ের দক্ষিণ দিকে। বর্ধ মান জেলার মধ্যে এপারে একটা ক্যাকড়ার মত শালবনের খানিকটা অংশ জোশ হুই-আড়াই চলে গেছে বোলপুরের ধার পর্যন্ত।

খোলা জারগার এসে রুঞ্চাসী দম নেবার জন্ম একটু দাঁড়াল। এতক্ষণে আনেকটা নিশ্চিস্ত। নবাবী শাসনে চোর-ডাকাতরা শারেন্ডা হয়েছে, দরিদ্র-লম্পটেরাও শারেন্ডা হয়েছে; কিন্তু ধনী লম্পট যারা তাদের শারেন্ডা করবে কে? তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে কে? সে নালিশ নেবেই বা কে?

অকন্মাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে ক্লফ্যদাসী।

কী থেকে কী হরে গেল! হয়তো তার জন্তে নিজের দায়িত্ব কম নয়।
কিন্তু তবু মনে হর এর উপর তার নিজের হাত ছিল না; নিজের হাত
নেই। স্রোতের মুথে ভেনে যাচ্ছে। লোকে বলছে, সাঁতার কেটে তীরে
উঠল না কেন? সাঁতার তো জানে! জানে বইকি সাঁতার। এত বড়
পাট—প্রেমদাস বাবাজীর পাট—সেই পাটের মা-জী, সাঁতার জানে বইকি! কিন্তু আশ্চর্য, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলার টান থেকে কিছুতেই
সে পাশ কাটিয়ে তীরে উঠতে পারছে না।

নিন্দা তো উঠেছে। চাপা যেন আর থাকছে না। শুধু তার খশুরের সাধনসিদ্ধ পাটের উপর শ্রদ্ধার জন্ম লোকে এখনও তাকে পতিত করতে পারে নি। উচু জাতের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈছ-কায়স্থ-সমাজের লোকেরাও-প্রকাশ্যে কোন কথা বলতে পারে না।

তারা অবশু সমাজে নগণ্য, বৈষ্ণব গোস্বামীদের চরণরেণু, জাতহারা ক্সাড়া-নেড়ী দলের বৈরাগী বৈষ্ণব। কিন্তু তবুও তার খন্তর প্রেমদাস বাবাজীর সাধক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাঁর ভাবাবেশ হত, তাঁর ভাবাবেশের সময় গোরাচাঁদের কাঁধের উত্তরীয় খনে পড়ত। বড় বড় গোস্বামীরা দেখতে আসতেন। তাঁরা বলতেন, প্রভুর অঙ্কেও কম্পন জাগে তাই এমন হয়। কেউ বলতেন, ওই উত্তরীয় দিয়ে প্রেমদাসের অঙ্গের ধুলো ঝেড়ে দিতে বলেন। কুফুদাসীর মহাস্ত প্রেমদাস বাবাজীর নিজের ছেলে নয়; স্থন্দর রূপ দেখে পোয়া নিয়েছিলেন শেষ সেবাদাসীর গুহস্থা শ্রমের ছেলেটিকে। নাম দিয়েছিলেন গোপালদাস। পাটটিই বরাবরকার শিশু আর পোশ্রের পাট। এ পাটের সেবায়েত বাবাজীদের সেবাদাসী আছে, সম্ভান নেই। অর্থাৎ সাধনেরই পাট, সংসারের হাট নয়। এখানে দেওয়া-নেওয়া আছে, কিন্তু বিকিকিনি নেই। ঘর আছে দোর আছে, কিন্তু বাঁধন নেই। বাঁধনের ডোর পাকিয়ে উঠল কৃষ্ণদাসীর কন্তা মোহিনী হতে। গোপালদাস কৃষ্ণদাসীকে নিয়ে এল সাধন-সিদনী করে; সাধনের ফুল ফল হল; বছর কয়েক যেতেই ক্লফদাসীর সস্তান হল—মোহিনী। তাতে সমাজে লক্ষা অবশ্য হয়েছিল তখন, কিন্তু এ লজা আর সে লজ্জার অনেক প্রভেদ। তারপর ক্রফদাসীর জীবনে ঘটল বিপর্যয়। বৈষ্ণব গোপালদাস দেহ রাখলে। শশুর প্রেমদাস আর শাশুড়ী রাইদাসী বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসীকে বুক দিয়ে আগলে রাখলে—তাদের সাধনভজনের भूँ जिभाग या हिन नव कृष्णनामीरक निरंत्र आथणात विश्वहरक **एनथि**रत वर्तन মৃক্তি ওইখানে, অভয় ওইখানে, উদ্ধার ওইখানে। ঘাটে বাঁধা আছে নামের তবী, উনি তার কাগুারী, পারের কডি তোমার ওই চরণে মতি।

আরও কিছু দিরে গিয়েছে খণ্ডর শাশুড়ী; দিরে গিয়েছে অনেক রোগের অনেক ওর্ধ, অনেক মস্তরতন্তর, ঝাড়ফুঁকের বিছে। লোকে বলে ডাকিনী-বিছা। ইলামবাজার অঞ্চলে ওই মূলধনে রুফদাসী মহাজন সেজে বসে আছে। তাই লোকে কেউ কিছু বলতে পারে না। এদিকে এল আর একটা স্রোত।

ইলামবাজারে জহুবাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত। গঞ্জ উঠল জেঁকে।

ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী এল মুরশিদাবাদ; সঙ্গে নজে রাঢ় অঞ্চল আবার

জাঁকল। নৌকো এল, বজরা এল, উটের সারি এল, থচ্চরের পালের পিঠে

হবেক রকমের সওদা এল, দেশ-দেশান্তর থেকে হবেক রকমের লোকজন এল,

তাদের গোঁজেলে সোনার মোহর, রূপার সিকা। তারা এসে যে বিকিকিনি

শুরু করলে সে শুধু জিনিসপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, আরও অগ্রসর হল

অনেক দূর। ইলামবাজারের গঞ্জে কসবীপাড়াটা সারা রাত্রি আলো জালিরে

রেখে আর হৈ-ছল্লোড় করে তার সাক্ষী দিচ্ছে। স্রোতটা বাইরে থেকে

যেমন এল, ভিতর থেকেও তেমনই বক্তার জলের সঙ্গে মিশবার জক্ত পুরুরের

জলেও স্রোত ধরল। এখানকার দোকানদারেরা এক পুরুষের মধ্যেই মহাজন

হরে উঠে আমেরী বিলাসে মাতল; যারা সামাক্ত সাধনভজন করত তারা

হয়ে উঠল সাধক।

পরকীয়া-সাধন কিশোরী-ভজন দেশে চলছিল, কিছ সে চলছিল গোপনে; চলছিল গুরুদের ইশারায়। সংসারে সাধনা করলেই সিদ্ধি মেলে না। শতকরা নিরেনব্বই জনই শুর হর; এবং তাই হত। কিছ তাতে শুর যারা হত তারা স্থাপও পেত লজ্জাও পেত, বুক ফাটিরে কেঁদে গোবিন্দের কাছে কামনা জানাত বেন আগামী জন্মে সিদ্ধি মেলে। টান পড়ল তাদের সম্প্রদায়ে; বিশেষ করে যারা শহর বাজার গঞ্জ এলাকায় থাকে তাদের উপর টানটা পড়ল প্রবল ভাবে। তারা গরিব, তারা ভিথারীর জাত, তারা এ টানে স্রোতের কুটোর মতই ভেসেছে। এর জন্ম অপবাদ তাদের হয়েছে। বিশেষ করে ইলাম্বাজারের এলাকার বাইরে। এই তো ক্রোশ চারেক পথ জয়দেব কেন্দুলী, গোষ-সংক্রান্ধিতে সেখানে গোটা দেশের বাউল দরবেশ ল্লাড়া নেড়ীর সমাগম হয়; সেখানে ইলামবাজারের তাদের যাওয়া ভার হয়েছে। ইলামবাজারের বৈশ্ববী শুনলে—তাদের ল্ল কুঁচকে ওঠে, কেউ বা মৃচকে হাসে, কেউবা একটু সরেও বসে।

কখনও কখনও রাগ হর রুঞ্দাসীর; নিজের উপরও হর, যারা লোভ নদখিরে তাকে তার সাধনপথ থেকে টেনে কাদার নামিরেছে তাদের উপরও হয়, ওই বাউল-বৈঞ্চবদের উপরেও হর, বিশ্বক্ষাণ্ডের উপরই হর। কখনও ঘেরা হয় ওদের উপর, ওই বাউলদের উপর, যারা সরে বসে, যারা মুখ বৈকিয়ে হাসে তাদের উপর। মরণ! সে তো সব জানে, সাধন জানে, ভজন জানে, সিদ্ধি জানে—সব জানে। সব মিছে—সব মিছে। জাত হারালে ভিথিরী; ঘর বেঁধে সে ঘর যে বাখতে না পারে সে-ই ঘর ছেড়ে হয় বৈরাগী।

—মা! ডাকলে মোহিনী।

চমক ভাঙল কৃষ্ণদাসীর: আঁগ ?

— शृव मितक मानि मिराय्ह । घाटि नाम । ऋषा छेटे याद दय !

-- 50 I

হাতথানা বাড়িয়ে দিরে মেরের হাতথানা ধরলে রুঞ্দাসী; তারপর কোন্ কৌতুকোচ্ছলতায় কে জানে, তার হাত ধরে ঠিক সমবয়সী স্থীর মত অজয়ের বালুময় ঢালু পাড় ভেঙে ছুটে নামতে লাগল; সঙ্গে সঞ্জেলি খালে হাসি। মা এবং মেরে হুজনে ঝপ করে হুটি বালিহাঁসের মত জলে এসে পড়ল।

আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

পাথির কলরবে ভরে উঠেছে ওপার এপারের বনস্থলী। শীতের শেষ, বুনো হাঁসের ঝাঁক সারারাত্রি ক্ষেতে ফসল থেয়ে কলকল শন্ধ ভূলে দহের দিকে বিলের দিকে থালের দিকে ফিরছে। মোহিনী স্নান সেরে উঠে শুকনো কাপড় পরে পলাশতলায়-তলায় ঝরা ফুল কুড়ছিল। শুকিয়ে দোলের রঙ থেলার রঙ হবে। রুফাদাসী কাপড় ছাড়ছিল। আর তাকিয়ে ছিল ওপারের শালবনের দিকে। ওই বনের ভিতর দিয়ে পথ ধরে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে পুরীর পথ। রুফাদাসী মোহিনীকে কোলে নিরেই ওই অরণ্যের ভিতর দিয়ে সড়ক ধরে মদনমোহনের বিফুপুর হয়ে ঝাড়থণ্ডের ভিতর দিয়ে জগরাথদর্শন করে এসেছে একবার। তথন মোহিনীর বাপ গোপালদাস বেঁচে ছিল, দল বেঁধে গিয়েছিল তারা। এদিকে এ-বন কেন্দুলীর ওপারের শামরূপার গড় পার হয়ে চলে গিয়েছে পাহাড়-মূলুকের দিকে। আর একবার জগরাথদর্শনে বেতে মাঝে মধ্যে তার ইচ্ছা হয় । কিছ হয় না। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হয় জগরাথের পাট-জ্বনে লুটিয়ে পড়ে মাথার বুকের সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে বাকী জীবনটা পথের ধারে বসে মহাপ্রসাদ ভিকা

করে কাটিয়ে দেয়। আর সবচেয়ে বড় বোঝা তার রূপের ডালি ওই মোহিনী, তাকেও জগৎ-নাথের চরণে নিবেদন করে দিয়ে নিশ্চিম্ভ হয়। কিছু হয় না, হয়ে ওঠে না। কেমন করে কোথা দিয়ে যে কোন্ পাকচক্র লেগে যায় তা বুঝতে পারে না।

--খাবে মা ?

মোহিনী এসে কাছে দাড়াল।

- —কী? প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পূর্বেই গন্ধ এসে তার নাকে ঢুকল।
 মহমার গন্ধ; পূর্ণপ্রশৃতি রসপরিপৃষ্ট মহয়াফুল। কৃষ্ণদাসীর বুকের ভিতরটা
 পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার গন্ধে।
 - —মহরা ?
 - হাা। কী বড় বড় আর কী হন্দর দেখ! আর কী যে মিষ্টি!

পলাশফুল কুড়তে কুড়তে মোহিনী পলাশফুলের সঙ্গে মছয়াফুল কুড়িয়েছে; আঁচল ভতি। মোহিনীর রসনা মূহুর্তে রসায়িত হয়ে উঠল; রসনার সেরসক্ষরণের সঙ্গে জগছরুদর্শনের কামনাও বোধ হয় গলে ওই রসের সঙ্গেই মিশিরে গেল। কয়েকটা মহয়াফুল তুলে নিয়ে মূথে ফেলে দিয়ে চিব্তে চিব্তে বললে, তুই কতগুলো খেলি? বেশী খেয়েছিস নাকি? আর খাসনে। বলে আবার এক মুঠো মহয়াফুল ভুলে মুখে ফেলে দিলে কৃষ্ণদাসী।

মোহিনী বললে, তবে তুমি খাচ্ছ কেন ?

- —আমাতে আর তোতে? মরণ! হেসে ফেললে মা।
- শুধু তো গা খুরবে! তা খুরুক।
- —মরণ! যা বলি তাই শোন্! বলে, শুধু তো গা ঘুরবে! মাদকেতে মেতে উঠবি। শুধু মেতে? তেতে উঠবে সারা গা। হেসে ফেললে কৃষ্ণদাসী। আবার গন্তীর হয়ে বললে, সবেরই একটা বয়েস আছে। বয়স হোক, খাবি। সে সব আচার আচরণ আছে, কত ক্রিয়াকরণ আছে, সে সব হবে।

আবার হেলে ফেললে কৃষ্ণনাসী। মন্ত্রার রস তার পাকস্থলীতে গিরে তার দেহকে মাতায় নি, তাতায় নি, কিন্তু মন তার এরই মধ্যে মেতে উঠেছে। আপন মনেই মৃচকি মৃচকি হাসতে লাগল সে।

সন্ন্যাসী বেরিরে এসে সন্থ-উদিত স্থরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন।

কৃষ্ণদাসী অবাক হয়ে গেল। কে এল এ নবীন গোসাঁই? এ অঞ্লের গোসাঁই মহান্ত সকলকেই তো সে চেনে! হোক না সে ক্রাড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের বৈরাগী বৈঞ্বী; কিন্তু সে ইলামবাজ্ঞাবের স্থাড়া-নেড়ীদের বড় আখড়ার মা-জী। তুন মি থাকলেও এখনও মহোৎসবে চব্বিশপ্রহরে নবরাত্রিতে তার ভাক আদে—তাকে যেতে হয়, তার একটা আসন হয়। তার আখড়ার মহাপ্রভু-বিগ্রহ প্রেমদাস বাবাজীর সেবাসাধনায় জীবস্থ দেবতা; সে বিগ্রহকে দেশের লোক সাধ্যসাধনা করে নিয়ে যায় চবিশপ্রহর নব-রাত্রিতে। সে সব আসরে সে যোগিনীর মত সাজ করে প্রভূর চরণতলেই বদে থাকে। যিনিই হোন, যত বড় গোসাঁই হোন, এদে তার হাত থেকেই চরণোদক নিয়ে ধয় হন। সে সকলকেই তো জানে চেনে। এ কে? এ গোসাঁই এখানকার কেউ নয়। এ তা হলে কোন দ্রাস্তরের গোস্বামী মহান্ত, নিজের মঠের ধ্বজা উড়িয়ে আসছেন জয়দেব প্রভুর পাট পরিক্রমা করতে। তীর্থযাত্রী গোস্বামী মহাস্ত; বড় স্থন্দর নবীন মহাস্ত! গৌর যেন নবকলেবর ধরে আবার অবতীর্ণ হয়েছেন পাতকী-তারণের জন্ম। প্রভাতটি আজ ভাল। দর্শন-পুণ্য হয়ে গেল। নৌকাখানা পার হয়ে যাচ্ছে। রুঞ্চাসী যাই হোক, বৈঞ্বের ঘরে তার জন্ম, বৈঞ্বের আথড়ায় সে বাস করে, সে এ গোসাঁইকে দেখে প্রণাম করতে ভুলল না। সেই তটভূমিতেই নতজায় হয়ে বলে প্রণাম করে উঠে হাত জ্বোড় করে রইল। পর-মুহুর্তে আড়চোখে মেরের দিকে তাকিরে যতথানি সে অবাক হল ততথানি সে বিরক্ত হল। মেয়ে হাঁ করে তাকিরে আছে। পলক পড়ে না। ক্বফদাসী তার হাত ধরে টানলে: মর-মর-মর। প্রণাম কর। প্রণাম কর।

মোহিনী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি নতজাত্ব হয়ে বসে মাথাটি লুটিয়ে দিলে।
কী যে হাবা মেয়ে! প্রণাম করতে গিয়ে আঁচল ছেড়ে দিয়েছে।
পলাশফুলগুলি ঝরঝর করে পড়ে গেছে মাটিতে ছড়িয়ে।

॥ বিভীয় পরিচ্ছেদ ॥

প্রেমদাস বাবাজীর আথড়ার সেদিন সকাল থেকেই অনেক ভিড়। মাধবার্চনা শুরু আজ থেকে। এই শুরুপক্ষ যোলকলার পরিপূর্ণ হওরার ক্ষণে মাটিতে চাঁদের উদর হরেছিল, আজ প্রেমদাস বাবাজীর মত সিদ্ধ সাধকের পাটে ভিড় হবে বইকি। প্রবীণ যারা তাঁরা বলেন, প্রেমদাস বাবাজী যথন নামগান ক্রতেন তখন বিগ্রহের আবেশ হত। প্রভূর কাঁধের উপর থেকে উত্তরীয় ধঙ্বে পড়ত; চোথের কোণ ঘটি চিকচিক করে উঠত।

ইলামবাজার আর জয়বাজারের মাঝথানে থানিকটা উত্তরে অজয় থেকে কিছুটা দূরে এই বাবাজী-পদ্ধীটি। অধিকাংশই মাটির বাড়ি, থড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি, মাটির মেঝে; চারিপাশ বাঁশঝাড়, নিম সজনে রাঙচিতের বেড়ার সঙ্গে জমিয়ে তুলে তারই বেড় দিয়ে ঘেরা; শাস্ত নিস্তর্ধ পদ্ধীটি; কচিৎ কোলাহল কলরব শোনা যার; মধ্যে মাঝে ত্-চারটে উচ্চ কঠে ডাক শোনা যায়: আয়, আয়, আয়—আয়—আ মঙলী—! অর্থাৎ মঙলী গয়টিকে ডাকে। নয়তো শোনা যায়: অ—রে, অ, বে—জো—! বে-জো-রে—! অর্থাৎ অ ব্রজ্বল্পত কি ব্রজ্বাস! কথনও কথনও রুঢ় কটু কঠমরে শোনা যায়: আরে ও হতছাড়া ম্থপোড়া! উচ্চকঠের এই হাকডাকগুলি পাড়াটির নিস্তর্কতা ভঙ্গ করে চারি পাশের আথড়াগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে; গাছগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, পত্রপল্পবে নাড়া জাগিয়ে অকম্মাৎ কুছ-কুছ শন্ধ তুলে ত্রন্ত কোকিল উড়ে চলে যায়; কিংবা কা-কা শন্ধ তুলে উড়ে যায় কাক। কথনও শোনা যায় গর্মর হায়া রব—বাঁধা গাইটি তার দূরে-চলে-যাওয়া বাছুয়টিকে ডাকছে। আবড়াগুলি সকাল থেকে নির্জনই থাকে; ভোরবেলা থেকেই বৈহুব

বৈষ্ণবীরা খঞ্জনি একতারা গোপীযন্ত্র নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে ভিক্ষায় বের হয়;
আথড়ায় থাকে শুধু বৃদ্ধেরা আর নিভাস্ত যারা কিশোরী বা সভ-যুবতী তারা।
বৃদ্ধেরা দাড়ির বিভাস করে আর গুল গুল করে গানের স্থরে বিলাপ করে
"ও হায় প্রেম করা আমার হল না।" যুবতীরা ঘরের পাট-কাম করে; কাঁথা
সেলাই করে, চূড়া করে চূল বাঁধে, নাকে রসকলি আঁকে। মধ্যে মাঝে কোকিল
বা পাপিয়াকে স্বর করে তাদের ডাক ডেকে ভেঙায়—কু-উ! কু-উ!
চোথ গেল! চোথ গেল! কখনও-সখনও আপন আথড়ায় আগড় বদ্ধ করে
পাশের আথড়ায় সথীর কাছে গিয়ে বিশ্বয়বিক্ষারিত চোথ তুলে বলে, শুনেছিস?

- **—की** ?
- ---মা-জীর কথা ?
- —ডুলি এসেছিল তো?
- --ই্যা। সঙ্গে পাহারা।
- —মরণ, তার আর শুনব কী ?
- —আমার কাছে শোন। কান কাছে আন্।

কানে কানে সে কী বলে। শুনে এ স্থী খিলখিল শব্দে হাসতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে যে বলে সেও শুরু করে। খিলখিল হাসির ঐকতানে চঞ্চল হয়ে ওঠে কুঞ্জগুলি। এই পর্বপার্বণের দিনে শুধু সকলেই তারা আখড়ায় থাকে; নিজেদের করণীয় নিয়মগুলি পালন করে। আজ প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় সকলেই প্রণাম করে অর্চনা করে মাধবার্চনা-গৌরাজার্চনার প্রথম দিনটি পালন করবে।

কৃষ্ণদাসী কপালে তিলক কেটে রেশমের ঝাড়া স্থতোর তৈরী কেটের কাপড় পরে প্রভূর সেবায় নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছে। আপন মনে স্তবগান। করে চলেছে।

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় শচীনন্দন!

আর-সব কথা সে ভুলেই গিয়েছে। রাধারমণ সরকারের কথা, তার ছেলে অক্রুরের কথা—সব কথা। এখন শুধু সম্মুখে আছেন প্রভু। তিনি যেন জগৎ জুড়ে বসেছেন। সে মধ্যে মধ্যে কালে। অন্থতাপে নয়, অপূর্ণ কামনার জন্ত নয়—এমনি কালে। আপনি যেন কালার সাগর উপলে ওঠে। কতজন কত

কথা বলে। বলে, এ কী করে হয়? সে ক্লফদাসী সেজ-গুলে গারে গন্ধ মেথে ভুলি চড়ে দাস-সরকারের কুঞ্জে যায় নটীর মত গান গাইতে; শুধ্ দাস-সরকার হলেও কথা ছিল না, আরও ত্-চারজন জমিদার-জ্যোতদারের বাড়ি যায়, সে এমন করে কাঁদে কেমন করে?

কেমন করে কাঁদে সে কৃষ্ণদাসীও জানে না, কিন্তু সে কাঁদে। ছটো জীবন তার যেন ছটো আলাদা ঘরের মত। ছই ঘরের মধ্যে কোন যোগ নেই। অথবা ছটো আলাদা পাত্রে সে তরল পদার্থের মত আলাদা আকার ধারণ করে।

আজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে তার স্থর কেটে যাচ্ছে।

প্রভূর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওই সকালে দেখা নবীন গোসাঁইরের মুখ মনে পড়ছে। যেন গৌরের মুখের সঙ্গে ও-মুখের কোথাও মিল আছে। সঙ্গে প্রশ্ন জাগছে—কে? ও কে? এই নবীন গোসাঁই কোথা থেকে এল?

কথাটা শুধু নিজের মনের থেকেই নয়—বাইরে থেকেও বার বার এসে হাজির হল, যারা আখড়ায় প্রণাম করতে এল তারাও কথাটা তুলে দিয়ে গেল।

শারাই দেখেছে নৌকার উপর স্থপ্রণামরত এই নবীন সন্ন্যাসীকে, তাদের সকলের মুখেই ওই এক কথা—আহা, কী দেখলাম! মরি মরি মরি! কী রূপ, কী ছটা! কে? এ সন্ন্যাসী কে?

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে চোথ মুছলে, বললে, কোন্ মায়ের ঘর আঁধার করে বৃক থালি করে পথে বেরিয়ে এল সোনার চাঁদ!

ওরই মধ্যে নিতাই দাস ভাবৃক লোক—সাধন-ভন্ধনে নিষ্ঠাবান মাল্লয়, সে বললে, মাকে না-কাঁদালে লীলা বৃঝি হয় না, বৃঝেছ না! রাম পিতৃসত্য পালনে বনে গেলেন—মা কোঁশল্যা কাঁদলেন; গোবিন্দ মথুরা এলেন—মা যশোদার চোথের জলে মাটির পৃথিবী গলে গেল। গৌর আমার পথে বেরুলেন পাতকীতারণে—শচী-মা কেঁদে সারা। জয় গৌর! জয় গোবিন্দ!

বৈষ্ণবের আখড়ায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর আলোচনা; ওদের জীবনে একটি ভার—একভারাতে একটি স্থরই বাজে, কথাবার্তা সেই স্থরেই চলে।

তক্ষণী বৈঞ্বীরা কানাকানি করে—নিতাই দাসকে অভিশাপ দিরে বললে,

মরণ, বুড়োর ভীমরতি হরেছে। শ্রীমতীর কান্না মনে পড়ল না; সাক্ষাং লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জলের কথা জিভ দিয়ে বেকল না! মর্ বুড়ো, মর্।

কৃষ্ণাসী কথা বললে না। শুধু করেকটি দীর্ঘনিখাস ফেললে, আর প্রতিবার দীর্ঘনিখাস ফেলার পর মুথ তুলে উদাস দৃষ্টিতে স্থালোকিত আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্ম চেয়ে রইল। মেয়ে মোহিনী অবাক হয়ে শুনছিল কথাগুলি।

এমন সময় এল গোপীদাস বাবাজী। বিচিত্র মাস্থব। বাউল বৈঞ্চবদের কাছে বিচিত্র নয়; কিছু সাধারণ লোকের কাছে বিচিত্র। গোপীদাস মুখে মুখে পদ রচনা করে পথে পথে একতারা বাজিয়ে গেয়ে বেড়ায়। গাইতে গাইতেই সে এল—ওই সন্ন্যাসীর কথা নিয়েই গান।

—কে এল সই নবীন সন্ন্যাসী ?

দেখে তারে, মন কি করে, পরান উদাসী !

তার হাতে নাই বাঁশী, সেজেছে নতুন দেয়াশী—

তমালতলার ধুলা ঝেড়ে, আয় গো রাধে,—যাই দেখে আসি।
গানে গোপীদাস মাতন তুলে দিলে।

ভাল ক'রে দেখ্সে মিলায়ে—

সাজ্ব বদলি দিস নে যেন যেতে ভূলায়ে—

যার না ঢাকা বাঁকা নরন—মধুমাখা অধরের হাসি।

গানের শেষে গোপীদাস বললে, অজয়ের ঘাট, বাজার হাট—সব জুড়ে এই এক
কথা মা-জী। কে ? কে এল ?

খবরটা নিয়ে এল শেষ পর্যন্ত 'কয়ো বোরেগী'। সে প্রায় সদ্ধাবেলায়। সারাটা দিনে তথন কৃষ্ণদাসী সন্ধাসীর কথা প্রান্থ বিশ্বত হয়ে বসে আছে। শুধু কৃষ্ণদাসী কেন, বৈষ্ণব-পল্লীটিতেও তথন সন্ধাসীর আলোচনা, তাকে নিয়ে প্রশ্ন তিমিত হয়ে পড়েছে। কর্মমন্ত্র সংসার, সেথানে প্রশ্ন মনে করে রাথবার অবকাশ কোথান্ন ?

বৈষ্ণব-পল্লীতে গাই তৃইবার সময় এল। উন্নূদে আঁচ পড়ল, রালা চাপল; ফাল্কন মাসের শেষ, চৈত্রে কিন্তির থাজনার তাগিদ নিয়ে জমিদারের পাইক এল; ত্-চারজন পাওনাদারও এল। এল জন-হরেক পেশোয়ারী পাঠান—গরম কাপড় মলিদা আলোয়ানের ব্যবসাদার; ধারে গত বছর গায়ের কাপড় দিয়ে গেছে, তার টাকার তাগিদে।

—এ বাবাঙ্কী, এ কোকনদাস (খোকনদাস) বৈরাগী! টাকা—টাকা—টাকা
লাও। এ—

আরও এল ত্ব-একজন কেরিওয়ালা: কেঁ-টের কাপড়!

আরও এল ছ্-চারজন বিচিত্রচরিত্রের লোক। তিলক-ফোঁটা-কাটা লোক আথড়ার বলে প্রবীণা বৈষ্ণবীদের সঙ্গে গুজ-গুজ ফুস-ফুস কথা বললে। সে কথাগুলিও বিচিত্র।

মাধবার্চনার পক্ষারন্তে পরকীরা-সাধন করবেন এখানকার অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব-মত্ত্বে দীক্ষিত ধার্মিক জনেরা। তারই সাধনসঙ্গিনী চাই। যোগাযোগ অবশ্র আগে থেকেই আছে, তবুও নিমন্ত্রণ এসেছে নৃতন করে।

কৃষ্ণদাসীর বাড়িতেও লোক এসেছে। এথানকার মন্ত গদির মালিক রমণ সরকারের ওথান থেকে। পুজো নিয়ে লোক এসেছিল; তারই সঙ্গে ইশারায় ডাকও এসেছে। সন্ধার পরই ডুলি আসবে। এর পরই তার সারা মন ওই মুখে ফিরেছে; যে-মন নিয়ে মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে ফিরে সেবায় নিযুক্ত ছিল, সেবা শেষ করতে সে-মন তৎপর হয়ে উঠল। বিগ্রহের ঘরের দরজা বন্ধ করে মন এসে বসল তার বিলাসের সাজ্বরে। যে চোথ থেকে এতক্ষণ বিগ্রহের দিকে চেয়ে জল ঝরছিল, সেথানে চঞ্চল দৃষ্টি ফুটে উঠল। কৃষ্ণদাসীর মনে রাথবার অবকাশ কোথায় ?

মনে রেখেছিল শুধু মোহিনী। সারাটা দিনই ওই সন্ন্যাসীর ছবি তার মনে মনে ভেসে বেড়িয়েছে। অপরূপ সন্ন্যাসী! আর কানের পাশে বেজেছে গোপীদাস বাবাজীর গান—

क अन महे नवीन मन्नामी ?

তাই করে। বোরেগী আসতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলে মোহিনী। করে। আর্থে কাক; কাককে এখানে 'করে।' বলে; বোধ করি বা 'কউয়া' শব্দের বঙ্গুজ্ঞ রূপ। 'করে। বোরেগী' নাম নর, আসল নাম একটা আছে, কিছু সে লোকে ভূলে গেছে। ৰাউপুলে গাঁজাখোর ভিক্ষক। কিছু ভিক্ষে সে গৃহস্থের দোরে-

দোরে ঘূরে করে না, সে বেছে বেছে গিয়ে গাঁড়ায় এ অঞ্চলে যে বাড়িতে যেদিন কোন একটা সমারোহ থাকে সেদিন সেই বাড়িতে। সে আছই হোক আর গৃহশান্তিই হোক, অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা ব্রত কি যা-কিছু হোক। ভিক্ষার বুলি তার আছে, কিন্তু দেটা পূর্ণ করার চেম্নে পেট পূর্ণ করে থেয়ে-দেয়েই দে অধিক তৃপ্ত। এ অঞ্চলে কোথায় কবে কোন সমারোহ সে সমাচার তার নথ-দর্পণে। সেই কারণে সে ভোর থাকতে উঠে বেরিন্নে পড়ে। হাঁটতে হয় হয়তো কোনদিন চার ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ; পথে যেখানে যত সমুদ্ধ বাড়ি বা ঠাকুরবাড়ি আছে—দেখানে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে, জলপান থেয়ে, গাঁজায় দম দিয়ে আবার রওনা হয়। ঠাকুরবাড়িই সে বেশী পছন্দ করে; কারণ সেখানে যা পার তা মুড়ি মুড়কি-পাটালিগুড় জলপান নয়, সে পায় বাল্যভোগের বা প্রভাতী-ভোগের প্রসাদ—ছোলাভিজে, বাতাসা, একটু ছানা, এক টুকরো আর-কিছু, কোন কোন मिन्दित इथाना পুরিও मिल् यात्र। এ গুণগুলির সঙ্গে এ অঞ্চলের লোকে কাকের গুণের সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখতে পার। আরও একটি গুণ আছে— কাকের প্রকৃতি ও গুণের সঙ্গে যার মিল নাকি প্রায় আধ্যাত্মিক। কাকেরাই নাকি বার্তা নিয়ে আসে সকলের আগে। ওরা অহাচিতভাবে বার্তা বহন করে এনে দিয়ে যায়। এটা নাকি কাকচরিত্র-পণ্ডিত থারা তাঁদের মত। বাড়িতে কাক এসে বসে কলকল করে রব করলে বুঝতে হবে, বার্তা দিয়ে যাচছে। আরও মিল আছে। কয়ো বোরেগীর গায়ের রঙ কালো, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং পা ছুখানি কাকের পাখার মতই অস্রাস্ত ও ক্রত। লোকে দেড় প্রহরে যে পর্থটা हाँ हैं। करबा বোরেগী এক প্রহর না-যেতেই দে পথ চলে যায়। মধ্যে মধ্যে করো ক্লফদাসীর আখড়ার এসে হাজির হয় এবং চেরা গলায় ডাকে--গৌর বলে কয়ো এসেছে মা-জী! এঁটো-কাঁটা যা আছে ছিটিয়ে দাও। জয় গৌর! নিতাই হে!

ওইটিই ওর সকলের দরজায় ভিক্ষার বৃলি।

সেদিন সন্ধ্যার মুখ। রুফাদাসী তথন ব্যস্ত। ঘরের সকল কাজ সেরে
নিয়েছে। প্রভুর আরতি হরে গিয়েছে। প্রস্তুত হচ্ছে সে সাধনরাত্তির জন্ত ।
দেহ-মার্জনা আছে, প্রসাধন আছে। তুধের সর এবং ময়দা মুখে মেথে ধুরেমুছে হ্লুদের-স্ক্র-চূর্ণ-বাধা মিহি কাপড়ের খুপনিটি মুখের উপর হালকাভাবে

বৃলিয়ে নিয়ে রসকলি তিলক আঁকতে হবে। চূল বাঁধা আছে। রাধারমণ দাসসরকার প্রোচ্ বৈশ্বব মাহ্মম, নটার প্রসাধন বা সজ্জা তাঁর কাছে পলাপুর মতই
আশ্বাত অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ বৈশ্ববী-বেশ না-হলে তিনি দোরগোড়া থেকেই ফিরিয়ে
দেবেন। বৈশ্ববীর বেশই তাকে এমন করে করতে হবে, যাতে স্থমা-টিপ৬৬না-চুড়ি-সমৃদ্ধ নটা বা তওরাইফই-বেশকে হার মানাতে পারে। ব্যস্ততা সেই
জ্বাত । কিন্তু কয়োর আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না। কারণ কয়ো, কাকের মত
তাড়ালেও যায় না। তাড়া দিলে কাকেরা উড়ে গিয়ে সরে বসে, মৃহুর্ত পরে
আবার আসে; কয়োও তাই, এখন তাড়ালে একটু পরই আবার ফিরে
আসবে সে, এবং হাকবে: গৌর বলে কয়ো আবার এসেছে মা-জী। জয়
গৌর! নিতাই হে!

একখানি মালপোয়া এবং মালসাভোগের কিছু একখানি পাতার সাজিয়ে আলগোছে তার হাতে দিয়ে দাসী বললে, আজ আমার তাড়া আছে করো, তুই অন্ত কোথাও বসে খেগে যা।

কয়ো পাতাথানা সামনে পেতে নিয়ে বললে, কোথায় যাব ? যেতে যেতে চিলে ছোঁ মারবে। ও-বেটাদের হাতে কয়োরও রেহাই নাই। কোথাও যাবে বুঝি ?

ক্রো নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করলে। ওর প্রশ্নে শ্লেষ নেই, দ্বণাও নেই। করোর কুৎসা রটনার প্রবৃত্তিও নেই। ও শুধু শোনে, শুধু বলে। ক্রেমে স্থাবা হংখ কিছুই অফুভব করে না বলে ও তা কাউকে করাতে চায় না।

—কোণায় যাব ?—দাসী বললে, কত কাজ, সে আর তুই ব্ঝবি কী ? সেই ভোর থেকে—

কথা কটা বলতে বলতেই চলে আসছিল রুঞ্চাদী, হঠাৎ পাশ থেকে মোহিনী প্রশ্ন করে বসল। সন্ন্যাসীর কথা করে। তো নিশ্চয় জানবে। সে বললে, হাা করে।, জয়দেবের ঘাটে আজ কোন্ গোসাই মহাস্ত এল ? মন্ত বড় নৌকো। শিগুসেবক। এই উঁচু ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডাতে গড়ড় আঁকা। খুব ধুমধাম! কে সে করে।?

মেয়ের প্রশ্ন শুনে রুঞ্চাদীও ঘুরে দাঁড়াল। তারও মনে পড়ে গেছে। করো আগেই মালপোতে কামড় মেরেছিল। বিচিত্র কয়ো, বিচিত্র তার খাওয়। সে খেতে আরম্ভ করে উলটো দিক খেকে। শাক খেকে নয়—মিটি থেকে। এঁটোকাঁটার খাওয়া তো, আগাগোড়াটা একসঙ্গেই পায়। তাই ওইভাবে খেতে অস্থবিধাও নেই। জিজেস করলে বলে, হাবজ্ব-গাবজ ঘাস-পাতা খেরে পেট ভরে গিয়ে শেষে যদি ভাল জিনিস খাবার জায়গা না থাকে! এবং চিবোয় সে চোখ বুজে। মালপোয় কামড় মেরে চিবতে চিবতে সে ঘাড় নাড়তে লাগল, উ-হঁ। উ-হঁ।

— উত্ কী? আমি নিজে চোথে দেখেছি।—ক্বফদাসীর দেরি হয়ে যাচ্ছে; জ কুঞ্চিত হল তার। একটু উষণ্যরেই সে বলে উঠল, আমি নিজে চোথে দেখেছি।

কয়ো কোঁত করে গ্রাসটা গিলে এবার বললে, ছাঁ। সে জয়দেবে নয়।

- —তবে কোথায় ?
- —কদমখণ্ডীর ঘাটের ওপারের ঘাটে।
- ওপারের ঘাটে ? ভামরূপোর ঘাটে ?
- হঁ। রাজার ছেলে কালাপাহাড়। বলে, রাধা মানি না। জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা নয়, চামুণ্ডো। ঠাকুর এনেছে শুধু শ্রাম। ওই শ্রামরূপোর ভাঙা গড়ের এক পাশে মঠ বানাবে। বোই,মী গেলে ঝাঁটা মারবে।

রুফদাসী অবাক হরে গেল। শ্রামর্মণার ভাঙা গড়ের এক পাশে মঠ বানাবে! ভাঙা মঠ জন্দলে ভতি, বুনো শুরোর সাপ-থোপের আড়ত। মধ্যে মধ্যে বাঘ আসে। ভালুকের তো কথাই নেই। এই তো ভালুকের সময়। মৌ পেকেছে, মৌ থেতে আসবে। মৌ থেরে মাতাল হয়ে ধেই-ধেই করে নাচবে। সেইখানে মঠ করবে।

জরপুরী বাবাজীদের চ্যালা নর, চামুগুো! রাজার ছেলে কালাপাহাড়! শুধু শ্রাম! রাধা নেই! কী আবোল-তাবোল বকছে করো?

অধীর হয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, অ মৃ্থপোড়া, তা চোথ খুলে কথা বল্ না কেন ? এ সব আজগুবি কথা বললে কে তোকে ?

করো কিন্তু চোথ বৃজেই থেতে থেতে বলে গেল, পাঁচজনে এক কথা হ কথা করে দশ কথা বললে—কয়ো শুনে এল। তুমি শুধাচ্ছ—বলছি। মন্ত বড় ঘরের ছেলে। হয় বামুন, নয় কায়স্থ। রাজা বাপের বেটা। খুব নাকি পণ্ডিতও বটে। কাশীতে পড়ত। তাপরেতে সরেসী হরে যায়। বাপ মরে গেল, অনেক ধন। ভাইকে সর্বস্থ দিরেছিল। এখন এই স্থকীয়াওলার। কাশীতে এলে পর জুটল তাদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই এ দেশে এয়েছিল চেলা হয়ে।—একটুকুন জল দেবা ? গলাতে জাঁটির মতন আটকায়—

চোথ খুলল কয়ে।

কৃষ্ণদাসী তথন চলে যাছে। পাঁচজনের মূথের উড়ো কথা ! ও শুনতে কৃষ্ণদাসীর প্রবৃত্তি নেই। হাঁা, কোন একটা লোকের মত লোকের কথা হত তো শুনত কৃষ্ণদাসী। উড়ো কথা আর ঝরা পাতা—ও ছইয়ে আগুন দিরে ছাই করে দিয়ো। উড়ো কথা সব মিথ্যে আর ঝরা পাতা আবর্জনা— দূর, দুর্র। কয়ো ডাকলে—মা-জী!

- ∸মরণ! কী?
- -- जन !
- —জল! বলনাম, ঘাটে খেগে যা। আমার এখন হাতজোড়া।
- স্থামি দিচ্ছি মা।— মোহিনী বলে উঠল। ছুটে ভিতরে গিয়ে জলের ঘটি হাতে স্থাবার বেরিয়ে এল সে।

কৃষ্ণদাসী ভূক কুঁচকে বললে, তা বলে ছুঁস না যেন কয়োকে। যে আঁচলের ফেঁচা তোর, উড়ছে—উড়ছে—উড়ছে। পতাকার মত ফত-ফত করে উড়ছে। সামলাস আঁচল।

কৃষ্ণদাসী বাড়িয়ে বলে নি। পানর বছরের কিশোরী মোহিনী মনেও বেমন এখন অপরিপক, দেহেও তেমনি অপরিপূর্ণ এবং অপটু। পানর বছরের কিশোরী মোহিনী এখনও হিলহিলে পাতলা; হাতের মৃঠিতে কোমর ধরতে পারার কথা প্রচলিত আছে, কিশোরীকে দেখে তাই মনে হয়। কৃষ্ণদাসীর পাটের শাড়ি পরে পুজোর কাজ করে মোহিনী, কিছু সে কাপড় মোহিনী ভাল সামলাতে পারে না। আঁচল ঝলমলে হয়ে ঝুলে পড়ে, মাটিতে লুটোয়, বাতাসে ওড়ে; কখনও কখনও পায়ের সঙ্গে কাপড়ের প্রাস্ত জড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে আছাড় থেয়ে পড়ে। মায়ের সাবধান কিছু কয়োকে ছায়াপড়ার ভয়ে। কয়ো সত্যি সভ্যিই কয়ো অর্থাৎ কাক। খাতের বাছবিচার নেই, খরেরও বিচার সে করে না; যার ঘরে ভাত আছে—দে বাজ্লাই হোক আর

চণ্ডালই হোক, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভিক্ষে সে তার ঘরেই করে। ওকে কি ছোঁয়া যায়!

কাপড় সামলে নিয়েই মোহিনী ঘটি হাতে কয়োর সামনে দাঁড়াল। করোকে মোহিনী ভালবাদে। মা না-থাকলে কয়োকে পেলে মোহিনীর সময়টা কাটে ভাল। সারা চাকলাটার থবর বলে কয়ো। শুধু থবর নয়, এ অঞ্চলের যত গল্প সব তার জানা। ওই ওপারের ইছাই ঘোষের দেউলের গল্প; ভামরূপার গড়ের গল্প; এপারে কালুডোমের ডাঙার গল্প—সব সে জানে। জয়দেবের গল্প অবশু সবারই জানা, কিছু এসব গল্প কজন জানে? তা ছাড়া দিল্লীতে বাদশা মারা গেলে কয়ো আগে থবর আনে। ম্রশিদাবাদে কোন ফরমান জারি হলে, সে থবর সর্বাত্তে পারে কয়ো।

মোহিনী এসে দাঁড়াল, কিন্তু করো তখনও চোখ বুজে রয়েছে, চিবুচ্ছে। মোহিনী বললে, জল নে কয়ো।

- —মোহিনী!—অঞ্চলি পাতলে কয়ে। খানিকটা খেরে মাথা ঝাঁকি দিরে ইশারা দিলে 'আর না।' তারপর আবার আরম্ভ করলে আহার। এবার নীরবে। কেষ্টদাসী নাই, কাকে বলবে! মালপোর শেষটুকু মুখে পুরে চোখ ছটি মুক্তিত করলে। কিন্তু মোহিনী প্রশ্ন করলে, তারপর কয়ে। ?
- —কী ?—অম্পষ্ট কথার সঙ্গে ভূক ছটি চকিতে ওপরে উঠে নীচে নামল, ঘাড়টি ঈষৎ ত্লল। অম্পষ্ট কথা ইশারায় স্পষ্ট করে তোলে কয়ো। কথা তো তাকে থেতে থেতেই কইতে হয়।
 - —ওই যে সকালের গোঁসাইয়ের কথা! কোথাকার রাজার ছেলে?
 - —কে জানে? শুনলাম রাজার ছেলে।
 - —ঘরে পরিবার ছেলেপুলে আছে ?
- —তা আছে বইকি। উন্নাই।—ঘাড় নাড়লে কয়ো: থাকলে ভাইকে রাজ্যি দেবে কেন ?—একটু চূপ করে থেকে বললে, ছিল বোধ হয়, বোধ হয় মরে গিয়েছে সব।—আবার একটু চূপ করে থেকে বললে, ভাইটা ভাল। মঠ করবার জত্যে টাকাকড়ি অনেক দিয়েছে। সম্পত্তিও দেবে। স্থামরূপোর গড়ের অংশ কিনেছে।

বলেই যায় কয়ে।, জয়পুরী পণ্ডিতেরা নবদীপে হার মেনে দন্তখত করে বাধারাণীর জয় দিয়ে জয়পুর ফিরে গেল। কিছু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এ ছেলে নাম কাটিয়ে নিজেই মত বানিয়েছে, বুরেচ!

বলে গেল অনেক কথা। শুনে এসেছে কেঁত্লীর মহাস্তের মঠে।

কদমখণ্ডীর ঘাটে নেমে পুজো ভেট অবশ্য পাঠিয়েছে, কিন্তু নিজে দর্শন করতে যার নি এই নবীন গোস্বামী। চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রণাম জানিয়ে শ্রামরূপার গড়ের ঘন অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কেন্দুলীর মহাস্ত বলেছেন—অধামিক!

মহাস্তের লোকজনেরা বলাবলি করেছে—লাগবে।

পাইকেরা লাঠি-সোঁটার ভাল করে তেল মাথিয়েছে।

হঠাৎ থেমে গেল কয়ে। তার খাওরা শেষ হয়ে গিয়েছে। বললৈ, দাও, আর-খানিক জল দাও। বেশী দিরো না। মাসলাভোগ প্যাটে গিয়ে জল পেয়ে গেঁজে উঠে ফাঁপবে। ছঁ, আর না। এই ঠাইটাতে দাও, হাত ব্লিয়ে নিই। নইলে কাল এলে মা-জী ঝাঁ-ঝাঁ করে লাগবে—একেরে বাঘিনীর মতন।

মোহিনী বললে, তারপর কয়ো?

—আর জানি না।—করো পাতাটা মুড়ে হাতে নিরে চলে গেল। করোর থাওয়া শেষ হয়েছে, আর কথা দে বলবে না। এবার হাত মুথ ধুয়ে কোথাও বসে আবার গাঁজা থাবে। তারপর শুয়ে পড়বে। তব্ও আজ্ব সে বেরিরে যাবার সময় বললে, দরজা-টরজা দাও বাপু। একলা থাকবে। কয়ো এরই মধ্যে ব্রুতে পেরেছে যে, রুফ্দাসী আজ্ব বাইরে যাবে। তার কথাবার্তার ফরে থেকে তার গা ধোয়ার জ্ঞা ব্যস্ততা থেকে সে ব্রেথ নিয়েছে। সঙ্গে মনেও পড়েছে যে আজ্ব ফান্ধনের শুক্লা-প্রতিপদ। এবং এক সময় বাড়ির বাইরে কয়েকটা শলও পেয়েছে। ব্রুতে তার বাকি থাকে নি য়ে, ওপাশে থিড়কির ভোবাটার চারিপাশে ঘন জ্লেলের মধ্যে কোথাও ভুলি নিয়ে বেহারারা এসে বসল। ওই ভুলিতেই রুফ্দাসী যাবে দাস-সরকারের ক্ঞে। মা চলে যাবে, মোহিনী একরকম একলা থাকবে।

অবশ্য ভয় এ-কালে তেমন কিছু নেই। নবাব জাফর কুলী থাঁর শাসনের

গুণে এ দেশে এখন বাঘে-বকরিতে এক ঘাটে জ্বল থার, বাজে-কব্তরে এক গাছের ভালে বসে জিরোর। কাটোরার নায়েব ফৌজদার কুড়ালিরা মহমদ জানের দাপটে চোর ভাকাত শীতের সাপের মত মৃদ নিরেছে।

তা ছাড়া, এই যে আখড়া, প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধপাট-এ হল লোহার বাসর-ঘরের চেরেও নিরাপদ। এ জায়গা মহাপ্রভুর আদেশে দৈব বলে সুরক্ষিত। এখানে মন্দ অভিপ্রায়ে কেউ রাত্রে চুকলে আর বের হতে পারে না। ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই হয় রাত্রের মত অন্ধ হয়ে বসে থাকে অথবা পশু হয়ে পড়ে থাকে; সকাল হলে ধরা পড়ে যায়। অনেকে বলে, রাত্রে এই আখডার মধ্যে অবিরাম খড়মের আওয়াজ ওঠে। যিনি এই আখডা রক্ষা করেন তিনি ঘুরে বেড়ান। এর উপর রুঞ্চাসী নিজে অনেক সিদ্ধবিভা জানে। প্রেমদাসের বৈষ্ণবী আসামের মেয়ে ছিল। ডাকিনী বিছা জানত। ক্রফদাসীকে সে বিভা সে দিয়ে গেছে। সাধনা করে ভগবান পেয়ে যে সিদ্ধি তা কেউ কাউকে দিতে পারে না, কিন্তু এ সব বিছা দেওয়া যায়। ক্লঞ্চদাসী ঘরবন্ধন জানে, অঙ্গবন্ধন জানে। যাবার আগে এক মুঠো সরষে হাতে বিভবিত্ব করে মন্ত্র পড়ে আথড়ার চারিপাশে ছভিরে দিয়ে যাবে। ওই সর্বে-গণ্ডি লঙ্ঘনের সাধ্য কারুর নেই। প্রতিটি সরবে হয়ে উঠবে এক এক সাপ. গণ্ডির ভিতর পা বাড়ালেই ফণা তুলে দংশন করবে। মন্ত্র পড়ে মোহিনীরু অঙ্গবন্ধন করে দিয়ে যাবে। সেই অঙ্গ কেউ স্পর্শ করলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে মৱে যাবে।

মোহিনী চুপিচুপি বললে, তুই থাক্ না ভাই কয়ো।

—থাকব ?—কয়ে। অবশ্য কথনও কথনও থাকে, মোহিনীকে আগলায়।

যতক্ষণ ক্ষফদাসী না আসে ততক্ষণ দাওরায় শুয়ে গল্প বলে, মোহিনী ঘরের

ভিতর জানলার ধারে শুয়ে শোনে। কৃষ্ণদাসী চলে গেলে মোহিনী কয়োকে

দরজা খুলে দের। কয়ে৷ বাড়ি এসে ঢোকে। কয়োর বাড়ি ঢোকার কোন

ব্যাঘাত হয় না। তার কারণ মোহিনীই যে ডাকে, আর কয়োর মনেও ফে
কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকে না। স্থতরাং আথড়ার দেবতাও কোনদিন ক্রন্ত্র
ম্তি ধরেন না, মন্ত্রপড়া সর্বেও সাপ হয় না। কেন হবে ? তবে কয়ো

আভাস যেন পায়। মনে মনে প্রণাম করে বলে—আমার ধর্ম আমার ঠাই,

বোসাঁই তোমার ধর্ম তোমার ঠেঞে। মেরেটা ভয় পেরেছে একরা আছে, আমি ধর্মের মুখ চেরে এসেছি আগলাতে। ভয়টয় দেখিয়ো না, অধর্ম হবে।

কৃষ্ণদাসী দাস-সরকারের কুঞ্জে গিয়েই এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলে—ওই সন্মাসীর কথা। সকালে সন্মাসী দেখার পর এসে দেবকার্যে নিযুক্ত করেছিল নিজেকে। ভূলে না-গেলেও সন্মাসীর কথা ভাববার অবকাশ হর নি; স্থযোগ হয় নি। প্রায় ভূলেই গিয়েছিল কথাটা। কিছু এই অভিসারে বের হবার পূর্ব-মুহুর্তে কয়োর কথায় তার কৌতুহল বিচিত্রভাবে প্রবলতর হয়ে উঠল।

মঠ করবে সন্ন্যাসী ওই খ্রামরূপার গড়ে ?

রাজার ছেলে সন্মাসী হরেছে ?

এই হুটো খবরই তার কৌতৃহলকে হুর্দমনীয় করে তুলতে যথেষ্ট।

রাজার ছেলে সন্থাসী! তাই এত রূপ! তাই এত গণ্ডীর! অভিসারযাত্রাপথের চঞ্চল মন একটু অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠল। দাস-সরকারের
কুঞ্জে ঢুকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে, আজ নতুন সন্থাসী কে এল সরকার
মশাই? সারা চাকলা চন-মন করে উঠেছে। ঘাটে মাঠে হাটে নাকি ওই
ছাড়া কথা নেই? কয়ো বলে—রাজার ছেলে সন্থাস নিয়ে এসেছে,
ভামরূপার গড়ের মধ্যে মঠ করবে। মঠে নাকি গুধু ভামের পুজো! রাধার
নাকি বনবাস! আমরা তো দ্রের কথা, বোষ্টমী বৈরেগিনীদের ঝাড়ু মেরে
তাড়াবে, আপনাদেরও নাকি মুখ দেখবে না!

স্থলর সাজানো ঘরে বসে দাস-সরকার তামাক থাচ্ছিলেন। স্থান্ধি কাঠগড়ার তামাক। ধোঁয়ায় মিটি গন্ধ ভূরভূর করছিল। রাঢ় অঞ্চলের মাটির দেওরাল, থড়ের চাল ঘর থড়িমাটি দিয়ে নিকানো; লখায় চওড়ায় বেশ বড় ঘর। দরজার পাশে মাথায় পটুয়ার তুলিতে আঁকা স্থলর পদা; কুলুন্দির মাথায় মাথায় ছোট ছোট আলপনা। এ ছাড়াও দেওয়ালগুলির ঠিক মাঝখানে বজলীলার এক-একটি অধ্যায় বেশ বড় বড় করে আঁকা—মানভঞ্জন, রাসলীলা, বস্তুহরণ, দোললীলা। এ সবের মাঝখানে চুকেছে মুসলমানী আমলের লতাপাতা ফুল পাথি। মেঝেট জমানো থোৱার—উপরে পদ্কচনের

পালিশ। মেঝের উপর পুরু গালিচার ফরাস। গালিচার উপর করেকটি মথমলের তাকিয়া। দেওয়ালে শৌখন দেওয়ালগিরিতে সামাদানের মধ্যে বাতি জনছে। চার দেওয়ালে আটটি দেওয়ালগিরিতে জ্বোড়া শামাদানে যোল বাতির আলোয় ঘরখানি উজ্জ্বল। তার উপর থডিমাটির কোমল শুল্র লেপনের প্রতিফলন সে উজ্জলতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বড় একথানি গালিচার আসন। তার সামনে জলছে বড় পিলম্বজের উপর বড় একটি প্রদীপ। গন্ধে বোঝা যায় প্রদীপ তেলের নয়, ঘিয়ের। আর নামানো রয়েছে রূপার রেকাবিতে নানান উপকরণ। ফুলের মালা, ফুল, চন্দন, চুয়া, পান, একটি আতরদানও নামানো রয়েছে। দাস-সরকারের কাছে নামানো একথানি চমৎকার খোল। দাস-সরকার রুঞ্চদাসীর কথায় মুখ তুলে চৌখ মেলে তাকালেন। বেশ জোর করেই তাকাতে হল যেন। চোথ ছটি বাঙা হরে উঠেছে ইতিমধ্যেই। ওঠারই কথা। সন্ধ্যার মুথেই ত্ব্ব এবং সর-সহযোগে অহিফেন সেবন হয়েছে, তার উপর এই তামাক-ছিলিমটির অব্যবহিত পূর্বেই সেবন করেছেন স্কাল থেকে গোলাপজ্ঞল-ভিজানো হরিতানন্দ একদফা। হরিতানন্দ অর্থাৎ গাঁজা। কেউ কেউ তুরিয়ানন্দও বলে। বিশ্বব্দাণ্ডের স্কল রহস্তের যবনিকা যেন ফাঁক হয়ে গেছে সরকারের চোখের সামনে। মুদক বাজিয়ে বিশ্বজ্ঞগৎ নৃত্য করতে করতে চলেছে—অপ্সরীর মত রাসমঞ্চের চারিপাশের অষ্ট্রম্থীর মত, আর রাধারমণ সরকার যেন কেন্দ্রন্ত গোবিন্দের চরণপল্নে স্থির ভ্রমরটির মত বদে আছেন।

ফরসির কাঠের নলটি ছেড়ে দিয়ে হেসে রমণ সরকার বললেন, সকালের সেই নবীন মহাস্ত ? দেখেছ না কি ?

- —দেখেছি। ভোরবেলা স্নানে গিয়েছিলাম যে !
- —দেখেছ ?
- —হাা। মরি মরি, রূপই বটে। লোকের পাগল হওয়ার দোষ নাই। রাজার ছেলে—

অকমাৎ রেগে উঠলেন দাস-সরকার। দাঁতে দাঁত টিপে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, রাজার ছেলে কৃঞ্চদাসী, ও রাজার ছেলে হলে আমিও জগৎশেঠ।

ওটা কামদেব হলে আমিও মহাদেব ! বেটা পাষ্ট ! বেটা কালাপাহাড় ! করে। ঠিক বলেছে—কালাপাহাড়ই বটে। রাধারাণীকে মানে না। বলে পরকীয়া-সাধন যদি ধর্ম হয় তবে অধর্ম কিসে ! স্থামের পাশ থেকে রাধারাণীকে সরাবে ! বাঁশীর বদলে চক্র ধরাবে ! আমাদের ঘেরা করে ! ছঁ; ওর ঘেরায় কী হয় কৃষ্ণদাসী ? আমরা ওকে ঘেরা করি । রাধে ! রাধে ! রাধে !

- —তা হলে রাজার ছেলে নয় ?
- —পক্ষ থাকলেই পক্ষী হয় না কৃষ্ণদাসী। পক্ষীর আরও লক্ষণ আছে।
 না-হলে ফড়িংকে পক্ষী বলতে হয়। এ গোসাঁইয়ের পক্ষী-লক্ষণ সবই আছে,
 তবে সবই আকারে ছোট। অর্থাৎ চড়ুইয়ের জাত। বাজপক্ষী নয়। জয়পুরের
 রাজপুরুর ভাবছ; তা নয়। রাজা-টাজা নয়। জমিদার, বড় জমিদার।
 চটক—ব্ঝলে, যাকে বলে চড়ুই। বড় জোর শালিক বলতে পারে। গাঙশালিক। গাঙের ধারে বাড়ি। বোয়েচ কিনা?—সরকার কথা বলতে
 বলতে শাস্ত হয়ে এলেন এতক্ষণে। রসিয়ে রসিয়ে শ্লেষ দিয়ে বলতে
 লাগলেন রসিকের মত।

রসিকের মত কথা বলতে গেলেই সরকার এইভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন আর মধ্যে মধ্যে বলেন 'বোয়েচ কিনা!'

—বোয়েচ কিনা, বড় জমিদার, উপাধি রায়চৌধুরী। জাতিতে ব্রাহ্মণ; বছপূর্বে পূর্বপুরুষেরা ছিল শুধু বাম্ন পণ্ডিত। পাঠান আমলে গৌড়ের স্থলতানদের কোন স্থলতানের স্থনজরে পড়ে যায়। অনুস্থার-বিসর্গের ছটা আর টিকি-নাড়ার ঘটা দেখে স্থলতান খুলী হয়ে খেলাতের সঙ্গে মোটা ব্রহ্মত্রের সনদ দেন। কিন্তু থাগের যে কলমে তালপাতার ওপর ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব উদ্যাটন করা যায়—বোয়েচ কিনা দাসী, জীবন-জমিতে ব্রহ্মতত্ত্বের চাষ করা যায়, তা দিয়ে আসল জমির একটি ঢেলাও ওলটানো যায় না। কাজেই ব্রহ্মত্রের জমি থাজনা-বিলি করে হন জ্যোতদার। তারপর বোয়েচ কিনা, জোতদার থেকে জমিদার। শিল্পসেবকদের পরলোকের কর্ণধার থেকে প্রজ্ঞাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দেবশর্মা থেকে রায়চৌধুরী। শাজ্ব-পুরাণের পুঁথিগুলি খেরোর কাপড়ে বাঁধা হয়ে, কাললোতের ঠেলার ভাঙা কুলের মাটি ঢলে

প্রভল। তার জারগায় কাপড়ের মোটা মোটা দপ্তরে থোকা জ্মাওরাশীল বাকীর কাগন্ধ বিদ্ধাপর্বতের মত বাড়তে লাগন। পুঁথিগুলি যদি একেবারে ফেলে দিত তো হত। ধুয়ে-মুছে যেত। বোয়েচ কিনা দাসী—তিত্লাউ খাওয়া যায় না—গেরন্ত-বাড়িতে ও লাউ হলে তার ফল থেকে মূল পর্যন্ত ফেলে দের। কিছু বৈরাগীর আথড়ায় হলে কি সন্ন্যাসীর আশ্রমে হলে তারা বিষ্ণুমায়ায় ফেলতে পারে না; নতুন করে না-লাগলেও তিত্ লাউ কটি পাকিরে শিকেয় টাঙিয়ে রেখে দেয়। সোনারূপোর জ্লপাত্রও লাউয়ের খোলার কমগুলুর মায়া ঘোচাতে পারে না। এও তাই আর কি! তাই থেকেই এ-বংশে মধ্যে মাঝে ত্ব-চারজন পণ্ডিত জমিদারও ফড়কে বেরিরেছে। দেশে এদের অনেক নাম কেষ্টদাসী। তবে ভক্তি-পথে পা বাড়ায় না, মেঠো পথের ধুলো-কাদার উপর অত্যন্ত অশ্রন্ধা, জ্ঞানমার্গের পাকা সভকে হাঁটার উপরেই বংশটার ঝোঁক। বোমেচ কিনা—ত্র-চারটে মহানান্তিক জন্মছে, জাবার জনকয়েক হুঁদে জমিদার, পাকাপোক্ত ভোগীও জন্মেছে। এই ছেলের বাপ ছিল তেমনি একজন ভোগী। বিবে ছিল ছটি। ছটিই ছিল ছয়োবানী। হুয়োরানী ছিল এক যবনী রক্ষিতা। এ ছাড়াও নিত্য নতুন বাঈদ্ধী-বাঈয়ের অভাব ছিল না। আর একটি জিনিসের অভাব ছিল না, সেট হল বিষরবৃদ্ধির। ष्यत्नक नित्नत्र भूत्रत्ना वःभ, ष्यानभाना ष्यत्नक, नवात्र मर्पाष्टे এই এक इंध्रत्न ; এই স্থযোগে ইনি অধিকাংশ শরিকের সম্পত্তি নানান কৌশলে কিনে, আসল গুঁড়ির মত মোটা হয়ে উঠলেন। শরিকেরা শেষ পাঁচি মারলে, যবনী রক্ষিতার অপরাধে পতিত করবার ভয় দেখালে। ইনি হাসলেন, এবং গুরু ডেকে তিলক काँगे। कार्ष भागा भारत निष्य देवकव शाम-भाष्य भाष्य अहे यवनी हिएक एक দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন।

—বোয়েচ কিনা, কেইলাসী! অল্পনামী জিনিস মেকী হয় কম। কী তার দাম যে মেকী হবে? মেকী হয় দামী জিনিস। আর যে জিনিসের যত মূল্য সে জিনিসের মেকী তত নিখুঁত। ধর্মের চেয়ে মূল্য আর কোন্ জিনিসের আছে বল? তাই এ সংসারে ধর্মের ভগুমি আর আসল ধর্মাচরণ কষ্ট করে ধরা তত কঠিন, বোরেচ!

চাদরের খুঁটে চোথ মৃছলেন সরকার।—এই ধর, আমরা যে গোপন

ভজন করছি, এর অর্থ নিয়ে যত খুশী কুৎসা করা যায়। কিছু তিনি তো আনেন—। কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে কসরত-দক্ষ তরুণের শৃষ্টে লাফ মেরে ভিগবাজি থাওয়ার মত উপরের দিকে চোথ ঘৃটি তুলে বিচিত্র কৌশলে উণ্টে দিলেন।—বোরেচ কিনা!

—বোয়েচ, এই ছেলেটি তাঁর বড় ছেলে। ছেলেটর মা গোঁড়া পণ্ডিত-বংশের মেয়ে।—বোয়েচ কিনা। একটা কথা বলতে ভূলেছি কেষ্টদাসী; সেটা কী জান, সেটা হল ওদের জাতের কথা। নিজেরা দেবশর্মা থেকে রায়চৌধুরী হয়েছিল, পুঁথিপেঁতে তাকে তুলে জমিদারী সেরেন্ডার কাগজ নিয়ে পড়েছিল, এবং শামুকের খোলার নস্তের বদলে ফুরসির নল, চটি এবং তালপাতার বদলে নাগরা এবং রেশমী ছত্র গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অন্দরমহলে মা-লন্দ্রীদের জাত বদল হতে দেয় নি; তাঁরা ছিলেন থাঁটী বান্ধণী। মেয়ে দিত বড়লোকের বাড়িতে, কিন্তু মেয়ে আনত গরিব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বাড়ি থেকে। ওটা ছিল ওদের দেই প্রথম যিনি জমির সনদ পেরে জোতদার হয়েছিলেন— তাঁর আজ্ঞা। সেটা ওদের ভাঙবার জ্ঞো ছিল না, ভাঙলে অভিসম্পাতের ভর ছিল। বোরেচ কিনা;—বাঞ্জিকরেরা বলে শুনেছ তো—কার আজ্ঞে? না, কামরূপের মা-কামিক্ষের আজে। এ তাই। এখন এ ছেলের মা ছিলেন—জাত-বামুন যাকে বলে—সেই ঘরের মেয়ে। বোয়েচ কিনা, যখন বিষে হয় তথন তো জামাই ছিল ছেলেমান্ত্ৰ, মেয়ের বাপ বুঝতে পারেন নি। যথন ব্রালেন তথন মেরেকে বললেন—আমার লোভের পাপে তুই লক্ষীর মত জলে পড়েছিদ মা। তবে আমার লোভ হলেও, তোর কপাল বড়। তার ওপরেই তোকে ছেড়ে দিরে আমি চললাম। আর কথনও আসব না। তোর কপাল তোর ওই ছেলে। বোয়েচ কিনা, ওই ছেলেকে তিনি ইচ্ছেমত মামুষ করেছিলেন। বাধা দেবার কেউ ছিল না। কর্তা তথন ওই ঘবনীকে নিমে বিলাসের আমিরী ঢঙ পালটে বৈষ্ণবী ভজনের মুখোশ পরেছিল; বাঁয়া-তবলার বদলে মৃদল, ঘুঙ্রের বদলে মন্দিরা বাজিয়ে গানবাজনার আসর চলে। ঘরে কদাচিৎ আদেন। সে এসেও বড় গিল্লীর ওদিক বড় মাড়ান ना; ও-মেরেকে বড় ভর বা বড় খেরা, যা হোক একটা কিছু করেন। বোয়েচ কিনা, এইভাবে ছেলে বড় হল; ঘোড়ায় চড়া শিখলে না, বন্দুক তলোরার ছুঁলে না, বাবরী করে চূল রাখলে না; শিখলে সংস্কৃত, কিছু ফার্সী পুঁথি নিরে পড়ে বইল, মাথার চূল ছাঁটলে বাম্ন-পণ্ডিতের মন্ত। তারপর একদিন বাপকে গিয়ে বললে, কাশী যাব পড়তে।

বাপ বেশ ভাল করে ছেলের আপাদমন্তক তাকিয়ে দেখে বললেন, কালী!
—হাঁা, কালী।

বাপ ভূক কুঁচকে বললেন, তোমাদের ছই ভাইকে আমি মুরশিদাবাদ পাঠাব ঠিক করেছি। দিন-কতক দরবারে আমাদের মোক্তারের সঙ্গে থাবে-আসবে। নবাব বাহাত্রের সঙ্গে পরিচয় হবে। রাজকার্য কাকে বলে শিখবে। চালচলন তরিবত-সহবত কায়দাকাছনে দোরন্ত হবে। গানবাজনা শিখবে। এ সময় কাশী ? তোমার মা কি বড়ই ধরেছেন ? তা সে তো আমাকে বললেই পারতেন।

ছেলে যেন নিবাতনিক্ষপ প্রদীপ। বোয়েচ না, কেষ্টদাসী, ছেলে হাসলে না, কাশলে না, ভূকও কোঁচকালে না, যেমন বলছিল তেমনি বলে গেল— মা যাবেন না। আমি যাব। পড়তে যাব। কাশীতে পড়ব ঠিক করেছি।

- —পড়তে যাবে ? কাশীতে পড়তে যাবে স্থির করেছ ? ছেলে, বোয়েচ না, বলে গেল—বেদাস্ত পড়ব স্থির করেছি।
- —বেদান্ত পড়ে তো পৈতৃক জমিদারি চালানো যাবে না !

ছেলে বললে, শুনেছি অনেক আগে আমাদের পিতৃপুরুষের বেদাস্তের টোল ছিল।

বোয়েচ না, কেষ্ট্রনাসী, এবার বাপের চক্ষ্ স্থির হয়ে গেল। ফরসির নলের অত্মরি তামাকের ধোঁরায় বিষম থেলেন তিনি। কাশতে কাশতে বুকে হাত বুলিয়ে স্থির হয়ে বললেন, তুমি টোল খুলবে নাকি ?

ছেলে বললে, টোল তো আমাদের আছে; সেটা তো উঠিয়ে দেন নি কোনদিন; তবে আমরা অধ্যাপনা করি না, মাইনে-করা বৃত্তিভোগী পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা করেন।

- —তুমি তাই করবে নাকি?
- —না, সে এখনও স্থির করি নি। বেদাস্ত পড়ে, এ বংশের এতকালের কুলধর্ম-ভাইতার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্ম বা প্রায়োজন হবে তাই করব।

ষাপ অনেককণ কথা কইতে পারলেন না। তারপর বললেন, তুমি হয়তো প্রহলাদ, কিন্তু আমি হিরণ্যকশিপু নই—আমাদের বংশও দৈত্যবংশ নয়। কৃষ্ণনাম করতে নিষেধ করব না। উৎসাহই দেব। যাও। কাশীই যাও। কিন্তু—। কিন্তু সেখানে থাকার ব্যবস্থাটা এ বংশের—। না, যেমন ইচ্ছা তেমনি থেকো। বাবে করব না।

ফুরসির নলে একটা স্থাটান দিয়ে দাস-সরকার একমুখ ধোঁরা ছেড়ে নলটি কেইদাসীর হাতে দিয়ে বললেন, মজেছে ভাল। নাও, দেখ।

সলক্ষভাবে নলটি হাতে নিয়ে পাশে রেখে দাসী বললে, তার পর ?

— তার পর ? বোয়েচ না, এখন গ্রুব তো তপত্থা করতে গেলেন কাশী। বোরেচ না, এর বাবা বলেছিল— আমি হিরণ্যকশিপু নই। তা নর। কিছু ফুক্লচি-মোহমুগ্ধ উত্তানপাদের সঙ্গে মিল পনের আনা। তাই গ্রুব বলেছি এঁকে।

ধ্রুব কাশী গেলেন। কিছুদিন পর মা মারা গেলেন। বছর চারেক পর খোদ কর্তা।

শ্রাদ্ধশান্তির পর সংভাইকে সব ভার দিয়ে ক্ষের চলে গেল কানী।
কী করবে এখনও স্থির করে নি। তবে জমিদারি নয়, এটা ঠিক।
বেদান্ত-পড়া হরেছে, কিছ ধাতস্থ হয় নি। তার কিছুদিন পরেই জয়পুরের
মহারাজার ফতোরা নিয়ে পণ্ডিতেরা এল কানী।—সেই স্বকীর-পরকীরার
কাণ্ড গো!

জান তো ঔরংজীব বাদশার ভয়ে পাগুারা গোবিন্দজীকে গোপীনাথকে জয়পুর পাঠিয়েছে। মদনমোহনকে পাঠায় করৌলী। সেও জয়পুরের মহারাজার বাস্ত্র। বাস্

মহারাণা দ্বিতীয় জয়সিং তিন মৃতির সেবার অধিকার পেয়ে বৈঞ্বধর্মের অভিভাবক হরে উঠলেন; বোরেচ না! তিনি এখন পরমভাগবত। ছঁ, লোকটার অনেক গুণ আছে, অনেক কীর্তি করেছে, কিন্তু আম্পর্ধ দেখ তো!

নড়ে-চড়ে বদলেন দাস-সরকার। এতক্ষণ নেশার ঝোঁকে এক নাগাড় ওই আগত্তক সন্থাসীর ঠিকুজী-কুলুজীর বিবরণ বলে এসেছেন উত্তেজনার বশে. এবার নড়ে বসলেন। ফুরসিটা টেনে নিয়ে বারকতক টান দিয়ে বললেন, নিবে গেছে। ওরে বাবা কালীচরণ, দে তো একবার তামাক।

কৃষ্ণদাসী তালপাতার পাথা নিয়ে হাওয়া করছিল মৃত্ মৃত্। সরকার ছেমে উঠেছেন। শীত শ্রীপঞ্চমীর পর থেকেই বলতে গেলে নেই। শীতলাষষ্ঠার পাস্তাভাত কলাইসেদ্ধ শীতের অভাবে বেশ ভাল জমে নি। লেপ সহু হয় না। তার উপর ঘরথানার দরজা-জানলা বন্ধ। ভজন-কুঠুরি এর নাম। এ সব ঘরের দরজা-জানলা ছোট, এবং আঁটসাঁট করে বন্ধই থাকে। বন্ধ ঘরে ধৃপশলাকার ধোঁয়া। এক নাগাড় এতক্ষণ বকেছেন স্কুলবপু দাস-সরকার। মৃথে জাফরান-দেওয়া পান দাস-সরকারের, স্কুতরাং দাস-সরকারের ছেমে ওঠা স্বাভাবিক। কৃষ্ণদাসীরও এমন ক্ষেত্রে পাথাথানি নিয়ে বাতাস করাই রীতিস্মত। সাধনসম্বত্ত বটে।

দাস-সরকারের এতক্ষণে সেদিকে দৃষ্টি পড়ল। হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, দাও আমাকে দাও। তোমাকে কি বাতাস করতে হয় ? দাও।

—না—না—না। আপনি এত কথা বলে ঘেমে উঠেছেন যে!

দাস-সরকার হাতের তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ এক করে মুদ্রা সহযোগে মৃত্তবে গান ধরে দিলেন—

> অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা— স্থি বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা!

— সখি, ওটা মদনানলে দহন-জালার ঘাম। বাতাদে শীতল হওরার নর।

কৃষ্ণদাসী ফিক্ করে হেসে বললে, হাকিমী দাওয়াই খেরেছেন বৃঝি?
মরণ!

উত্তর একটা দিতে যাচ্ছিলেন দাস-সরকার, কিন্তু তার আগেই চাকর সাড়া দিল—কল্পে নিয়ে সে ঘরে চুকছে। সরকার সংযত হলেন। এটা দাস-সরকারেরা পারেন—চক্রের পলকে ভোল পান্টাতে পারেন। মূহুর্তে ভোল পান্টে গেল সরকারের। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন জয়পুরের মহারানা সওয়াই জয়িংহের উপর। বলতে লাগলেন, মরণ হলে তো বাঁচতাম ক্রফানসী। তুমিই বল—জয়পুরের মহারানা জয়িংহের আম্পর্ধার কথা শুনে বাঁচতে ইচ্ছে হয় ? ওঃ! বলে কিনা, রাধারাণী পরকীয়া বলে—! রাজা

হলেই মাথা কেনে তো! আর তারই বা দোব কী দিই বল? বোষেত কিনা, ঔরংজীব বাদশা গোবিক্ষজীর মন্দিরের চ্ড়া ভাঙলে, পাগুরির ভরে গোবিক্ষজীকে জয়পুরের মহারানার বাড়িতে তুলে দিলে। প্রভূ নিজেই যথন আশ্রের নিলেন, তথম সে বাতলাবে বইকি, বলবার আম্পর্ধা হবে বইকি যে—ঠাকুর, ওসব গোপিনী-টোপিনী নিয়ে তোমার রাস দোল ঝুলন করা হবে না।

ক্ষণাসী সে বিবরণ জানে। সে তো বেশী দিনের কথা নয়, সে দিনের কথা। ক্ষণাসী তথন কিশোরী। ক্ষণাসীর শশুর প্রেমদাস বাবাজী, স্বামী গোপালদাস তথন বেঁচে। জরপুরের মহারানার পাঠানো পণ্ডিত ক্ষণদেব আসছেন—এই সংবাদে দেশময় বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা আতক ছড়িয়ে পড়েছিল। গেল, গেল, সব গেল। রাধাই যদি যান তবে আর বৈষ্ণবধর্মের রইল কী ? গোবিন্দ ? হায় রে হায়, রাধা বাদ দিয়ে গোবিন্দ ? জল বিনে মীন ? বিজ্ঞলী বিনে মেঘ ? রূপ ছাড়া রস ? মহারানা জয়সিংহের এত বড় উদ্ধত্য গোবিন্দ সহু করবেন ?

। তৃতীয় পরিচেছদ ।

কীর্তিমান মহারানা 'সওয়াই' জয়সিং। গণিতে জ্যোতিষে পণ্ডিত লোক। জয়পুরে দিল্লীতে মথুরায় উজ্জ্বিনীতে কাশীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্কৃত ভাষার অন্তরাগী এবং পৃষ্ঠপোষক, শাস্ত্রপরায়ণ এবং সত্যসন্ধানী। গোবিন্দজীকে জয়পুরে নিয়ে গিয়ে দেশের বৈষ্ণবাচার ও ধর্মের অবস্থার দিকে তাকিয়ে জ কুঞ্চিত করলেন। চিত্ত পীড়িত হল। বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের পরকীয়া-তত্ত্বের ব্যাখ্যায়, পূর্ণ চৈতন্ত্রময় পুরুষের উপাসনায় এ কীবিক্নতি! এ যে ব্যভিচার!

পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি বিচার করলেন। সমগ্র ভাগবতের প্রতিটি শ্লোক বিশ্লেষণ করে বিচার করে 'পরকীয়া' মতকে খণ্ডন করে তিনি 'স্বকীয়া' মতের প্রতিষ্ঠা চাইলেন। বহুবল্লভকে শুধু শ্রীবল্লভ হিসেবে দেখতে চাইলেন। গোপীজনমনোহারীকে রাধাপ্রেমপরায়ণতার কলঙ্কমুক্ত করবার সংকল্প করলেন। পরকীয়া রাধার স্থলে লক্ষ্মীকে দেখতে চাইলেন তাঁর পাশে। বহু সতর্ক বিচারের পর মত খাড়া হল। মহাপণ্ডিত ক্লঞ্চদেব হলেন সে মতের ধারক। বৈশুবধর্মের সংস্কার হবে। প্রথমেই বিচার হল বঙ্গদেশীয়-মতাবলম্বী জয়পুরবাসী পণ্ডিতদের সঙ্গে। তাঁরা হার মানলেন। বিচারপত্রে স্বকীয়া মত স্বীকৃতির স্বাক্ষর দিলেন। তারপর মহারানা পণ্ডিত ক্লঞ্চদেবকে পাঠালেন দিখিজয়ে। মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। স্বাহ্রে জয় করতে হবে বঙ্গদেশ।

কলিতে বৈষ্ণবধর্মের মূরলী তার দ্বাপরের কেন্দ্র বৃন্দাবন ও যমুনাতট থেকে স্থান পরিবর্তন করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের গঙ্গাতটে এসে নৃতন স্থরে বেজেছে। স্মাজু কে গো মূরলী বাজার? এ তো কভুনহে খ্যামরায়! সে গৌরতন্ত, বৃশ্বাবনচন্দ্রের নব ভাব-বিগ্রহ। আবিভূতি হলেন নবছীপে শচীমাতার কোলে পণ্ডিত জগরাধ মিশ্রের ঘরে। সকল শাস্ত্র সকল পাণ্ডিত্য অর্জন করে দিয়িজয়ী পণ্ডিতদের পরাভূত করেও অবশেষে একদা নিজেকে যেন বিদীর্ণ করে নবভাবে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। যেন খনির কঠিন প্রস্তরময় দেহ দীর্ণ করে জ্যোতি বেরিয়ে এল; জ্ঞানতত্ত্বের ব্রহ্মকমণ্ডলু থেকে গলাম্রোতের মত উৎসারিত হল ভক্তি ও ভাবরসের স্বর্মুনী। বিশ্বব্র্ছাণ্ডে পুরুষ সেই এক প্রেময় পরমপুরুষ; ভজনা কর তাঁকে। উন্মন্ত ভাবাবেগে বের হলেন নবদীপের নিমাই। নিমাই নয়, লোকে প্রত্যক্ষ দেখলে জীবন-চৈতভান্তের বিশাল ম্রোত। ভেসে গেল দেশ—ভেসে গেল জীবন। সেই নবভাবেই বৈক্ষবর্ধর্মে নৃতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে; নৃতন গোমুখী—নবদীপ; অথবা বলা যায় জহু-মূনির আশ্রম। নৃতন মহিমার নির্গত হয়ে ভাবগঙ্গা প্রাবিত করে দিরেছে পূর্ব-পশ্চম-উত্তর-দক্ষিণ। নবদীপের শন্ধ যদি এ স্রোতের আগে আগে না বাজে, বাংলা দেশ যদি এ মত স্বীকার না করে, তবে অপর সকল দেশ স্বীকার করা সত্ত্বে এর অবস্থা হবে বঙ্গদেশের কীর্তিনাশার মত; নবদীপের স্রোতই মহাপ্রভুর পূণ্যে ভাগীরথীর মহিমা বহন করবে।

মহারানা জয়িশংহ আচার্য রুঞ্জদেবকে সর্বপ্রথম পাঠালেন বাংলা দেশে। সঙ্গের রুক্ত দিপাহী দিলেন; স্থার স্থবার স্থবার ব্যাদার নবাবদের কাছে, রাজ্যে রাজাদের কাছে অন্থরোধপত্র পাঠালেন; সাহায্য প্রার্থনা জানিরে লিখলেন—"সঠিক ধর্মতন্ত্রের বিচার সর্বদেশে সর্বকালে সর্বলাকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য এবং এ বিষয়ে সাহায্য করা সকল রাজারই কর্তব্য, ও অপর সকল ধর্মেরও সহযোগিতা করা সকল ধর্মেরই অলীভূত। ধর্মতত্ব গুহার নিহিত, সেই গুহার পথ আবিদ্ধার, নির্ভূল দিঙ্দর্শন, বিচার ভিন্ন অর্থাৎ 'বিনা তজবিজে' হর না। ধর্মের ভাগুরে তছরূপ হইলে, আসলের বদলে মেকী চলিলে বেহেন্ডের স্থর্গের কৃটক বন্ধ হইয়া যায়; সেধানে মেকী সোলামী অচল; অথবা বেহেন্ডের তোষাখানা মেকী মালে ভরিয়া উঠিলে ছনিয়া জাহাল্পমে যায়। খোদাতরলা ঈশ্বর রুষ্ট হইয়া উঠেন। স্থতরাং হিসাবনিকাশে সাহায্য করিয়া নিজের ও দশের ধর্মের কল্যাণ অবশ্রুই করিবেন।"

প্রব্রাগে এসে বিচার হল। কৃষ্ণদেবের প্রতিভা জয়যুক্ত হল। পণ্ডিতেরা

শ্বকীয়া মতে স্বাক্ষর দিলেন। সেধান থেকে স্থলপথ ছেড়ে নৌকা নিয়ে গঙ্গার স্রোত-পথে নবৰীপ যাত্রা করলেন। পথে কাশী—ভারতের সর্বমত সর্ববিভার মহাকেন্দ্র। এখানেও বিচারসভা বসল। কাশীর গঙ্গার ঘাট—অতীত ভারতের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিভাপিঠ। এত বিচার, এত গবেষণা, এত দীক্ষা, এত উপলব্ধি, জ্ঞানে ধ্যানে এত আবিষ্কার পৃথিবীর আর বাধ করি কোথাও হয় নি। আচার্য কৃষ্ণদেব ঘাটে পূর্বান্ত হয়ে জাহ্নবীকে সম্মুখে রেখে আসন গ্রহণ করলেন, আশেপাশে বসল শিশ্বরা, আর তাঁর দক্ষিণে বামে—উত্তর ও দক্ষিণ মুখে বসলেন কাশীর বৈষ্ণবাচার্যের। দৃষ্টির সম্মুখে অনস্ত পুণ্যমোতা হয়ধুনী। বিরাট ঘাট জ্ঞনসমাগমে পূর্ণ, কিন্তু স্তব্ধ। তথু গঙ্গাম্প্রোতের কলকল শব্দ উঠিছিল।

বিচারে আপন মতকে জয়যুক্ত করে আচার্য ক্রফদেব বৈশ্ববাচার্যদের আকর নিয়ে উঠে গলার ঘাটে নেমে জল মাথার দিরে উপরে উঠছেন—এক শ্রামবর্গ কান্তিমান নবীন যুবক তাঁর সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মুঞ্জিত মন্তক, মধ্যস্থলে স্পুষ্ট শিখাগুচ্ছ, কপালে তিলক, বুকের উপর তুলছে তুলসীর মালা। বললে, আপনার সঙ্গে আমি বল্পদেশ-বিজ্ঞার সন্ধী হতে চাই।

আচার্য তার মুখের দিকে চেয়ে তার কান্তিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন, এস। গ্রহণ করছি তোমাকে। দীক্ষা নাও আমার কাছে।

এই যুবকই এই নবীন সন্ধ্যাসী। বুকে তার মারের সারা জীবনের বঞ্চনার বেদনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে—ভূমিকম্পের কঠিন চাপে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার স্তরের মত; তার উপর বনিয়াদ করে সে গড়ে তুলেছে তার সংকল্লের মন্দির। তার মা যাতে বেদনা পেরেছেন, সারাটা জীবন মানমূখী হয়ে কাটিয়েছেন, তার উচ্ছেদ সে করবেই। ধর্মের নামে জীবনের বিকৃতি প্রবৃত্তির এই ব্যভিচারকে সে জীবনপাত করে নির্মূল করবে। শাস্ত্রকে সে জেনেছে, অমুভূতি দিরে উপলব্ধি সে করেছে। মামুষের জীবনের মধ্যে চৈতন্তের প্রকাশ হয়ে চলেছে অসৎ থেকে সতে, অভন্ধতা থেকে পরিশুদ্ধতায়। বিকৃত ব্যাখ্যায় তাকে অধােমুখী বিপরীতমুখী করার পাপ কখনও সহু হবে না। সমস্ত দেশ সমস্ত জাতি সব যাবে অনিবার্ষ ধ্বংসের পথে। বেণীমাধ্বের ধ্বজার দিকে, জ্ঞানবাপীর দিকে, বিশ্বনাথের পুরনো মন্দিরের দিকে সে তাকায়

শার সারা অন্তর তার কোভে বেদনায় টনটন করে ওঠে। বৃন্ধাবন সে যার নি, কিছ করনায় সে দেখতে পায় বৃন্ধাবনের ভাঙা মন্দির। তার মারের বেদনা আর এই বেদনা যেন এক হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে তার পূর্বপূর্ব্বেদের। তাঁরা যেন বলেন—আমাদের বংশের পাপেরই এই পরিণাম। ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসে সে। সারা রাত্রি আর ঘুম হয় না। দোষ সে ঔরংজীব বাদশা বা হিন্দুধর্মঘেরী বাদশাদের দেয় না। তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসমত কাজ করেছে। ধর্মবিশ্বাস যদি ভাস্ত হয় তবে তার ফলভোগ তারা করবে। কিছ হিন্দুর এ ঘুর্ভোগ তার নিজের জীবনের কর্মফল। এ পাপ থেকে হিন্দুকে উদ্ধার পেতে হবে। এক-একদিন ইচ্ছা হয় একটা পতাকা হাতে করে সে বেরিয়ে পড়ে, কাশ্মীর থেকে কন্তাকুমারী, ছারকা থেকে মণিপুর পর্যন্ত চিৎকার করে ডাক দিয়ে বেড়ায়—জাগো, বিলাস ঘ্যভিচার থেকে জাগো। ওঠো। কিছ সাহস হয় নি। সে শক্তি কি তার আছে ?

সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে আচার্য ক্লফদেবের ক্ল্বধার যুক্তিতর্কের দীপ্তি দেখে বন্দদেশাস্থদারী বৈষ্ণব-পণ্ডিতদের অদহার অবস্থা এবং পরাজয় দেখে তার অস্করাত্মা বলে উঠল—এই তো, এই তো পেয়েছি নবগঙ্গার স্রোতোধারা, এরই সঙ্গে মিশিয়ে দিই আমার জীবনের স্রোতট্কু। প্রবলতর হোক স্রোত। পরকীয়া সাধনার খাতের মৃথ বন্ধ হয়ে যাক; অথবা সে প্রোত

আচার্য ক্লফদেবের সাদর সম্ভাষণের উত্তরে সে হাত জোড় করে বললে, শুধু দীক্ষা নয়, আমি সয়্যাস গ্রহণ করে এই সাধনাকে প্রচার করব আজীবন। এই আমার সংকয়।

কৃষ্ণদেব বললেন, আমি সংসারী, আমি তো সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে পারব না। আমার তো অধিকার নেই।

দৃঢ়কঠে নবীন ব্রহ্মচারী বললে, তা হলে দীক্ষা থাক্, আপনার কাছে আমি শান্ত্রতত্ত্বে শিশুত্ব গ্রহণ করছি। আমাকে শান্ত্র-শিশু হিসাবেই গ্রহণ করুন। সঙ্গে নিন আমাকে। এই দ্বিশ্বিজ্ঞায়ের অভিযানে সামাশ্র কিছু করতে পারলেও জীবন সার্থক হবে আমার।

নবাব জাফর কুলি থাঁ কঠোর শাসক; হিসাবনিকাশ, অর্থনীতিতে, ভূমি ও রাজস্ব-বিভায় তিনি ছিলেন স্থপণ্ডিত; সেই রাজস্ব আদায়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর; বাংলার জ্ঞমিদারদের ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতা নিষ্ঠুর হাতে দমন করে রাজস্ব আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিচারক হিসাবে ছিলেন ভায়পরায়ণ। ক্লফ্লেব তাঁর দরবারে এসে মহারানা সওয়াই জয়সিংহের অমুরোধ-পত্র পেশ করতেই তিনি সসম্মানে গ্রহণ করে বললেন, মহারানার অমুরোধ আমি আমার পালনীয় কর্তব্য বলেই গ্রহণ করছি। এ আমার অবশ্রক্তব্য।

কৃষ্ণদেবকে বাসস্থান দিলেন। নবাবী ভাণ্ডার থেকে তাঁর সিধার ব্যবস্থা হল। নবাব জাফর কুলী খাঁ স্ববে বাংলার ফৌজদারদের মারফত বৈষ্ণবধর্মের কুলপতি এবং সমাজপতিদের এই সিদ্ধান্তের বিচারে উপস্থিত হওরার জন্ত অন্থরোধ-পত্রের নামে পরওরানা পাঠালেন। শ্রীপাঠ নবদ্বীপ শান্তিপুর থেকে দিকে দিকে পত্র গেল। উড়িয়া পার হয়ে দক্ষিণে ত্রৈলক দেশ পর্যন্ত গেল এর সাড়া। কয়েকজন ত্রৈলকদেশীয় বৈষ্ণব পশ্তিতও এসে উপস্থিত হলেন। বাংলা দেশেও পরকীয়া মতের বিরোধী—ক্ষকীয়া মতের সমর্থক পণ্ডিত খারা ছিলেন তাঁরাও এসে উপস্থিত হলেন। দিনাজপুরের শ্রীধর বিভাবাগীশ এবং প্রাণনাথ রায় তাঁদের অগ্রণী। কৃষ্ণদেবের পাশে এসে দাড়ালেন তাঁরা। নবদ্বীপের প্রধান আরচার্য কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ত্রেলকী বৈষ্ণব রামজয় বললেন, ভাল, বিচার হোক। জাফর কুলী খা আদেশ দিলেন—দলিল লেখা হোক স্বাত্রে। দলিল লেখা হল। বাংলার বৈষ্ণবের। লিখলেন—

"আমরা শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর মতাবলঘী, অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থাই হর তাহাই লইব। এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুক্ত জাফর থাঁ সাহেব নিকট দরখান্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্মাধর্ম বিনা তজ্ববিজ্ঞ হয় না অতএব বিচার কব্ল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাঠ নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ও ত্রৈলক দেশেক

রামজয় বিভালম্বার সোনার গ্রামের শ্রীরাম বিভাভূষণ ও শ্রীলন্দ্বীকান্ত ভট্টাচার্য গররহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রন্ধচারী ও নয়ানন্দ ভট্টাচার্য সাং মহলা।"

জরপুরের আচার্য কৃষ্ণদেব প্রসন্ধ গান্তীর্বের সঙ্গেই বললেন, স্বীকার করছি। সাক্ষী মাথার উপর চন্দ্র পূর্য, সাক্ষী সন্মুখে সমাসীন মতোমন উল্ মূল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর থা নাসির জঙ্গ মূরশীদ কুলী থাঁ—স্থবে বাংলার দশুমুণ্ডের মালিক, ধর্মের রক্ষক, যিনি যুদ্ধে বীর, পরোপকারে মুক্তহন্ত, দানে হাতেম ও বিচারে নসেক্ষার তুল্য। পরাজন্ব হলে আমি পরকীয়া-মতকে স্বীকার করে এঁদের গুরু বলে মেনে নিম্নে দীক্ষা নেবার প্রতিজ্ঞা করছি।

ক্লফদেবের কণ্ঠস্বরের গান্তীর্যে বাগ্মিতায় চকিত হয়ে উঠল সভায় উপস্থিত আমীর-ওমরাহেরা। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তরুণ ব্রহ্মচারীর মুখ। আমীর-ওমরাহদের মধ্যে উপস্থিত ছিল তার জ্ঞাতিরা। ক্লফদেব নিজের ধ্বজাটি দিলেন শিশ্রের হাতে। সে বহন করে নিয়ে গেল সেই ধ্বজা রাজসভা থেকে বিচারসভা পর্যন্ত।

বিচারসভা বসল মুরশিদাবাদে নর। বসল মোকাম মালিহাটিতে। কাটোয়ার কাছে মালিহাটি। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস ঠাকুরের নাটমগুপে, জ্বগ্রবর্তী হয়ে বসলেন শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর। পাশে বসলেন শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের বংশধর। তাঁদের পাশে বসলেন বাংলার বৈষ্ণব আচার্যেরা।

এ পাশে কৃষ্ণদেব। পাশে শ্রীধর বিভাবাগীশ। বাঁ দিকে তরুণ ব্রহ্মচারী। পাশে পুঁথির স্তৃপ। যথন যে পুঁথির প্রয়োজন হয় যুগিয়ে দেয়। ফ্রন্ড লেখনীতে লিখে যায় বিচারের যুক্তিতর্ক। বিচার চলল ছ মাস।

ছ মাস বিচারের পর একদিন আচার্য ক্ষণের শুরু হলেন। চোথ থেকে তাঁর জলের ধারা নেমে এসেছে। চৈতক্তব্দ্ধপ একমাত্র পুরুষের সে বিশ্ববিমাহন মূর্তি তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে। বিশ্বব্দ্ধাণ্ডের প্রাণশক্তিরাধার মত তাঁর বাঁশী শুনে পাগলিনী। বিরহে ব্যাকুল। স্থুখ নাই, সাস্থনা নাই, তৃথি নাই, ওই মোহন বাঁশুরিয়াকে না পেলে সব শৃক্ত — সব শৃক্ত । সেই একমাত্র আপন। কিন্তু সে আপনার নয়, নিজ্প নয়; বস্তুময়

সংসার শতবন্ধনে বেঁধে রেখেছে প্রাণক্ষণিণী নায়িকাকে; তাঁকে অভিসার করতে হর গোপনে বিপিনে, নিশীথ রাত্রে বর্ষণম্থর ছর্যোগের মধ্যে। ওদিকে বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনির আর বিরাম নাই। তিনিও ব্যাকুল। অধীর। প্রাণমরী রাধা ছাড়া তাঁর লীলাব্যাকুলতার পরিতৃপ্তি কোথার ?

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃত্ বেণুম্। বহু মহুতে নহু তে তহুসঙ্গতপ্ৰনচলিতম্পি রেণুম্॥

কবিরাজ গোস্বামীর জয়দেবের পদাবলীর মধ্য দিয়ে পরকীরা বৈশ্বব ধর্মতব্বের সেই আহ্বান—প্রাণ-রাধাকে শ্বরণ করিরে দিছে, তিনি তোমাকে
ভাকছেন তোমাকে ভাকছেন। বাঁশী বাজে ওই শোন। তিনি তোমার
বিরহব্যাকুল। কাল চলে যায়—শত বন্ধনে-বাঁধা-মাহুষ, মিধ্যা অভিমানে
অধীর মাহুষ, রাত্রি যায়—আমার কথা রাখ, ওই পথে যাত্রা কর। তিনি
তোমারই অহুরাগী, ওগো, শুধু তোমারই অহুরাগী।

"কুরু মম বচনং সত্তররচনং পূর্য় মধুরিপুকামম্॥"

জীবন এবং চৈতক্সম্বরূপের এই লীলা-মাধুরী পরকীয়া ভাবের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে সেই স্পষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে। এই হল পরম সত্য। স্বকীরা ভাবের মধ্যে এ রসাম্বাদন সম্পূর্ণ হতে পারে নি বলে স্বয়ং লক্ষীই রাধারূপে অবতীর্ণা হলেন।

রাধানোহন ঠাকুর রাধা-তত্ত্বের নিগৃ হহন্ত ব্যক্ত করলেন: আচার্য ক্ষদেব, একদা বৈকুঠে লক্ষী নিজে বললেন—প্রভ, আমি তো তোমার সর্বেখরী, তোমার পরম সান্নিধ্যে অহরহ আমার অবস্থান। আমাকে ধারণের জন্ত তোমার ওই বক্ষন্থল উন্মুক্ত প্রসারিত। কিন্তু কই, এই পাওয়ার মধ্যে তো পরিপূর্ব তৃপ্তি পাচ্ছি না!

চৈতন্তস্বরূপ পরমপুরুষ বললেন—দেবী, তুমি আমার পত্নীত্বের অধিকারে মহারাজ্ঞীর মত আমার উপর অধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। পাওয়ার জন্ত বাধাবিদ্ধ অতিক্রমের ত্বংখ নাই, অসাধ্য সাধনের আকুল আবেগ নাই, হারানোর ভঙ্গ নাই, হারিয়ে তার জন্ত অনস্ত বেদনা নাই। ত্বংখের আন্দাদন নাই, তাই স্থের মিষ্টজ্বে উপলব্ধি নাই; চোখের জল ঝরে না, তাই হাসির মধ্যে

প্রাণ প্রকাশ পার না। তোমাকে সেই রস আমি আবাদন করাব।

তুমি জন্মাবে রাধা হরে, আমি জন্মাব ক্লফরপে। পরকীয়া ভাবের মধ্যে
পূর্ণ প্রকাশ হবে লীলারসের।

এর আংগে ঋথেদ অথর্ববেদ তৈভিন্নীয় ব্রাহ্মণ ভাগবত থেকে বিভিন্ন পুরাণ এবং কাব্য থেকে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করে বিচার হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কৃষ্ণদেব বিচলিত হন নি। এবার তিনি বিচলিত নয়, যেন বিগলিত হয়ে গেলেন। কাদলেন তিনি। নিজে যেন বাঁশী শুনতে পেলেন।

কৃষ্ণদেব অশ্রুবিগলিত চোথ তুলেই তাকালেন স্থের দিকে, বললেন— হে দেবতা, তোমাকে দাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তুমি দাক্ষী, আমি পরাভূত হয়েছি। এ পরাভব আমার ভ্রান্তি নিরসন। তোমাকে দাক্ষী করেই আমি আচার্য রাধামোহন ঠাকুরকে অজয়পত্র লিখে দিরে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করছি।

লেখা হল অজয়পত্ত।-

"শ্রীযুক্ত দেওার জরসিংহ মহারাজার সেথান হইতে স্বকীয় ধর্মের পরওানা লইরা গোরমণ্ডলে স্বকীয় ধর্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহার ছকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গোরমণ্ডলে সর্বশুক্তা স্বকীয়সিদ্ধান্তের জরপত্র লইয়া আসিয়াছিলাম। নালিহাটী মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺গোস্বামীদিগের ভক্তিশান্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে স্বকীয় ধর্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভৃত হইয়া অজয়পত্র লিথিয়া দিলাম এবং শিশ্র হইলাম।"

কাটোয়ায় গলার যে ঘাটে মহাপ্রভু মন্তক মৃগুন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন সেই ঘাটে এসে সশিশ্য রুফদেব পরকীয়া বৈষ্ণবতত্ত্বের যুগলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এবং নিজের দীক্ষান্তে নিজের শিশুদের নবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শিশুরা একে একে দীক্ষা গ্রহণ করলেন; কিন্তু কই, সে নবীন ব্রহ্মচারী কই? কই? নবীন ব্রহ্মচারী নেই। নিঃশব্দে কাউকে কিছু না বলে নবীন ব্রহ্মচারী স্থানত্যাগ করেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কুফদেব। চারিদিকে তথন জয়ধ্বনি উঠেছে। সংকীর্তন হচ্ছে। রাধাগোবিন্দ জয় রাধাগোবিন্দ।

জয় চৈতক্ত নিত্যানন্দ! জয় বহুদেশ! 'ঢাগু৷ গাড়া গোল'। ঝাণ্ডা— জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত হল।

এ সব কথা কৃষ্ণদাসী জানে। তবে এই নবীন সন্ন্যাসী যে সেই গাজনের দলহাড়া গোঁসাই তা জানত না। হেসে সরকার গাঁজার কলেটে মুখে তুলতে গিরে নামালেন। এর মধ্যে আর একবার ত্বরিতানন্দের তৃষ্ণা অমূভব করেছেন। রজনী গভীর হয়ে আসছে। পরকীয়া-রসতৃষ্ণাকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করে তুলতে চাইছেন, কিন্তু মন এবং দেহ যেন বীণার তারের হরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের হরের এক হয়ে মিলে যাওয়ার মত মিলছে না। তাই আর একবার গঞ্জিকা ক্রেবন করে প্রোঢ় বয়সের মেদবছল স্থল দেহের স্নায়ুকে চড়া হরে টেনে বেঁধে উদগ্র তৃষ্ণাতুর মনের কড়া তারের হ্রেরর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইলেন। চৈতক্তস্করপ পরমপুরুষ মানস বৃন্দাবন বিকৃত জীবনে নিতান্তই অলীক হয়ে গেছে।

কৰেটি নামিরে সরকার বললেন, গাজনের দলছাড়া গোসাঁই নয় সথী,
এটা নিতান্তই গোরালছাড়া সেই গরুটা যেটা নাকি কানে কালা, যেটা
নাকি ঘাসের টানেই ছুটে বেড়ায়, বংশীধ্বনি দুরের কথা বলভজের শিঙের
শব্দও কানে পৌছয় না। ওটা একান্ত ভাবে বাঘের হাতে অকালে মরবে
অথবা কোনও কসাইরের হাতে আড়াই পোঁচে জবেহ হবে।

নিজের রসিকতার মুগ্ধ হয়ে নিজেই একদফা থিক-থিক শব্দে হেসে সারা হলেন দাস-সরকার, তারপর হস্তবদ্ধ গঞ্জিকার কন্ধেটি তুলে বারক্ষেক ফুস্ ফুস্করে টেনে শেষবারে সন্জোরে টান মেরে কন্ধেটি দাসীর দিকে বাড়িয়ে দিরে নিজে উর্ধানেত হয়ে দম ধরে বসে রইলেন। দাসী টানতে লাগল কলে। চিন্ত বিক্বত না হলে ব্যভিচার উল্পাসিত হয় না। তারও নেশার প্রয়োজন হয়। দমটা ছেড়ে আবার বললেন দাস-সরকার, সেই কাটোরার ঘাট থেকে ভেগেছিলেন মহাগকটে। কত খোঁরাড় ঘুরে আবার দেখা দিয়েছেন। এবার আরও এককাঠি চড়ে এসেছেন গো। ছিলেন যাড়ি

হরেছেন ধর্মের মাঁড়। সর্যাসী হরেছেন। কেউ বলে গুরু মিলেছে, সর্যাসী গুরু। কেউ বলে, গুরু-টুরুর ধারই ধারেন না, নিজেই স্বরুষ্থ। বুদ্ধের মত নিজেই নিজের গুরু। এবার পরকীয়া তো পরকীয়া, স্বকীরাও নয়; কড়াকিরা কাঠাকিরা সেরকিয়া সব বরবাদ, ও ধারাপাতই বাদ। একের পর তুই নেই। গুরু শ্রাম। বোয়েচ না! জয়পুর থেকে মৃতি গড়িয়ে এনেছে শুনছি। ভাইরের কাছে গিয়েছিল। ভাইটা ভাল। বিষয়ের বদলে মোটা টাকা দিয়েছে। শ্রামরপোর গড়ের অংশ কিনেছে। সেইখানে মঠ করে গুরু শ্রামের তপত্যা হবে। এই মাধবপক্ষে প্রতিষ্ঠা হবে। উনি হলেন তিনি। লগন-চাদা। রাধা বাদ দিয়ে শ্রাম, রূপ বাদ দিয়ে রুস, বোয়েচ দাসী—সে রস বানার ময়রারা; ওটা বাম্ন নয়, সাধকও নয়, সয়েয়সীও নয়, ওটা ময়রা। কিছে!—লাল চোখ মেলে দাসীর মুখের দিকে চাইলেন দাস-সরকার।

- -की ?-शमल मामी।
- —তোমার এত. থোঁজ ? লক্ষণ তো ভাল নয় কেইদাসী। কী বলে, তোমার বুকের মধ্যে প্রাণ-ভোমরার যেন গুনগুনানি গুনছি স্থী?—থিক-থিক করে হাসতে লাগলেন দাস-সরকার।
- —এতও জানেন আপনি! কী গুনগুনানি?—কটাক্ষ হেনে দাসীও মুচকি হাসল।

হাতথানির আঙুলে মূদ্রা করে দাসীর মুখের সামনে ধরে সরকার যথাসাধ্য হরে গাইলেন—

> "সখি রে—মৃঞি কেন গে'লু কালিনীর জলে। কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছ—লে। রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গে—ল॥"

দাসী চতুরা নামিকা। সে ক্লিম দীর্ঘনিশাস ফেলে উদাস ভাবে বললে, তাই তো হয়। পুরুষেরা তাই চিরকাল বলে। অথচ—

- —অথচ কী?
- আমাদের এক কথা সরকার মশার; আমাদের জীবন দিলে আর ফেরে না। ফাঁসি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হেও হারে গান ধরে—

ভোমারই চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি!

দাস-সরকারের চোথ দিয়ে জল পড়ে না, কিন্তু পিট-পিট করে। দাসী ক্রেক কলি গাইতে গাইতেই সরকার ঘন ঘন চোথ মোছেন, এবং সেই ঘর্ষণে বাধ্য হয়ে জল আসে। এবং বার বার বলেন, রাধে—রাধে—রাধে! জয় রাধে, জয় রাধে!

বাইরে মধ্যরাত্রির ঘোষণা করছে শৃগালেরা। পাঁচা ডাকছে বাড়ির পাশের আম-কাঠালের বাগানের গাছের কোটরে। বন্দরের ঘাটে মগুপের শ্বলিত কণ্ঠের গান টুকরো-টুকরো ভেসে আসছে সগু-আগত দক্ষিণা বাডাসে। অজয়ের ওপারে শালবনে ফেউ ডাকছে। চিতাবাঘ বেরিয়েছে বোধ হয়।

দাসী বলে, রাত্রি অনেক হল সরকার মশায়। মোহিনী একলা আছে।

হেসে সরকার বলেন, তোমার ঘরবন্ধন মন্ত্রের গণ্ডী পার হবে কে ? ভন্ন কেন এত ? আথড়ার মধ্যে তো যমের অধিকার নেই ক্লফদাসী। তার উপর যে পাহারা রয়েছে কেলে স্পার, কোন ভাবনা নেই।

রুঞ্চাসী চমকে উঠল। কেলে সর্দারকে পাহারা রেখেছে? কেরেখেছে? অকুর? কেন? ভুক ছটি তার কুঁচকে উঠল। বললে, কেলে সর্দারকে পাঠিয়েছে অকুর, মোহিনীকে আগলাতে, না, আমাদের উপর নম্বর রাখতে?

—না না না। অক্রুর পাঠায় নি। দিব্যি করে বলছি। সে বেটার মোহিনীকে মনে ধরেছে, কিন্তু মনের টান ওই সব বুনো জাতের মেয়েদের উপর বেশী। পাঠিয়েছি আমি রুঞ্চদাসী। তোমার মন্ত্র-তন্ত্র আঞ্ডার মহিমা—সবই জানি। তবু বোয়েচ না, এমন একটা লোক পাহারা দিলে অনেক নিশ্চিস্তি। বেটাকে বলেছি তিনজন শাকরেদ নিয়ে গাছের উপর চড়ে বসে থাকবে। আর বোয়েচ কিনা, তুমি এসেছ আমার কুঞ্জে, এ সময় আঞ্ডায় কিছু ঘটলে তৃঃয় তুমি পাবে, কিন্তু আমার যে অপবাদের সীমা থাকবে না গো! রাধে রাধে—এ যে আমার কর্তব্য সথি!

কৃষ্ণদাসী শাস্ত হল। শাস্ত স্বরেই বললে, আমাকে বলে রাখলেই হত।
—হত। কিছু আমার নিজের কি জোর নেই তোমার উপর কৃষ্ণদাসী?

শুধু তুমি নও—মোহিনী—! 'সেও তো ধর গা মেল্লে—আমার ছেলের সাধন-সন্ধিনী হবে! নাকি?

কৃষ্ণদাসী চুপ করে বইল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল অক্ররের কুংসিত চেহারাখানা।

সরকার প্রশ্ন করলেন এবার, কত বয়স হল মোহিনীর ?

- —এই পনের।
- —তবে আর কি ! গর্ভ ধরে যোল করে ক্রিয়াটা করে ফেল। ছেলেটা বড় বে-বগ্গা হয়ে উঠছে। ওকে আর রাথতে পারছি না। বোয়েচ না, কোন্দিন কোন্যবনী নটীর খগ্গরে পড়বে !
 - —নানা। এখনও—
- —না নয়। আমি অনেক অর্থ দিয়েছি। দিয়েও যাচছি। আমার ছেলের নজরের কথা যদি লোকে না-জানত কেইদাসী, তা হলে এতদিন তোষার মস্কর-তস্কর তোমার আখড়ার ঠাকুরের ভর এ সব অগ্রাহ্থি করে অনেক ধাকা তোমার দরজায় পড়ত। বোয়েচ না ? এখন আমার ছেলে নটীপাড়ায় ইতর লোকের হাতে ধরা পড়লে, বোয়েচ না, আমার মাথা হেঁট হবে। তা ছাড়া পাপ স্পর্শ করবে।

পুশমাল্য, চন্দন, চুয়া, গুয়াপান ইত্যাদি উপকরণে সাজানো থালাখানি আসেরের সামনে নামিয়ে দিল কেষ্ট্রদাসী। কুয়ভলের ইশারা এটি। বললে, নটীরাও তো কিছু প্রত্যাশা করে আপনার ছেলের কাছ থেকে! আমার মেয়ের মনটা এখনও বড় কাঁচা সরকার মশায়। এ সব বললে বড় লজ্জা পায়। এখন কিছুদিন যাক।

বেশ শক্ত ভাবেই ঘাড় নাড়লে সে। অক্রের বীভংস মৃতিটা যেন তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কুকুর-দাঁত ছটো বের করে হাসছে। শুধু কদাকার নয়, তার উপরেও কিছু।

খাপদের মত হিংস্র দেখায় তার ওই প্রকট খাদন্তের জন্ম। বন্ম জাতের মেয়েদের উপর তার আসক্তিও তাদের বন্ম দেহোন্মন্ততার জন্মই শুধু নয়, ক্লফাদানী শুনেছে ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে সমানে সে তাদের রান্না-করা মাংস গেলে গোগ্রাসে। তাদের সঙ্গে তাদের তৈরী দেশী পচাই মন্ম পান

করে। আহার করে শৃকরের মত। ভালুকের মত রোমশ দেহ। কর্কশ
পুল। রসিকতার কৌতুকে মৃথধানার মৃহুর্তে যেন বানরের মৃথের সাদৃশ্য
পুটে ওঠে। চিৎকার করে গর্দভের মত। কিন্তু ক্রোধে সে বাঘের মত
ভয়কর।

এই সরকারেরই তো ছেলে! সরকার যথন তাকে প্রথম তার এই ঘরে সাধনের নামে এনে তার জীবনটাকে মহিষের স্নানে পদ্ধিল পশ্বলের মত করে তুলেছিল, সে স্বৃতি তার মনে আছে। আজ তার সব সরে গেছে। কিন্তু মোহিনীর বোধ করি তা সহু হবে না। ছেলেটা বাপের চেয়েও ভরত্বর। তার মেয়ে তার চেয়েও কোমল। সে হরতো প্রথম দিনেই শুকিয়ে যাবে। মরে যাবে মোহিনী।

দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে কুঞ্দাসী বললে, না। তা হয় না সরকার মশায়। আমি স্বপ্ন দেখি। প্রায় স্বপ্ন দেখি। আমার শশুরকে দেখি। তিনি শাসান। বলেন—অনিয়মে ফেটে মরে যাবে মেয়ে। আর যে সে অনিয়ম করবে, তার স্পাঘাত হবে।

দাসী জানে সাপকে সরকারের বড় ভর।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

অজয়তটে কেন্দুবিৰের কদমখণ্ডীর ঘাট ইতিহাস-বিখ্যাত—বিখ্যাত, শাস্ত্রমতে পুণ্যমহিমায় মহিমান্বিত। কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়নদন্ধানে গঙ্গান্ধানের সমান পুণ্য। কবিরাজ গোস্বামী জন্মদেব প্রভু এবং কবিপ্রিয়া পদ্মাবতী এই ঘাটেই নিত্য স্নান করতেন। প্রবাদ, কবিরাজ গোস্বামীর প্রার্থনায মা-গন্ধা উজান বেয়ে কদমখণ্ডীর ঘাটে এসে আবিভূতা হতেন। আছে, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিনে জয়দেব গোস্বামী গঙ্গালানে যেতেন। একবার ঘটনাচক্রে যাওয়া ঘটে নি। যাওয়া না-ঘটায় কবিরাজ গোস্বামীর ক্ষোভের আর শেষ ছিল না। সংক্রান্তির পূর্ববাত্তে চোথের জল ফেলে শয্যাগ্রহণ করেছিলেন। শেষরাত্রে স্থপ্ন দেখেছিলেন দেবী-জাহ্নবীকে। মকরবাহিনী হেসে বলেছিলেন—ক্ষোভ দুর কর; তুমি যেতে পারলে না যখন, তখন আমি আসব অজয়ের স্রোত বেয়ে কদমখণ্ডীর ঘাটে। তোমার স্পর্শে আমি ধন্ত হব। ঘুম ভেঙে কবির আর বিশ্বয়ের সীমা ছিল না। মনের মধ্যে দে এক প্রচণ্ড ছন্দ। এ কি স্বপ্ন ? না, সতাই দেবীর প্রত্যাদেশ ? কী করে বুঝবেন ? সন্দেহের দোলার তুলতে তুলতে গোস্বামী কদমখণ্ডীর ঘাটে গিয়ে উপনীত হতেই ঘাটের সম্মুথে অজ্ঞারে জলধারা থেকে দিব্য-মণিমর-ক্ত্বণ-পরা তুথানি অমলধবল বর্ণাভ হাত বেরিয়ে উর্ধে উঠেছিল—কবিকে সংকেত জানিয়েছিলেন, আমি এসেছি। অন্ত প্রবাদে বলে, গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমন্থল থেকে সেদিন গঙ্গার জল উজানে অজয়ের থাত বেয়ে কদমথগুরি ঘাটে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। এবং সেই অবধি কদমখণ্ডীর ঘাটে অজর-জ্লে সানে গঙ্গাসানের পূণা হয় বলে লোকের বিশাস। সে বিশাস আজও এই বিংশ শভানীতে যায় নি। আজও উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে দলে দলে স্নানার্থীরা ভিড় করে আসে। স্বতরাং আজ হতে প্রায় ছ শো পঁচিশ বংসর পূর্বে মাহুর্যের এ বিশাসের প্রগাঢ়তা এবং প্রচণ্ডতা অহুমান করতে কট হবে না। প্রতিটি লানপর্বেই এ অঞ্চলের লোকেরা হাজারে হাজারে ছুটে আসত।

তার উপর কবিরাজ গোস্বামীর কাল থেকে দীর্ঘ কয়েক শত বৎসর সমারোহ-সমৃদ্ধি-হীনতার পর কেন্দুবিৰ তখন সন্থ-সন্থ অভাবনীয় সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে রাধারমণ ব্রজ্বাসী কেন্দুবিশ্বে তীর্থদর্শনে এসে এখানে মহাস্তের গদি স্থাপন করেছেন। বর্ধমান-রাজবাড়ির पृष्ठि आकृष्ठे **राष्ट्र ।** वर्धमात्मत्र ताष्ट्रमत्रकारतत वारा ১७১৪ मकारम व्यर्थाৎ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন নচ্ড়ার মন্দির তৈরী হয়েছে। ওপারের শ্রামরূপার গড়ের যে এরাধাবিনোদজীউ বিগ্রহ অধিকারী বান্ধণদের বাড়িতে ছিলেন, দেই বিগ্রহ এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ওই নৃতন মন্দিরে। কবিরাজ গোস্বামী তার বাধামাধবকে নিয়েই বুন্দাবনে গিয়েছিলেন—সে বিগ্রহ বুন্দাবনে— এতদিন কেন্দুবিলের পার্টে কোন দেবতা ছিলেন না; রাধাবিনোদ এসে দেই স্থান পূর্ণ করেছেন। এবং রাধাবিনোদও কবিরাজ গোস্বামীর পূজা নিরেছেন, তাঁর গীতগোবিন্দ-গীত-হুধা শুনেছেন। লোকে বলে, শ্রামরূপার গড় তথন জৰল ছিল না—ছিল একটি সমুদ্ধ হুৰ্গ এবং মহারাজ বল্লালসেনের সঙ্গে বিরোধ করে কুমার লক্ষ্ণসেন এখানে এসে বাস করেছিলেন। তথনই কবির সঙ্গে মহারাজকুমারের পরিচয় হয়। রাধাবিনোদ কবিরাজ গোস্বামীর পূজা তথনই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কালক্রমে গড় ধ্বংস হল, অরণ্য এসে গ্রাস করলে ধ্বংসম্ভ পকে; রাধাবিনোদ তথন গিয়েছিলেন প্রজারী বান্ধণদের ঘরে; এইবার এসে অধিষ্ঠিত হলেন জন্মদেবের পার্টে, নৃতন প্রতিষ্ঠিত নবরত্বের মন্দিরে। মন্দিরের পশ্চিমেই ব্রঙ্গবাসী মহাস্কের গদি ও দেবালয়। চারিপাশে বসেছে বাজার। ওদিকে ইলামবাজার জহুবাজার হথবাজার বাণিজ্যের সমারোহে পরিণত হরেছে জমজমাট বন্দরে। কাব্দেই নিতাই মেলা বসত কদমখণ্ডীর ঘাটের উপরে চারিপাশে। কারণ, পঞ্জিকায় ছোটখাটো স্থানপর্বের তো অভাব নেই, হু-দশদিন অস্তর লেগেই আছে এবং মাহবের পুণ্যকামনারও শেষ নেই। অসহার মাহ্য দৈনন্দিন জীবনের অপচয় করে অপবয় করে। আবার অন্ত দিকে শুদ্ধ স্কৃষ্থ জীবনের সর্ববিধ ব্যভিচারে জীবনের অপচয় করে অপবয় করে। আবার অন্ত দিকে শুদ্ধ স্বস্থ জীবনের আনন্দের জন্ত লালায়িত হয়; সত্য-ন্তায়-সংয়ম-আত্মতাপে আলোকিত জীবন তার মনে পুশ্পিত বৃক্ষনীর্ষের মত নিজেকে স্থন্দর করে বিকশিত করে তোলবার স্বপ্ন দেখে। কোনটাই তার মিথ্যা নয়। তাই একটি স্নানে বহুপাপক্ষয়ের স্থযোগ সে ছাড়ে না। এমন সহজ প্রায়শ্চিত্তের পথ ছাড়লে সে বাঁচবে কী করে? আরও আছে, এই স্নানপর্ব উপলক্ষ্যে সমারোহের মধ্যে সে পায় উচ্ছ্ আল উল্লাস আস্বাদনের নৃতন ক্ষেত্র, পরোক্ষ প্রশ্রেষ। তাই সমৃদ্ধ অঞ্চলটির মধ্যে সত্য-সমৃদ্ধ কেন্দুবিলে কদমগণ্ডীর ঘাটে মেলা লেগেই আছে।

সেদিন চৈত্র মাসে মধুরুঞা-ত্রোদশী। এ আখ্যায়িকার আরম্ভ দোল্যাতা শুক্লপক্ষের প্রতিপদে; মধ্যে দোলপূর্ণিমা চলে গেছে; তারপর আজ কৃষ্ণক্ষের ত্রেদেশী। কেন্দুবিবের মন্দির-প্রাক্তণে গাছপালার পত্তপল্লবে কাণ্ডের গামে, গৃহন্থের বাড়ির দেওয়ালে এখনও আবীরের প্রলেপ ও রঙের দাগ মুছে ষার নি। লোকজনের কাপড়-চোপড়ে এখনও লালচে আভা ফুটে ররেছে। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ দিনে এত আৰীর এত রঙ মুছবার নর। আবার এল মধুক্কফা-ত্রয়োদশী। পঞ্জিকাকাবেরা লিখেছেন, এই ত্রয়োদশীতে বারুণী-গন্ধানান পর্ব। বহু শত স্থ্রহণে গন্ধান্ধানের পুণ্য একত্রিত করলে ষে ফল হয় এক বারুণী-গঙ্গাস্থানে সেই পুণ্যফলের অধিকারী হয় মাছ্য। স্থতরাং হাজারে হাজারে সেদিন যাত্রী এসে সমবেত হচ্ছে কদমখণ্ডীর ঘাটে। পণ্যসম্ভারের নৌকা নিয়ে ইলামবান্ধার জহুবান্ধার থেকে ব্যবসায়ীরা গতকাল থেকেই হাজির হয়েছে। মুরশিদাবাদ অঞ্চল থেকেও নৌকা এসেছে কয়েকখানা। কেউ এনেছে নৌকা-বোঝাই মাতৃর শীতলপাটি; কেউ এনেছে কাঁসা-পিতলের বাসন; কেউ পাথরের বাসনের নৌকা-পশ্চিম অঞ্লের পাথর থেকে তৈরী থালা বাটি ঘটি ইত্যাদি; আর স্থানীয় ভদ্ধবারের। এনেছে মশারি; চাষীরা এনেছে বাবৃই-খাসের আঁটি। গ্রীম্মকাল আসছে, এ সব জিনিস গৃহস্থের। প্রয়োজনমত কিনবে। মন্দিরের

দেবাইতরা মাধার নামাবলী পাগড়ির মত বেঁধে বসেছে; তারা মন্দিরে প্রণামী কুড়াচ্ছে, তাদের লোকজনেরা চারিপাশের দোকানে খাজনা আদার করে ফিরছে; মোহস্তের লোকজনেরাও নিজেদের এলাকার ঘুরছে। কালটিও মনোরম; শীত যাই-যাই করছে, বসস্তের বাতাস মধ্যে মধ্যে দমকা মেরে ছুটে আসছে; গাছপালায় নতুন পাতা দেখা দিয়েছে; ঝরাপাতা শিম্লের গাছগুলি রাঙা—রাঙা আর রাঙা; পলাশ ত্-চারটে গাছে এখনও ফুটে আছে। জয়দেব-মন্দিরের পিছনেই বড় মাধবীলতার স্থদীর্ঘ নমনীর ভালগুলির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পুস্তাত্তবকের সমাবেশ। আমের মুকুল প্রায় ঝরে এল। গুটি ধরেছে। বহুড়ার মুকুল দেখা দিছে।

অন্ধরের ওপারে গড়জঙ্গলের বিশাল শালবন কচিপাতার শ্রামলারণ্যে নরনাভিরাম হরে উঠেছে। এপার থেকে মনে হয় বসন্তের ফিকে নীল আকাশের প্রান্তদেশে কোন চিত্রকর যেন তুলির টানে কোমল সর্জ্ব রঙের দীর্ঘ একটি পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছে। ওদিকে চোথ পড়লে আর ফিরতে চায় না; জুড়িরে যায়। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণা বাতাসের দমকার শালফুল মহুয়া ও বহুড়া-মুকুলের মিশ্রিত গদ্ধ ভেসে আসছে। ওপারেও একটি ঘাটে ছোটখাটো ভিড় দেখা যাছে; নৌকাও জমে রয়েছে কতকগুলি। ওই ঘাটে নেমে যাবে সব শ্রামরপার গড়। মা শ্রামরপার য়ানে প্রণাম করে আসবে, মানস সিদ্ধির জন্ম ঢেলা বাঁধবে। এপার থেকেও লোক বাচ্ছে ওপারে। প্রতি বৎসরই যায়; এবার ভিড় বেশী। কারণ আছে। গড়ে শ্রামরপার স্থান থেকে থানিকটা পূর্বদিকে ইছাই ঘোষের দেউলে নাকি এক নবীন গোস্থামী এসে নতুন মঠ তৈরি করছে।

নবীন গোস্বামী এসেছে শভা ঘণ্টা বাজিয়ে, ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে। গোস্বামীর নাকি দেবতার মত রূপ, তেমনি তার মহিমা। সাক্ষাৎ দেবতা। ম্থের দিকে তাকানো যায় না। ধর্মতে সে বৈষ্ণব; কিছ সে মত অঙ্ত। সঙ্গে এনেছে এক অঞ্পম বিগ্রহ। কেউ বলে গোবিন্দ, কেউ বলে ছিভুজ বিষ্ণু, কেউ বলে উত্তট বিগ্রহ। কারণ রাধা বিহনে কি গোবিন্দ থাকেন? অবশ্য বৃন্দাবনে বাঁকেবিহারী আছেন, কিছ সে তাঁর গোপাল অর্থাৎ বাল্যভাব। আর বিষ্ণু কি ছিভুজ হন? না, তাঁর হাতে বাঁশী থাকে? এ

মৃতির এক হাতে বাশী, অপর হাতে চক্র। মৃথমণ্ডলে আশ্চর্ব একটি ভাবব্যঞ্জনা। হাসির মাধুর্বের চেরে যেন তেজ বেশী। ঠাম বহিম নয়; ঋজু মহিমায় পদ্মের উপর দাড়িয়ে আছেন।

কতকালের ইছাই ঘোষের দেউল; চারিদিকে ধ্বংসাবশেষ, শত শত বংসর ধরে শালবন ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করেছে। গাঁথনির ফাটলে ফাটলে বীক্ষ পড়ে গাছ জন্মেছে, মোটা শিকড়ের চাড়ে ফাটিয়েছে, স্ক্ষ শিকড়ের জাল বিস্তার করে—শত সহস্র গ্রন্থি দিয়ে তাকে আষ্টেপ্টে বেঁধেছে, মাথার উপরে কাশু শাখা বিস্তার করে পত্র-পল্লবের আবরণে দৃষ্টির অগোচর করে ছেয়ে ফেলেছে। পারে নি শুরু মূল দেউলটিকে কুক্ষিগত করতে; সে দেউল আজও শাল-বনম্পতির মাথা ছাড়িয়ে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এবং আশ্বর্থ গাঁথনি, এতটুকু ফাটে নি, কোথাও একটি বীক্ষ অক্ক্রিত হবার হযোগ পার নি, জন্মেছে শুরু কালো শাওলা—চূড়া থেকে বনিরাদ পর্যন্ত। শত শত বৎসরের বর্ষার ধারায় ধূলি-ধূসর অবস্থায় ভিজেছে; ফলে ওই সিষ্ক ধূলি-আন্তরণটিকে অবলম্বন করে জন্মেছে শাওলা। অনেক দূর থেকে মনে হয়, মন্দিরের চূড়ার আকারের এক টুকরো কালো মেঘ। কাছে গেলে মনে হয়, মালেরের চূড়ার আকারের এক টুকরো কালো মেঘ। কাছে গেলে বর্মা বায়—না, পাথর নয়, ইটেরই মন্দির, শাওলা পড়েছে।

ধর্মসকলের কালের শক্তি-উপাদক গোপভূমের মহাবীর ইছাই ঘোষ।
ভামরূপার গড় তাঁরই তুর্গ। আজ অরণ্যভূমের কুক্ষিগত। চারিপাশেই অরণ্য।
পশ্চিম এবং উত্তর দিকের বন পাতলা, বন ঠিক বলা চলে না—জঙ্গল বলতে
হয়। উত্তর দিকে থানিকটা বিক্ষিপ্ত জঙ্গলের পরই চাবের মাঠ, তারপর
অন্ধরের বক্তারোধী প্রশন্ত বাঁধ; দেকালে এই বাঁধই ছিল যুদ্ধের সমর নগরীর
প্রাচীর, আবার সাধারণ সময়ে পথের কাজও করত। বাঁধের পরই অজ্বরের
চরভূমি। পশ্চিমে থানিকটা দ্রে মৌজা গৌরাঙ্গপুর, আবও থানিকটা পশ্চিমে
মৃত্ত বা ইছাই ঘোষের পুরী এবং বিশাল তুর্গ—গভীর অরণ্যের মধ্যে
ধরংসাবশেষে পরিণত। দেউলের পূর্বে এবং দক্ষিণে ঘন শালবন। এই
স্থাবেইনীর মধ্যে অভয় অটুট দেউলটি চারিপাশের জঙ্গল কেটে ইটের ভূপ

পরিষ্কার করে সেকালের পাকা মেঝে বের করা হয়েছে। প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির উপর অতি ক্রত গতিতে শালকাঠ বাঁশ খড দিরে সারি সারি ঘর তৈরী হচ্ছে। দেউলের দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর। এককালে হয়তো সরোবর ছিল। এখন সাধারণ জ্ঞলাশম ছাড়া কিছু বলা চলে না। পূর্বদিকে পূর্বকাল থেকেই ছিল দেউলচম্বরে প্রবেশের তোরণ বা সিংহদার। তু দিকে তুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মত ধ্বংসস্তুপ। তার মধ্য দিয়েই চলে গেছে গাড়ি চলবার মত প্রশস্ত পথ, অরণ্য ভেদ করে চলে গিয়েছে অজয়ের ঘাটের দিকে। সেইথানেই হুটি পাকা মজবৃত থাম তৈরি করে প্রবেশদার করা হয়েছে এবং পুন্ধরিণী সমেত সমস্ত এলাকাটিকে ঘন শালখুঁটির বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। শালকাঠের খুঁটি, বাখারির বেড়ার দেওয়াল, খড়ের' চাল, পাকা মেঝে, শালকাঠের তৈরী আগড়, সামনে শালের খুঁটির উপর টানা কাটা পরচালা। যেন ফৌজী ছাউনি। অবশ্য বাখারির বেড়ার দেওয়ালে ভিতরে বাহিরে মাটির প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই ছাউনির চেহারা পালটে গিয়ে—আশ্রমের চেহারা নেবে। কিন্তু এরই মধ্যে রটনা রটেছে অনেক—লোকজন এসে এদিক-ওদিক দেখে কিছুক্ষণ থেকেই চলে গিয়েছে। অস্বন্তি বোধ করেছে।

এখানকার সমস্ত-কিছুর মধ্যেই তারা যেন নিজেদের জীবনের ছন্দ মেলাতে পারে না। এখানে উল্লাস আনন্দ মাছ্যস্কন, আবেষ্টনী সবই যেন গভীর গন্তীর দ্বির। দ্বির শাস্ত দহের মত; নামতে ভয় করে; অহুমান করতে পারে না, কী আছে ওর তলদেশে! নামবার মত শক্তিও নেই; ভয় হয় বোধ করি বা তলদেশে নামতে নামতে খাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। আরও আছে। এই গোস্বামী শুধু গোস্বামী নন, ইনি এখানকার ভূস্বামী হয়ে এসেছেন। এখানকার জমিদারী স্বস্বের ইজারা নিয়ে এসেছেন। খাস নবাবদপ্তর থেকে নজর-সেলামী দিয়ে বন্দোবন্ত নিয়েছেন। ব্যবস্থা পাকা কর্মেই সব করছেন তিনি, কিন্তু তবু পাকা মঠ করবার কল্পনা এখনও স্থগিত রেখেছেন। তার কারণ রাজসরকারের ভয়। বেণীমাধ্যের ভাঙা ধ্বজ্ঞার উপর তৈরী মিনার, বিশ্বনাথের প্রনো মন্দিরের মাথায় মসজিদের গছ্জ মাধ্যানন্দ চোথে দেখেছেন; বুন্দাবনের অধ্ভয় গোবিন্দ-মন্দিরের কথা

বছজনের কাছে ওনেছেন। বাংলা দেশে জাফর কুলীথার মত ভাষপরামণ নবাবের আমলেও মাহুষের এ ভয় দূর হয় নি। জাফর কুলীথাঁ এবং তাঁর আমীর-ওমরাহদের মধ্যে স্থায়পরারণ লোক অনেক আছে; কিন্তু 'শরফ' কাজীর মত লোকেরঁও অভাব নেই। নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ 'কাজী-শরফ'; ভণ্ড-ফকিবের অভিযোগে চুনাথালির জমিদার বুন্দাবনের প্রাণদণ্ড বিধান করেছিলেন। নবাব জাফর কুলীখাঁ—সমাট আলমগীরের পৌত্র স্থলতান আজিমুখান পর্যস্ত এ বিচারকে ত্যায়বিচার বলতে পারেন নি। জমিদার বুন্দাবনের প্রাণরক্ষার জন্ম সমাটের কাছে আবেদন করবেন বলে কাজীকে অহরোধ করেছিলেন প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখতে। কাজী তা শোনেন নি। বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বহস্তে তীর মেরে বৃন্দাবনকে বধ করে भाष्ठ रुद्धिल्लन। সংबाদ खरन मुबार पालमगीत खरुख निर्थिहिलन, "কাজী-শরফ থোদাকা তরফ।" অন্তদিকে সমন্ত বাংলার সামস্ত শক্তি তথন জাফর কুলীর প্রবল শক্তির চাপে নিন্তেজ; বছ স্থলে আঘাত থেয়ে নির্জীব। আজ মঠ-মন্দির গড়তে হলে নবাব-দরবারে যথারীতি অমুমতি ইত্যাদি নিয়ে করাই যুক্তিদকত। ঋধু বাংলার নবাবের নয়—দিল্লীর বাদশাহের ফরমানের জন্মও যথারীতি চেষ্টা হচ্ছে। ফরমান এলেই পাকা মঠ শুরু হবে।

প্রথম দিন যেদিন মাধবানন্দ এখানে এসে উপস্থিত হন, সেদিন দেউলের আশ্রমে আসবার আগে প্রথম এসে নেমেছিলেন কদমধন্তীর ঘাটে। কবিরাজ গোস্বামীর সাধনার পবিত্র কেন্দুবিলে শ্রীশ্রীরাধাবিনােদজীউকে প্রণাম করে তারপর এসে নেমেছেন এপারে নিজের আশ্রমে। জয়দেব গোস্বামীর মন্দির, রাধাবিনােদজীউ ঠাকুর ব্রাহ্মণ সেবায়েতদের। তার ওপাশে নিম্বার্ক স্প্রান্ধের সাধুরা এসে এক মঠ তুলেছেন। সেখানেও তিনি গিরেছিলেন। তাঁরই সঙ্গে পরিচয়ের পর কথা-প্রসঙ্গে কথাগুলি প্রেকাশ করেছিলেন। তাঁরই অশ্রমের স্বত্বের ক্থাই নয়—তত্ত্ব নিরেও কথা হয়েছিল।

কেন্দুবিষের মহাস্ত ভরত দাস সেদিন প্রথম পরিচয়ের পর মাধবানন্দের নৌকার এসে বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। তাঁর কৌতৃহল হয়েছিল নৌকার ধ্বকা দেখে। ধ্বকার প্রতীক তাঁর কাছে নতুন বলে মনে হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ ঝাণ্ডার অর্থ কী গোস্বামীজী? কৌনু কুলকা ঝাণ্ডা? অর্থাৎ কোন্ গুরুকুলের ধ্বজা ?

মাধবানন্দ হেসে বলেছিলেন, আমার গুরুই নিজের কুল প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছেন মহাস্ত মহারাজ। দেবতা তাঁকে দর্শন দিয়েছেন, বছরূপের মায়াকে দম্বরণ করে শুদ্ধ স্বরূপে দেখা দিয়ে এই ধ্বজা তাঁকে দিয়েছেন।

এ কথায় প্রথমটা বেশ কিছুক্ষণ স্থির অথচ কৌতুক-মেশানো দৃষ্টিতে মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহাস্ত; কিন্তু সে বাঙ্গ সে কৌতুকের উপহাসে এই তরুণ গোস্বামীটিকে কিছুতে উপহাসাম্পদ বলে মনে করতে পারলেন না। হঠাৎ মাধবানন্দের হাত ধরে বললেন, দেবতাকে দর্শন করাও ভাই; দেখি সমঝাতে চেষ্টা করি।

দেবতা দর্শন করে বলেছিলেন, পরমাপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষোত্তম ? রাধা বাদ দিয়ে খাম? এ যে ভাস্তি!

কানে আঙ্ল দিয়ে মাধবানন্দ বলেছিলেন, সে মীমাংসা হতে পারে আমার গুরুর সঙ্গে। আমাকে ও-কথা শুনতে নেই।

- —ভাল। তুমি কী বুঝেছ ভাই আমাকে বল?
- —নিজে যা বুঝি তা যখন সকল জনকে ৰোঝাতে পারব, তার আগে আমার সাক্ষাৎদর্শন হবে মহারাজ। তথন আমিই হব গুরু।
 - —তার অর্থ তুমি ভাই বলতে চাও না।
 - —যোগ্যতা না থাকলে বলতে নেই মহারাজ।

িকছুক্ষণ শুদ্ধ থেকে ভরত দাস বলেছিলেন, তোমার কথা প্রীথণ্ডের বাউল সাধক উদ্ধব আমাকে বলছিল। কৃষ্ণদেবের সঙ্গে তুমি স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্ব-বিচারের সময় মেলেটিতে উপস্থিত ছিলে। কৃষ্ণদেব হার মেনে দীক্ষা নিলেন, তুমি পালিয়ে গেলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে।

শাস্তম্বরে বাধা দিয়ে মাধবানন্দ বললেন, আমি কোনও প্রতিজ্ঞা করি নি মহারাজ। চুক্তিনামায় আমি স্বাক্ষর দিই নি।

—তোমার গুরু দিয়েছিলেন।

শাস্তম্বরেই আবার মাধবানন্দ বললেন, ক্লফদেব কোন কালেই আমার खरू हिल्म ना महास्वी।

- —ছিলেন না ?
- —না। ক্লফদেব সন্ন্যাসী নন; আমি দীক্ষার পূর্ব থেকেই সন্ন্যাসের পথ অবস্বরণ করছি। তিনি আমার আচার্য মাত্র।
 - —হাঁ। কিছ--
 - -की वनून ?
- —আচার্য রাধামোহন পরকীয়াতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে শোনবার পরও তোমার সন্দেহের নিরসন হয় নি ? সাক্ষাৎ চৈতন্তস্ত্ররূপ চৈতন্ত মহা-প্রভূর উপলব্ধি তাঁর নির্দেশ, একেও তুমি ভ্রাস্তি মনে কর ?

মাধবানন্দ একটু হাসলেন শুধু। কোনও উত্তর দিলেন না।

অসহিষ্ণু হয়েই ভরত দাস ব্রজবাসী প্রশ্ন করলেন, জবাব তো দেনা চাহি ভাই। বাতাইয়ে।

মাধবানন্দ বললেন, ভ্রান্তি আমারই মহারাজ। যা দেবী সর্বভূতেষ্ ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা তিনি এবং সত্যক্রপিণী অভিন্ন তাঁর ভ্রান্তিরূপিণী রূপ তিনিই সম্বরণ করে আমাকে তাঁর সত্যরূপ দেখাবেন।

- —অর্থাৎ এখন এই তোমার কাছে পর্ম সত্য।
- —মহারাজ, ব্রহ্মকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরাই বিশ্বদহনকারী স্থের্বর দাহিকাশক্তিকে অতিক্রম করে তাঁর মধ্যস্থিত পুরুষের সঙ্গে একাত্মতা অরুভব
 করেছেন। যাঁরা পারেন নি, তাঁরা ওই বিশ্বাসে স্থের্বর সমীপস্থ হবার চেষ্টা
 করলে পুড়ে ছাই হয়ে যান। তর্ক আমি করব না, কিন্তু মহাপ্রভু যে
 পরকীয়াতত্ত্বের সাধনার মধ্যে অহরহ আনন্দময় সন্তার সঙ্গে বিরহ-মিলনের
 অমৃতরস আশাদন করেছেন, সাধারণ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাউল বৈরাগী মোহগ্রন্থ গৃহত্বের পক্ষে সে সাধনা কি সম্ভব ? চোথে কি দেখছেন না
 দেশের অবস্থা ?

মহাস্ত ভরত দাস আবার নবীন গোস্বামীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সেই কারণেই ভামস্থনবের মুখের হাসি মুছে দিয়েছ, আনন্দময় প্রেময়য়কে তেজোময় করে নির্মাণ করেছ?

উত্তর দিলেন না মাধবানন্দ।

ভরত দাস বললেন, ওই তেজে যদি তোমাকেই দক্ষ করে গোস্বামীজী!

মাধবানন্দ হেসে বললেন, তাতে ছংখ করব না। দশ্ধ হতে হতে বলব— "বায়ুরনিলমন্তমথেদং ভন্মান্তং শরীরং ও ক্রতোম্মর ক্রতংম্মর ক্রতোম্মর ক্রতংম্মর।"

ভরত দাস আপন মনে বলে গেলেন, ছঁ। প্রাণবায়ু মহাবায়ুর অমৃতে লীন হোক, এ দেহ ভন্মে পরিণত হোক। হে অগ্নি, হে তেজ, আমার যা শ্বরণীয় তা শ্বরণ কর; আমার ক্বতকর্মও শ্বরণ কর। তুমি জ্ঞানবাদী পণ্ডিত, ভাল কথা। অগ্নি নিম্নে যজ্ঞের ছলে থেলা করতে ভালবাস। ভাল ভাই, তোমার পথ ভোমার। কিন্তু এখানে তুমি এলে কেন? এই কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দের পাটে? জ্ঞান, এখানে তিনি নিজে হাতে গীতগোবিন্দের পাদপূরণ করে লিখেছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্"! রাধার চরণ মাথায় ধরে পরকীয়া-তত্তকে মাহ্মষের শিরোধার্য করে দিয়ে গিয়েছেন। এ তো ভোমার তীর্থ নয়।

মাধবানন্দ বললেন, যেথানে সাধনপীঠ সেথানেই তীর্থ। সব সাধনাই সমান পবিত্র। তাই এথানে যথন এলাম, তথন সর্বাগ্রে কবিরাজ গোস্বামীর পাটেই প্রণাম জানাতে নামলাম। এইবার ওপারে যাব।

- —ওপারে 👂 চকিত হলেন মহাস্ত ভরত দাস।—ওপারে কোথায় ?
- —ইছাই ঘোষের দেউলে। মৌজা গৌরাঙ্গপুরে। ওথানেই মঠ স্থাপনের ইচ্ছা আছে।
 - —গৌরাঙ্গপুর—দেউল এলাকা—তা হলে—
 - —আমরাই বন্দোবন্ত নিয়েছি।
 - —গড় এলাকাও বন্দোবস্ত নিয়েছেন তা *হলে* ?
 - —**李**川 I
 - —বন্দোবস্ত পাকা করেই এসেছেন তা হলে! কিন্তু—
 - **—की** ?
- ওই বনের মধ্যে মঠ করবেন ? কেন, বনের মধ্যে কেন লোকালয় ছেড়ে ?

মাধবানন্দ হেসে বললেন, তপস্থার জ্বন্থ তো অরণ্যই প্রশস্ত স্থান মহারাজ। —তা হয়তো বটে। কিন্তু এ এলাকা যে গীতগোবিন্দের এলাকা। বিপরীত হার হলেই বেহুর বাজে ভাই। বেহুর বাজলেই যে বিরোধ অবশ্রস্তাবী হয়ে ওঠে।

হেসে মাধবানন্দ বললেন, কিসের বেহুর, কিসের বিরোধ মহারাজ? বজলীলার পর তো মধ্রা। কংসবধ। এপারে বজধাম—ওপারে মধ্রা—
মধ্যে যম্না। এখানেও সেই লীলার নতুন প্রকাশ যদি হয় তো হোক না
মহাস্ত মহারাজ, ক্ষতি কী?

মহাস্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—সে দৃষ্টিতে বিশ্বরের আর সীমা ছিল না। কয়েক মৃহুর্ত শুদ্ধ থেকে আবার মাধবানন বললেন, তপশু। মাহুষের একাস্তভাবে নিজস্ব মহাস্ত মহারাজ; তত্ত্ব নিয়ে বিরোধ আমি করব না।

মহাস্ত শুদ্ধ হয়েই রইলেন। তারপুর বললেন, আচ্ছা ভাই, দেখা যাক। নৌকা থেকে নেমে চলে গেলেন তিনি।

মাধবানন্দের নৌকা কদমখণ্ডীর ঘাট থেকে নোঙর তুলল। সরতে লাগল নৌকা, হাল ঘুরল—নৌকা বিপরীতমুখী হয়ে খানিকটা নীচের দিকে এসে এপারে দেউলের সামনের ঘাটে ভিড়ল।

মাধবানন্দ একথানি আসনের উপর দিগস্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন। ঠোঁট নড়ছিল তাঁর। একটি শ্লোক—বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই মুহুস্বরে তিনি আরুত্তি করছিলেন—

"য: কৌমারহর: স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা স্তে চোমিলিত মালতী স্থরভর: প্রোঢ়া কদম্বানিলা:। সা চৈবান্মি তথাপি তত্ত্ব স্থরতব্যাপার লীলাবিধৌ রেবা রোধোসি বেতসীতক্ষতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"

চৈতন্মস্বরূপ প্রেমবিভার শ্রীচৈতন্ম মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভোর হয়ে স্বর্গনাথদেবের রথের সামনে দাঁড়িয়ে দরবিগলিত ধারার মধ্যে গদগদ কঠে এই শ্লোক আর্ত্তি করেছিলেন।

এর মর্ম মাধবানন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। পরকীয়া নারিকার নায়ক-মিলনাগ্রহ এবং আবেগের কথা কে না জানে, অস্থমান করতে পারে? আরুসমর্পণের গভীরতা বে অতলম্পর্নী! সে যে অকুলে ঝাঁপ দেওরা।
কুল না হারালে অকুলে ঝাঁপ দের কী করে? স্বাকীরা থাকেন কুলের মধ্যে।
কুল্লিনীরূপিণী লক্ষ্মীকে পাশে নিয়ে যত্কুলপতি গোবিন্দ নিজেও সম্পর্ক
এবং রজের স্ত্রে বাঁধা; সর্বাগ্রে তিনি যাদবদের, সেখানে তিনি কারও
পতি কারও পিতা কারও পুত্র; সেখানে তিনি রাজ্ঞা—সেখানে তিনি পালন-কর্তা—সেখানে তিনি দণ্ডদাতা। যাদব-বংশের ধর্ম আর রাজধর্মের তুই বাঁধা
কুলের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। কুল হারালে অকুলের যাত্রীর
তরী বাঁধবার ভাসাবার ওখানে ঘাট কোথার? পরকীয়াকে পাশে নিয়ে
গোবিন্দ কুল ভাসিয়ে অকুল শারাবারের মত অপার প্রেমরন্সের তরক্ষয়ে।
সেখানে তিনি স্বার। রাস্বিলাসে—যোল শো গোপীর স্কলের পাশেই
রাস্বিহারী। জাত নাই কুল নাই মান নাই মর্যাদা নাই, অকুলের জন্ম আকুল
হয়ে কুল ছেড়ে তিমির-রাত্রে ত্র্গমে বের হতে পারলেই শুনতে পাবে—ধীর
সমীরে যম্নাতীরে বংশী বাজছে। তিনি জানেন। এ ভজনার মাধুর্য পঙ্কোত্ত
পঙ্কজের মত স্ব্র্যালিন্ত-মৃক্ত, এ পুল্পের মর্ম মধুর-আস্বাদ অমৃতত্ত্ল্য।
তবু এ স্বার জন্ম নর। সাধারণের নয়। এ অধিকার নিদ্ধাম ভক্তের।

রূপ গোস্থামীর শ্লোকও তাঁর মনে আছে। কিছু তবু তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি দে-কথাও জানেন। বৈকৃষ্ঠের অধিশ্বরী ঈশরের শক্তিরপিণী লক্ষ্মী স্থামী-প্রেমের ঐশ্বর্য ও সকল গৌরবের অধিকারিণী হয়েও তৃপ্ত হন নি; মনে হয়েছিল এর চেয়েও মধুরতম মাধুর্য আছে। সেই মাধুর্যের আস্থাদনের জন্ম তিনিই ছাপরে গোক্লে পরকীয়া রাধা হয়েছিলেন। তবু না। তবু না। তবু না। এ সাধনা বিকৃত হলে যে কী পরিণতি হয় সে তিনি জানেন; চোখে দেখেছেন; মর্মে মর্মে অম্ভব করেছেন। অমৃত বিষ হয়, জ্যোতি অদ্ধ হয়; জীবনচন্দন গলিত পঙ্কে পরিণত হয়; নরকাস্থরের উদ্ভব হয়।

যা চৈততা মহাপ্রভুর জন্ত, তা সাধারণের জন্ত নয়। তিনি তো দেখেছেন তাঁর বাপের জীবনের ধর্ম-সাধনার স্বরূপ। সারা দেশে পরকীয়া এবং কিশোরী-ভজনের পরিণতি। এ ছাড়াও তাঁর মন চৈততাময় পুরুষের পাশে আর কোন রূপকে কল্পনা করতে পারে না। নিত্য-চৈতত্তে- স্থিতিমান আনন্দ-ধ্যানে মগ্ন—চিরস্থন্দর পুরুষোত্তম, তিনি যে পূর্ণ, মাধুর্ধ প্রথম্ব সবই তাঁর মধ্যে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত। আন্ধ কয়েক পুরুষের মোহাচ্ছয়তায় সেই বিন্দুর ধ্যান বস্তুজগতে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। স্থির জ্যোতির্বিন্দুকে হারিয়ে আলো-আঁধারির মোহে দিক্লান্তি ঘটেছে। পুরে পুরে অন্ধকার জমেছে বংশকে ঘিরে। পরলোকে উর্ধাতন পুরুষেরা আলোক-ভৃষ্ণায় আকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন উত্তরপুরুষের দিকে। সেই হারানো বংশতপস্থাকে তিনি পুনুরুদ্ধার কয়বেন। তাই তাঁর ধ্যান এক অন্ধিতীয় পূর্ণপুরুষের ধ্যান। সকল দীলার মধ্যে তিনিই লীলাময়। বুন্দাবন থেকে প্রভাস পর্যন্ত তিনি একক; সকল-কিছুকে মিথ্যার মত অলীকের মত বর্জন করে পিছনে রেখে সম্মুথে অগ্রসর হতে মুহুর্ত বিলম্ব ঘটে নি তাঁর। কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের এক বিন্দু তাঁর মন স্পর্শ করে নি। প্রভাদের তটে বংশলোপের থেলা তিনি নিজেই রচনা করে গেছেন। তিনি পূর্ণ। তাঁর উপাসনা পূর্ণ এককের উপাসনা।

শুধু গোবিন্দ। শুধু শ্রাম। পূর্ণপুরুষোত্তম। চৈতত্তের উৎস জ্যোতির্বিন্দু। গীতাতে তিনি স্বমুথে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—মামেকং শরণং ব্রজ। দর্শন করবে সে তাঁর সেই বিশ্বরূপ—

"অমাদি দেব পুরুষ পুরাণ।"

ব্দার্থ থার প্রথম যোগ, বিতীয় সন্ন্যাস, তৃতীয় ধ্যান। নারীকে দ্রেরাধ। সে-ই ভাঙে ধ্যান—সে-ই ভাঙে সন্ন্যাস—সে-ই ভাঙে ব্রহ্মচর্য। বস্তু-জগতের মোহ সে, চৈতল্যকে সে আছেন্ন করে, জ্যোতিকে সে শিথাময় বহ্নিকরে তোলে ইন্ধনের মত। অনেক মর্ময়্বণা ভোগ করে ভাগ্যক্রমে এই সত্যকে তিনি আবিন্ধার করেছেন। মালিহাটিতে স্বকীয়া-মতের পরাজ্যের পর কাটোয়ার ঘাটে জয়পুরের কৃষ্ণদেব আচার্য থেকে তাঁর অম্বচরবর্গ যথন পরকীয়া-মতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন—তাঁর দীক্ষাগ্রহণের পালা এগিয়ে আসহ, তথন তাঁর অস্তরাত্মা মর্মান্তিক মন্ত্রণায় অধীর অস্থির হয়ে উঠেছিল, আকাশে মাটিতে গঙ্গার জবল ভেসে উঠেছিল তাঁর মায়ের পাথরের মৃতির মৃথের মত মুখথানি। অনেক মন্ত্রণা তাঁর জীবনে তরু তাঁর মূথে পাথরেক্ব কাঠিল। বাতাসে অম্বত্ব করেছিলেন তাঁর নিশ্বাসের উফ্লপর্ল। তিনি পালিয়ে

গিয়েছিলেন সেখান থেকে। তারপর ঘুরলেন সারা ভারতবর্ষ। তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন। চার ধাম পরিক্রমা করলেন। কোথায় আছে পথের সন্ধান ? কোথার পাওয়া যার মৃতসঞ্জীবনী ? মহারাষ্ট্রে গেলেন—নাসিকে। দেখলেন সেখানে হিন্দুকুল-তিলক ছত্রপতি শিবাজীর মারাঠা জাতিকে। ছত্রপতির সাধনা তথন বিগত; শম্ভাজী স্থরা এবং নারীর আসজিতে ভূবে বিক্বত হয়ে মুঘল কারাগারে বন্দী হয়ে প্রাণ দিয়েছে। ছত্রপতির বংশধরেরা তু ভাগে ভাগ হয়ে দাবার ঘুঁটির মত পেশাবাদের হাতের ইন্ধিতে পরিচালিত হচ্ছে। বাজপুতানা ঘুবলেন, বিশ্বরের সীমা বইল না। এত বড় তেজ এত বড় বীর্য, কিন্তু রন্ধে, রন্ধে, কী ব্যাভিচারের ব্যাধি! কী ব্যসন! কী বিলাস! মীরার রণছোড়জীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন তিনি। কেন রণছোড়জী হলে তুমি ? কেন পরিবর্তন করলে তোমার কুফক্তেরে সেই মহিমময় রূপ ? পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়ত হৃদ্ধতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভব কি আর তুমি হবে না? বৈষ্ণব পরকীয়া-তত্ত্বের প্রভাবে সমগ্র দেশের সাধারণ সমাজের মধ্যেও দেখে এলেন এই বিক্বতির প্রতিচ্ছায়। মঠে দেখে এলেন এই বিক্বতি। ফেরার পথে গোকুলে হঠাৎ দেখা পেলেন এক গোস্বামী সাধুর। তাঁর কাছে তিনি পেলেন সাস্থনা।

তিনি বললেন, তোর আত্মা-নারায়ণ তো জেগেছে। সে যা বলে তাই কর্। ছনিয়া চুঁড়ে ঘুরে মরছিস তুই, আর সে তোর হাদয়-মান্দলমে খাড়া হয়ে ফুকারছে, তু শুনতা নেহি?

তারপর হেসে বললেন, কাল তো আ গয়া। হামারা আঁথো কি সামনে মে দেখতা হুঁ কি ভৈরব তো নাচনেকো লিয়ে খাড়া হো গয়া হ-হ-হ মত। থৈ-তা থৈ—! হ-হ-হ!

সেদিন গোস্বামীর গন্তীর কণ্ঠস্বরের কথাগুলি তাঁর সমস্ত স্নায়্তন্ত্রীতে ভেরীনাদের ধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনি তোলে ধাতৃপাত্রে ধাতৃষ্বন্ধে ধাতৃষ্ঠে, তেমনি এক প্রতিধ্বনি তুলেছিল।

সেখান থেকেই তিনি নৃতন তম্ব নিয়ে ফিরলেন। গোন্থামীর কাছেও তিনি দীক্ষা নেন নি। তাঁর দীক্ষা তাঁর অন্তরপুরুষের কাছে। তবে গোস্বামীর সঙ্গে মাসধানেক ছিলেন তিনি। অনেক কথা তাঁর সঙ্গে হয়েছে। সে-সব কথা কাউকে বলবার নয়। কাল পার্যপরিবর্তন করেনে, সময় এসেছে। সেই সব নিয়ে অনেক কথা। সে গোস্বামী আর কেউ নন—রাজিন্দর গিরি গোঁসাই।

সেখান থেকেই এই অভিনব গোবিন্দমূর্তি নিয়ে তিনি বাংলা দেশে ফিরেছেন। কিছুদিন নৌকার নৌকারই কাটিয়ে অনেক সন্ধান করে এই গড় জন্মলের সন্ধান পেয়ে, এই জন্মলের একাংশ বন্দোবন্ত নিয়ে এখানে এসেছেন।

অর্থের অভাব তাঁর ছিল না। তাঁর পিতা বোধ করি পুত্রের এই সন্মাস-প্রীতির কারণ অমুমান করে মনে মনে লজ্জা বেদনা চুই-ই অমুভব করেছিলেন, তাই মৃত্যুকালে তাঁর বিশ্বন্ত নারেবকে দিয়ে পাঠিরে দিয়েছিলেন একটি পেটিকা; তাতে ছিল লক্ষাধিক টাকা মূল্যের কিছু হীরা-জহরত। লিখেছিলেন, "এগুলি পিতৃপুরুষ আমাদের গৃহদেবতাদের জ্ব্যু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতারা তো ব্যবহার করেন না, দেবতাদের নামে চিহ্নিত হইরা ঘরের সিন্দুকেই মজুত ছিল। ছিল অবশ্র আরও অনেক। যুগল-বিগ্রহের গোবিন্দের বুকে কৌস্তভের মত ঝুলাবার জন্ম একখানা তুর্লভ হীরা ছিল; সেখানা চোরে চুরি করিয়াছে। তুইছড়া পারশু মুক্তার মালা ছিল; দে মালা তুইছড়ার একছড়া আমাদের এক পূর্বপুরুষ নাকি দিল্লীতে বাদশাহী দরবারে খেলাত দিয়াছিলেন, আর একছড়া অন্ত একজন তাঁহার প্রণরিনীকে পরাইয়া দিরাছিলেন। এ সব অবশ্র কানা-ঘুষা কথা। আমাদের হিসাব-নিকাশের খাতার কোন ধরচ নাই, অথচ মজুতও নাই। কিছু জড়োয়া বংশের ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় নিথোঁজ হইয়াছে। একথানি ছুর্লভ ও ছোট তক্তির আকারের পান্না-বসানো বাজ্বদ্ধ ছিল রাধারাণীর। সেধানি নিথোঁজ হর আমার পিতা ও পিতৃব্যেরা যখন পৃথক হন তখন। পান্নাখানি অবিকল তোমার বিমাতার সিঁথিতে যে পান্না আছে তারই অফুরূপ। অনেকে সন্দেহ করে এথানি সেইথানিই। আমি এথানি আমার ছোট খুড়ার সংকটের সময় কিনিয়াছিলাম। তোমার মা লন নাই, বিমাতা লইয়াছেন। বর্তমানে আমাদের দেবত্তের সকল শরিকের অংশ কিনিয়া দেবতের যোল আনার মালিক হওয়া স্ত্রে এই অবশিষ্ট দেবনামান্ধিত জহরতগুলির বোল আনার মালিক হিসাবেই তোমার কাছে পাঠাইতেছি। শিতৃত্বের দাবিতে অন্ধরোধ করিতেছি

যে, আমাদের বংশের যে সাধনার দেবতা হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সাক্ষাৎকার ও

অন্থতন হইত, যে সাধনা কয়েক পুরুষ ধরিয়া আমরা ভূসম্পত্তি ও অর্থ-রৌপ্যের
ন্তুপের তলায় চাপা দিয়াছি, তুমিই যখন সেই সাধনা উদ্ধারে ক্বতসংক্রা,
খানিকটা উদ্ধারও করিয়াছ, তখন তুমি এইগুলি য়থাস্থানে পৌছাইয়া দিবার
জন্মই গ্রহণ করিবে। আর আমাদের পূর্বপূরুষের পঞ্জিত ও তত্ত্ত হিসাবে

অর্জন করা কয়েক শত বিঘা ব্রহ্মত্র জমি যাহা আমার ভাগে পড়িয়াছে আমার
অন্তিম কালে তোমাকেই একমাত্র ভাযায় উত্তরাধিকারী জানিয়া তোমাকেই

একক দিয়া গেলাম। অন্তান্ত জমিদারী সম্পত্তি তোমার বৈমাত্রের প্রাতা
রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য হিসাবে পাইবেন। এই ব্রহ্মত্রের সহিত কোন প্রকার
বৈষরিক চাতৃরীর সংস্পর্শ নাই; স্বতরাং ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবে না।
করিলে প্রকারান্তরে আমাকেও তোমার অস্বীকার করা হইবে জানিবে। ইতি।

হীরা-জহরত এবং সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেছেন এই কর্মের জন্মই।
তাঁর পিতার মৃত্যু হয় গোকুল-বুন্দাবন থেকে ফেরার অব্যবহিত পরেই।
কাশীতে এসে সংবাদ ও দানগুলি পান। হীরা-জহরতের অধিকাংশগুলি
বিক্রয় করে প্রায় তুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। তাঁর মায়ের দেওয়া
অলঙ্কারের দক্ষন কিছু টাকা আগে থেকেই তাঁর হাতে ছিল। সেই
অর্থ সম্বল করে কয়েকথানি নৌকা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে এসে সর্বাগ্রে
দেখা করেন ভাইয়ের সঙ্গে। ভাইকেই বললেন, ব্রহ্মত্র জমি থেকে নিত্য
ত্ব মণ চালের ব্যবস্থা কি সম্ভব ? ক্বাকের আয়া আংশ দিয়ে তা কি পাওয়া
বেতে পারে ?

ভাই বললেন, বংসরে পাঁচ শো মণ চালেরই বন্দোবন্ত আছে। নতুন বন্দোবন্ত করলে হয়তো ওটা ছ শো মণে অনায়াসে দাঁড়াতে পারবে। ওর সঙ্গে আমিও কিছু যোগ করে দিতে চাই।

মাধবানন্দ বললেন, না। প্রয়োজন হলে হাত পাতব। তথন দিও।
এখন আর-একটি কাজ করে দাও। একটি নিভৃত নিরাপদ ছান।
যেখানে মঠ করে নিরুপস্তবে থাকতে পারি—রাজকুল ভক্তকুল উভয়
কুল থেয়ুক।

ভাই অনেক খুঁজে অনেক বিবেচনা করে শ্রামরূপার গড় ইছাই ঘোষের দেউল এবং তৎসংলগ্ন স্থানগুলির স্থামিত্ব আয়ন্ত করে দলিল হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও।

মাধবানন্দ এর পরই পাঠিয়ে দিলেন তাঁর করেকজ্বন শিশুকে—সঙ্গে দিলেন বাপের আমলের ইমারত তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম-চারীকে। বললেন, সামাগ্র ভাবে আশ্রমের মত করে পত্তন করে দিন। সেথানে বসে ধীরে ধীরে মঠ তৈরী করে নেব আমি। আর নৌকার উপর থাকতে পারছি না। ভূমির উপর আসন কববার জন্ম উন্মেখ হয়ে উঠেছি আমি।

এই আশ্রম তাঁর সেই বহু আকাক্ষার আশ্রম। এখানেই আসন করে বসে তিনি চৈতগ্রময় পুরুষকে আহ্বান করবেন। ওপারে জয়দেব গোস্বামীর বৃন্দাবনলীলার নায়ক রাধাবিনোদকে বলবেন—বাঁশী ছেড়ে অসি ধর। কংসারি রূপে জাগ্রত হও।

व्याक मधुक्का-जारमानगा।

মাধবানন্দ ভোরবেলায় অন্ধয়ের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ওপারে কেন্দুলীর ঘাটে জনতার সমাবেশ দেখে বিশ্বিত হলেন। এত লোক !

জনতা তিনি অনেক দেখেছেন। কৌতৃহল তাঁর নেই। সামাশ্র উপলক্ষ্য পেলেই মামুষ যে কেন এমন করে ছুটে আসে তিনি জানেন।

খুঁজতে আসে। জীবনে যা চায় তাই খুঁজতে আসে।
স্থান সেরে উঠে আবার একবার ঘুরে দাঁড়ালেন।
ওটা ? ও কার ধ্বজা উড়ছে ?

একটা গাছের উপর একটা লাল রঙের ধ্বজা উড়ছে। নদীর ধারে একটা হাজী। কয়েকটা ঘোড়া। ধ্বজার প্রতীক-চিহ্ন কার ম

গোস্বামী-সম্প্রদারের প্রতীক বলেই তো মনে হচ্ছে! সম্ভবত পুরীধামে দোলযাত্রার পর গোস্বামীদের কোন দল উত্তর-ভারতে ফিরছেন। ক্রতপদে স্বাশ্রমে ফিরে তিনি ডাকলেন, শ্রামানন্দ!

—গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দেরই সমবয়সী সবল ব্যারামপুইদেহ একজন শিশু এসে দাঁড়াল।
মাধবানন্দ বললেন, আমি একবার ওপারে যাচিছ; কেন্দুলীতে রাধাবিনোদকে প্রণাম করে আসি। প্রভুর মঙ্গলারতি হরে গেছে, তুমি বাল্যভোগের ব্যবস্থা কর। একটু চুপ করে খেকে বললেন, মনে হচ্ছে ওপারে
গোকুলের গোস্থামীদের একটি দল এসেছে, দেখে আসি।

গৈরিক উত্তরীয়থানি টেনে নিয়ে কাঁধে ফেললেন। গৈরিক নামাবলীর মন্তকাবরণটি মাথায় জড়িয়ে নিয়ে দণ্ড হাতে বেরিয়ে পড়লেন।

গোপালানন্দ বিরাটদেহ সন্মাসী; আশ্রমের দাওরার অইপ্রহরই বসে আছে তার লোহদণ্ড হাতে নিয়ে—সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠল।
মাধবানন্দ বললেন, না।

আশ্রম থেকে বের হয়ে তিনি বনের পথ ধরলেন। বনে বনে খ্যামরূপার গড় পর্যন্ত গিয়ে দেখান থেকে রক্তনালার মাঠ পার হয়ে কেন্দুলীর সামনা-नामनि चलतात्र घाटि शिरा छेर्रेटरन। मिथान (थटक नोका निरा ७) । যাবেন। দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম করতেই যেখানে বেরিয়েছেন, সেখানে শ্রামরপাকে প্রণাম না-করে যাবেন—সে কি হর ? আছাশক্তি, যোগমারা চৈতক্তমন্ত্র সন্তার আধারস্বরূপিণী; ফুলের যেমন বৃস্ত, চৈতক্তমন্ত্র সন্তার তেমনি আছাশক্তি পরমাপ্রকৃতি; আধারের মত, বৃস্তের মত ধারিণী। নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভূতা। ইনি সেদিন আবিভূতি হয়ে কংসাস্থরের হিংসানলে নিজেকে আছতি না-দিলে পৃথিবী দেবকীনন্দনকে পেত না। ভাগবতে সেই হিসাবে আতাশক্তি পূর্ণ চৈতগ্রস্বরূপ পুরুষোত্তমের ভগিনী। মাধবানন্দের নিজের সাধনায় এই শক্তিসভাকে বাদ দিয়া চৈতগ্রসভার উপাসনায় বিদ্ধি নেই। সং শুদ্ধ সংযত শক্তির লালনেই চৈতক্সসভার জ্যোতির্মর অমৃতময় প্রকাশ। আপন ভাবনাতেই মগ্ন হরে পথ চলছিলেন মাধবানন। কিন্তু এ পথেও আজ লোকের ভিড়। ওপার থেকে এপারে এসে শ্রামরূপাকে প্রণাম করে মধুরুঞ্চা-ত্রয়োদশীর স্নানপুণ্যকে বাড়িয়ে ঘোল আনাকে আঠারো স্থানা করে তবে ফিরবে। তিনি এ পথ ছেড়েও গভীর বনের পথ ধরলেন। নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে কাঠুরিরাদের, ঔষধ-সংগ্রহকারীদের, শিকারীদের भारत-ठमा भथ। চারিপাশে প্রাচীনকালের তুর্<mark>গের ধ্বংসাবশেষ। মঞ্জে</mark>-স্থাসা পরিধা, স্থদৃঢ় স্থউচ্চ মাটির প্রাকার, ভাঙা পাঁচিল, খিলানের পর विनान, ভाঙা মন্দির, নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বিশাল এক বটের ছায়ায়

নবতিপর জীর্ণ অসাড়দেহ পঙ্গু এক প্রাচীনের মত নিস্তরক স্বপ্নহীন তন্ত্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যেন পড়ে আছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে শালগাছ জন্মেছে। তার উপর অজস্র লতাজাল। নীচে অজস্র গুলা। অনস্তমূল শতমুথী কচু আলকুসী।

বনের এই মর্মস্থলে চুকেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অপরূপ শব্দঝন্ধারে বনস্থলী ভবে গেছে। যেন একটা বিরাট সেতার বান্ধছে ছনের গতিতে— জোরারীর তারগুলি ঝন্ধার তুলছে। তার সঙ্গে গন্ধ। নিশাস ভরে গেছে তাঁর। চোথ জুড়িয়ে গেছে। কচি সবুজের ঢেউ বইছে অরণ্যে, তার মধ্যে নানা বর্ণচ্ছটা। অরণ্যভূমিতে বসস্ত যেন পরিপূর্ণ প্রকাশে প্রকাশিত। বসস্তেরও আদি মধ্য অস্ত আছে—শৈশব যৌবন বার্ধক্য আছে। অরণ্যের তৃণাঙ্কুর থেকে শালশীর্ষের রক্তাভ কিশলর-বৃস্তে, নবোদগত মঞ্জরীর মধ্যে বসস্ত যেন নবকিশোরের মূর্তি ধরে আদন পেতেছে। পাতায় পাতার, कृत्न कत्न ज्ञान शास्त्र भारमा राम प्राची कर्ने के हैं राम উঠেছে, কত পাথির কত গানে সে এক সঙ্গীতের ঐকতান ঝঙ্কত হচ্ছে; তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এবং ভ্রমরের অপ্রাস্ত গুঞ্জন। সেতারের জোরারীর তারগুলির ঝঙ্কাবের মত। হুটো ভ্রমর তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটানা ভোঁ-ওঁ শব্দ করে পরম্পরকে তাড়া করে উড়ে চলে গেল। ঠিক কানের পাশটিতে শব্দ অকন্মাৎ উচ্চ হয়ে উঠে—তাঁকে ঈষৎ চকিত করে তীরের মত সামনের দিকে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাসলেন। মাথার উপর বিরাট মৌমাছির ঝাঁক। এখানে অজ্ঞয়-তীরের মাটির রঙ গৈরিক, গৈরিক বনতলের উপর টপ-টপ করে মধু ঝরে পড়ছে; ঝরা পাতাগুলি আঠালো হরে উঠেছে, পায়ে আটকাচ্ছে। স্থানটায় অনেকগুলি বহড়ার গাছ। বহড়ার মঞ্জরী থেকে মধু ঝরছে। উগ্র মধুর গন্ধের মধ্যে মাদকতার আভাস। ঝরা পাতার উপর অসংখ্য হত পতক; করেকটা ভ্রমরও পড়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে গলগলে ফুলের পত্রহীন গাছ। ফুলে ভরে গিয়েছে; জবা ফুলের মত আকার, গাড় উজ্জ্বল হলুদ রঙ, বনের শ্রাম-অব্দে অর্ণভূষণের মত। ফুলগুলিকে ঘিরে এখানে মৌচুটকি পাখিরা নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় পত্রপল্পবের অস্তরালে কোকিল ডাকছে; মধ্যে মধ্যে কোথার কোন গুলোর অস্তরালে তিতির ভেকে উঠছে। ক্রমোচ্চ

খরগ্রামে একটানা ডেকে চলেছে—চোথ গেল, চোথ গেল, চোথ গেল।
এবার আসছে শালফুলের গন্ধ। শালবন শুরু হল। সরল দীর্ঘতম শিশু
বনস্পতির দল, তলায় অজল্ল অসংখ্য চারা, তারই মধ্য থেকে উঠেছে কত
লতা—গুঞ্জলতা, শতমূল, অনস্তমূল, গুলঞ্চ, আরও কত লতা। যে বনস্পতিকে
ধরেছে তাকে পাকে পাকে পিষে ধরেছে, কাণ্ডের গায়ে সর্পিল বেষ্টনের
চিহ্ন একৈ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—সহল্র বিস্তারের জাল রচনা করে তাকে
আছের করে তার আলোকপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। নারী। লতারাই
এখানে নারী।

সামনেই একটা পথ। বনটার ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে অজয়ের ঘাটে। লোক চলেছে। দল বেঁধে চলেছে। এক এক দলে পাঁচজন সাতজন। চলেছে ওপারে কেন্দুবিলে, অধিকাংশই তিলক-ফোঁটা-কাটা বৈষ্ণব, কিন্তু গুঁহত্ব এরা। মধ্যে মধ্যে ছজন, তিনজন বা চারজনের দলে বাউল বৈরাগী আর বৈষ্ণবী। মন বিমুখ হয়ে ওঠে মাধবানন্দের। অন্ধকুপের পঙ্কস্তরে পড়ে মাহুষ যথন নেশার ঘোরে বা মস্তিক্ষের বিকৃতিতে পূষ্পাশয্যার আনন্দ অম্বত্তব করে, এবং ওই গাঢ় অন্ধকারকে জ্যোতির ভাষরতার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হল মনে করে পুলকিত হর তথন চৈতক্রমর পুরুষেরও চেতনা বিলুপ্ত হর আৰু তামসী আদিম উল্লাসে অট্টহাস্থ করে। এদের কেন্দ্র করে সেই তামসী জাগছে। একটা গাছের ছারার বসে একটি এমনি দল গঞ্জিকা সেবনের স্পারোজন করছে। মাধবানন্দ দিকটা পাশে করে মোড় ঘুরলেন। তিমিরান্ধ অসহায় হতভাগোর দল। ক্রমিকীট পঙ্কপন্তবের মধ্যে ভেসে বেড়ার আর আকণ্ঠ পদ পান করে অমৃতাম্বাদনের তৃপ্তি অমূভব করে; এরা তাই। मर्सा मर्सा माध्यानत्मत्र मत्न कक्रना त्करण छेर्रा हो हो, कि कक्रना कद्राल পারেন না তিনি। করতে গেলেই তাঁর মায়ের কঠোর শীতলদৃষ্টি চোখ ত্ত্বি মনক্ষ্র সমুখে জেগে ওঠে। মনে হর পরপার থেকে মা তাঁর দিকে তাকিরে আছেন—এই ভদিতেই তিনি তাঁকে তাঁর অবাঞ্চিত কর্ম থেকে নিরম্ভ করতেন। না, করুণা করতে পারেন না তিনি। তবে, খ্বণা! না, খ্বণাও তিনি করেন না।

হঠাৎ এদে পড়লেন এক টুকরা খোলা জায়গায়। চারিপাশে ঘন বন-

বেইনীর মধ্যে ঘন সবৃষ্ণ ঘাস কোমল লাবণ্যে ঝলমল করছে। যেন একটি খেতচন্দনের তিলকবিন্দুর মত প্রসন্ধ। তারই পাশে পাশাপাশি কটি লাল কাঞ্চনের গাছ; অষ্টাবক্রের মত আঁকাবাঁকা-ভাল থর্বাক্কতি গাছগুলি একেবারে পত্ররিক্ত; শুধু একেবারে মাথায় ছটি ভালে রক্তাভ কাঞ্চনবর্ণ ছ-চারটি করে ফুল ফুটে আছে; যেন কোন শবরী ফুলের অর্ঘ্য মাথায় করে দাঁভিয়ে আছে।

কিছু ফুল পেড়ে নিলেন মাধবানন। মা ভামরূপাকে কয়েকটি, রাধা-বিনোদকে কয়েকটি ভেট দিয়ে আসবেন।

মন্দিরে আজ অনেক যাত্রীর সমাগম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং এক শ্রেণীর বিলাসী গৃহস্থ বৈষ্ণবের ভিড় বেশী। তাদের ভিড়ের আর অন্ত নাই। সঙ্গে আখিতা সেবাদাসী। কারও একটি, কারও হুটি, কারও করেকটি। এমন আথড়াধারী বৈষ্ণব মহাস্ত আছে যাদের করেক গণ্ডা। তাদের আথড়ার नीना हल। प्लानयां जाय प्लाननीना, यून्तन यूनननीना, तारम दामनीना, এমন কি বিশেষ গোপনভার মধ্যে বস্ত্রহরণলীলাও নাকি হয়ে থাকে। একটা কথা আছে, দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী-কথাটা অস্থীকারের উপায় নাই; কিন্তু ধন সম্পদ যেখানে, সেখানে বিক্লতি একবার শুক্ত হলে আর রক্ষা নাই। মাধবানন্দের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, দেখ বাবা, এই কুচো মাছ পচনে পলাণ্ডু রশুন লন্ধার বাঁটনা বেশী পরিমাণে দিলে খাওয়া যার; আমি অবশ্র মাছ খাই নে, তবে গন্ধে রদনা দরদ হয়ে ওঠে এ দত্য অমীকার করব না এবং পরিতোষ সহকারে অনেককেই থেতে দেখেছি। কিন্তু বাবা, বড় রোহিত মংস্থ যথন পচে তথন পৃথিবীর কোন উপাদান-সংযোগেই তাকে আর খাল্ডে পরিণত করতে পারা যায় না। তথন ওকে নেবুগাছের তলায় চাপা দিতে হয়। রস যে রস, তাও অমরুসেই ওর পরিণতি হয়। তবে হজমী যদি বল তো বলতে পার। সাধারণ দরিত্র ভিক্ক বৈষ্ণবদের বিক্বতি সমাজকে তত বিক্বত পদু করে নি, যত করেছে এই সম্পন্ন অবস্থার বৈঞ্ব গৃহত্তের।—বৈঞ্ব মহাস্তের।। দরিত্রদের তব্ একটা বিশ্বাস কোথাও-না-কোথাও আছে, সম্পন্নদের কোন বিশ্বাসই নেই। তারা শুধু বিলাসী, শুধু ব্যভিচারী। হার, বৈষ্ণব ধর্মের পরিণতি! মহাধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম! তার আদি কবি তুমি কবিরাজ গোস্বামী!

কবিরাজ গোস্বামী পদ্মাবতীরমণ জয়দেব সরস্বতী, তুমি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলে তোমার সথী-সচিব-পত্নী পদ্মাবতীর রূপসাগরে, যৌবন-জলধিতে; তোমার কবিচিত্ত বিলাস-কলাকুতৃহলে এমনি ময় হয়ে গেল য়ে, চৈতল্লময় প্রুম্বান্তমের আর কোন মহিমা দেখতে পেলে না। প্রভাসে সমুদ্রের কূলে নিমগাছের ছায়ার তলার ছাপরের জীবচিত্ত-তিমির-হরণ জ্যোতির্ময় পুরুষটি যাদবহীন নির্বংশ ছারকাপুরীর দিকে তাকিয়ে য়ে নিরাসক্ত প্রসন্ম মৃথে বসেছিলেন সে ম্থশ্রীর মহিমাও কি তোমাকে মৃয়্ম করে নাই ? হায় করি, হায় ! শুরু তুমিই বা কেন ? মহর্ষি রুষ্ণ হৈপায়নের পর তোমার কবিরা মেদিন থেকে তপোবনের তপশ্রাকে বছমহিষীপরিয়ত রাজাদের রাজসভাশ্রিত করিয়েছ সেদিন থেকেই তোমরা কবিচিত্তকে বিলাসকলাতরক্ষম্থর আদিরসের ঘাটে ডুব দিইয়ে গলিষে দিয়েছ। সমৃদ্রতটে ছাটে বসেই তরঙ্গ-স্থানের সঙ্গে বালি মেথে উল্লসিত হলে। জীবনে সমুদ্রের মহাগভীরে অনস্তের ধ্যান-মহিমার সন্ধান হারালে।

কেশুলীর মন্দিরে রাধাবিনোদজীকে দর্শন করে ফিরছিলেন মাধবানন। ওই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে ফিরছিল। গলায় রাধাবিনোদজীর প্রসাদী মালা, সাদা টগরফুলের মালাগাছির মধ্যে মধ্যে ওই কাঞ্চনফুলের পরন; মেন শিলাফলকে সাদা রঙে লেখা ললিত-কাব্যের একটি শ্লোকের এক-একটি চরণের শেষে আলতার লাল কালিতে টানা এক-একটি পদচিহ্ন। চমংকার নিপুণ হাতের রচনা মালাগাছি; একেবারে মধ্যস্থলে কয়েকটি কাঞ্চনের একটি স্তবক।

বাইরে একে দাঁড়িরে তিনি তাকিরে দেখলেন চারিদিক। কোথায় সেই ধ্বজা, যে ধ্বজা তিনি ওপার থেকে লক্ষ্য করেছেন? সামনে অজ্যের ঘাট পর্যন্ত এক পোয়া পরিমাণ প্রাশন্ত চরভূমি ও বালুচর। এ-পারের মন্দির থেকে ও-পারে ভামরূপার সামনের বাঁধ পর্যন্ত ভূমি প্রায় দেড় কোশব্যাপী। এই দেড় কোশ স্থানের মধ্যে হুদান্ত অজ্য পার্যপরিবর্তন করে। বেকালে ভামরূপার বাঁধ তৈরী হ্রেছিল সেকালে ওরই কোণ ঘেঁষে অজ্য

বোধ হর প্রবাহিত হত। প্রবাদে রয়েছে, কবিরাজ গোস্থামী তাঁর মহাসমস্থার পদ শার-গরলথগুনং মম শিরসি মগুনং অসমাপ্ত রেখে চিন্তিত মনে কদমথগুরি হাটে স্নানে বেরিয়ে পথ থেকে ফিরে গিয়ে দেখেছিলেন বিগ্রহের সেবা ভোগ হয়ে গেছে, তাঁর ছয়্মবেশধারী পরমপুরুষের আহার হয়ে গেছে, তিনি শুয়েছেন এবং পদ্মাবতী প্রসাদ ভক্ষণ করছেন। স্থতরাং এই সময়ে যে পথটা অভিক্রম করা যায় সেটা কম পথ নয়। এখন হয়তো ততটা নেই, অজয় সরে এসে থেয়ে নিয়েছে, কিন্তু যেটা আছে সেটাও কম নয়। ওদিকে শ্রশান ও বাউল-সমাবেশের বটতলা। এদিকের অংশটা শুরুই বাল্চর। এই চরেই বসেছে মেলা। পথে বসে গিয়েছে সারি দিয়ে ভিক্সকের দল।

ওই—ওই তো দেখা যাচ্ছে! একটা তরুণ অখখগাছের মাথায় ধ্বজাটা উড়ছে। ওই যে করেকটা হাতী চলেছে অজয়ের ধারার দিকে! পিছনে চলেছে ছেলের দল!

অগ্রসর হলেন তিনি। ছ দিকেই ভিক্ককের সারি।

ভিক্ষ্কের সারির মধ্যে বসে রয়েছে 'কয়ো'; ইলামবাজারের করো।
কয়োকে তিনি চেনেন। কয়ো নিজেই চিনিয়েছে। ভিক্কের সারির মধ্যে
বসে সামনে একখানি গামছা পেতে মৃড়ি চিবুছে এবং মৃড়ি মুখেই যাত্রীদের
উদ্দেশ করে তার নিজম্ব ভিক্ষার বুলিটি উচ্চারণ করে চলেছে—কয়ো, আমি
কয়ো বোরেগী মা সকল—বাবা সকল—গোবিন্দের এঁটোকাটা ছিটিয়ে দিয়ে
বাও। কয়ো এঁটোর ভিথেরী মা।

অর্থাৎ প্রসাদ। চালের মৃষ্টিভিক্ষা, তুটো চারটে কড়ি, কখনও বা একটা বাধটা কপদক আপনিই পড়ছে। কিন্তু তাতে করোর বিশেষ আনন্দ নাই। করেকখানা বাতাসা বা আধখানা মণ্ডা বা একটা কলা পড়লে মুখ তার খুশিতে তরে উঠছে। তেলেভাজা পড়লে আরও খুশী। মৃড়ি চিবুনো বন্ধ করে দাগে সেইগুলি মৃথে পুরে অভ্যাসমত চোখ বন্ধ করে উপভোগ করে র্বণ করে।

মাধবানন্দ হাসলেন কয়োকে দেখে। এর মধ্যে কয়েকদিনই সে তাঁর মাশ্রমে গিয়ে প্রসাদ পেরে আসছে। প্রথম দিনই যে কথাটি কয়ো বলেছিল, স ক্থাটি ভারি তাঁর ভাল লেগেছিল, কৌতুকরসের সঞ্চার করেছিল— তিনি হেনে ফেলেছিলেন। করো গিয়ে হেঁকে বলেছিল—জয় গৌর নিতাই হে! শোনলাম বনের মাঝে প্রভুর পেসাদের পাতা পড়ছে। আমি বাবা কয়ো, কয়ো বোরেগী। তু মুঠো এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে দিতে মন হোক গোঁসাইয়ের।

ওই 'মন হোক' কথাটা এবং 'করো' নাম তাঁকে আরুষ্ট করেছিল। তিনি তার সব্দে আলাপ করেছিলেন। লোকটি বিয়ে করে নি শুনে খুনী হয়েছিলেন। নিজে দাঁড়িরে ওকে খাইয়েছিলেন। কিন্তু কয়ো তাঁর ওখানকার প্রসাদে সন্তুষ্ট হয় নি। কারণ তাঁর ওখানকার আশ্রমের ভোগ-রাগে বিলাসিতা নেই। দিঃ চ্মান্ব মধ্যু করার পঞ্চামতের মধ্যেই দেব-ভোজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট। তারপর সকল ভোগই ব্রহ্মচারী তপস্থীর উপযোগী উপকরণ ও পদ্ধতিতে প্রস্তত। হবিল্যান্তের ব্যবস্থা। এ সবই মাধবানন্দের নিজের কয়না।

তিনি আশ্রম গড়ছেন, শুধু ধ্যানী তপস্বী দিয়ে নয়। কমেকজন জ্ঞানী পণ্ডিত আছেন, কিন্তু সংখ্যায় বেশী কর্মীর দল। তার মধ্যেও কয়েকটি ন্তর অবশ্রই আছে। কেউ কেউ করে আশ্রম পরিচালনা, কেউ দেখে আশ্রম গঠনের কাজ; কেউ করে আশপাশ গ্রামের লোকেদের সঙ্গে পরিচা আলাপ; তারা ধ্যানী তপস্বী বা জ্ঞানী বলতে যা বোঝায় তা না হলেও অশিক্ষিত নয়। বরং কর্মের সঙ্গে তাদের শিক্ষার কাজ আজও চলছে। একটা অধ্যয়নের সময় আছে, সে-সময় ওই জ্ঞানী-গুণীদের কাছে তারা পাঠ গ্রহণ করে। এ ছাড়া আরও কিছু সেবক আছে—তারা অক্ষরপরিচয়হীন, কিন্তু বিচিত্র মাহুষ। শিক্ষিত নয়, জ্ঞানী নয়, কিন্তু তারা শুদ্ধচিত্ত মাহুষ। তারা আসন করে যৌগিক নিয়মে ধ্যান করে না, কিছু চোথ বুজলেই ইট-মূর্তিকে দেখতে পার। তারা চিস্তা করে না, তথু আদেশ পালন করে যায়। ভারা কর্ম কখনও অসমাপ্ত রাখে না। কোন তত্ত্বকে ভারা ব্যাখ্যা করতে পারে না; কিন্তু অভুত জন্মগত প্রকৃতি বা শক্তি যে, তত্ত্ব শুনবামাত্র বিশাস করে ধারণ করতে পারে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু দমনের ^{জন্ত} এদের কৃচ্ছুসাধন করতে হয় না; সে শক্তি যেন চরিত্রগত; এরা বাঁচার ব্দুছা থার, খাওয়ার জন্ম বাঁচে না ; এরা রূপ চোখে পড়লে দেখে, কিছু রূপ দেখার ব্রম্ভ চোথ চেয়ে বসে থাকে না; রূপের পিছনে ছোটে না। এরা

স্ব মোটা কাজ করে। গোসেবার কাজ, ক্ষয়িক্ষেত্রের কাজ এরাই করে।
স্বচেরে বড় কাজ এদের সেবা। আশ্রমবাসীদের অস্থপের সমর সেই পরিচর
স্বচেরে বড় হরে ফুটে ওঠে। মাধবানন্দ নিজে মনে মনে প্রণাম করেন।
করোকে দেখে, তার বিচিত্র কথা শুনে তিনি ভেবেছিলেন তাকে তাঁর
আশ্রমে নিলে হয়। ধাতুটা মনে হয়েছিল থাঁটি। অনেক আবর্জনা মিশে
আছে, কিন্তু তপস্থার হোমবহির সংস্পর্শে এলেই আবর্জনা পুড়ে শেষ হয়ে
য়াবে। তাই তিনি বলেছিলেন—এই আশ্রমে তুমি থাক না। থাকবে ?

অভ্যাসমত কয়ো চোখ বন্ধ করেই খাচ্ছিল। মুখে তখন একমুখ ভাত আর কচুসিদ্ধ; সে নীরবে ঘাড় নেড়ে দিয়েছিল—না।

--কেন ?

এবার ঘাড় নাড়ার সঙ্গে জিভ নাড়তে হয় না, এমন একটি উত্তর দিয়েছিল—উছ। উছ

—কেন ?

কোঁত করে গ্রাসটার খানিকটা গিলে বলেছিল, রাম:! তোমাদের এখানে ঠাকুরের চরণ আছে, বদন নাই। এখানে কে থাকবে ?

—তার মানে ?

—মানে—এটা গরাক্ষেত্র, পিণ্ডির ব্যবস্থা। পিণ্ডি ঠাকুর পায়ে ছোঁয়, চটকায়, মূখে তোলে না, চটকানো পিণ্ডি প্রেতে খায়। এখানে কয়ো থাকতে গায়বে না। কয়ো কয়ো বটে কিছু দাঁডকয়ো নয়; অর্থাৎ দাঁডকাক।

করোর কথা শুনে তিনি রাগ করতে গিরেও রাগ করতে পারেন নি; তার কারণ তার এই বিচিত্র বাগ্ভিদি। তিনি হেসে ফেলেছিলেন। শুধু এইটুকুই নয়—থেরে-দেয়ে কয়ো তার গামছার খুঁট খুলে মটরদানার মত একটি পাথর তাঁর সামনে রেখে বলেছিল, দেখেন তো গোঁসাই, এটা কী প্র জন্মলের মধ্যে পেয়েছি।

— জঙ্গলের মধ্যে ? পাথরটি হাতে তুলে নিম্নে বিশ্বিত হয়ে গিয়েছিলেন মাধবানন্দ। এ তো নীলা! বেশ মূল্যবান নীলা! অভিজ্ঞাত বংশের সস্তান মাধবানন্দ অনেক জহরত দেখেছেন। আজও মায়ের ও বাপের দেওয়া কিছু: মূল্যবান জহরত তাঁর আছে। ক্ষো বলেছিল, হাা, জললের মধ্যে এই তোমার আথড়ার কাছেই। রোদের ছটার জন-জন করছিল। কুড়িরে নিলাম। তোমারই বটে কিনা ভাদেব।

- --না, আমার নর।
- —তা হলে ? তা হলে হয়তো সেই বিবির হবে।
- -বিবির ? বিবি কে ?
- —এই।—চোধ বৃদ্ধে ভেবে নিয়ে করো বলেছিল, চার-পাঁচ মাস ক্বে— এক শ্রাধ আর এক বিবি কোখা থেকে এসে এই তোমার দেউলের এইখানে এমেছিল। শ্রাথের বয়েস এই তোমার পারাই হবে আর বিবি মোহিনীর চেয়ে বেশী বড় নয়—তবে বড় বটে। আর মোহিনীর চেয়ে অ্যানেক কোন্দর। গোলাপফুলের মত রঙ।
 - মোহিনী? (क মোহিনী?
- —মোহিনী ? ইলেমবাজারের আমাদের মাজীর বিটী গো। ভারি ভাল মেয়ে। সেদিন ভোমাকে দেখেছিল লদীর ঘাটে। তুমি দেখ নাই ?
 - —না। কিন্তু এই বিবি স্বার শেখ যাদের কথা বলছ, তারা কোথায় গেল?
- —তার। ছাতমপুর গিয়েছে। ওই যে লগরের রাজা লতুন গড় করেছে।
 বুড়ো হাতেম খাঁ তার ফৌজদার; তার কাছে গিয়ে নকুরি করছে। সেই
 বিবির কানে নাকে এম্নি পাথর ছিল! তা তুমি পাথরটা রাখ। উ নিরে
 আমি কী করব? লোকে জানলে আমাকে মেরে কেড়ে লেবে। মাজী
 জানলে ভুলিরে লেবে। মহাস্ত জানলে ধরে নিয়ে যাবে। রাধাবিনোদকে
 দিলে বাম্নরা বেচে খেয়ে দেবে। আর মরলে হুপুরের গোঁসাইরা লেবে।
 তার চেরে তুমি রাখ। তুমি লোক ভাল গোঁসাই। তুমি অনেক লোককে
 আর দাও।

মাধবানন্দ বলেছিলেন, তা তুমি একদিন হাতেমপুর গিয়ে শেখের সংগ দেখা করে জিজ্ঞেস করে এস না—এটা তাদের কি না ?

—বাবা রে, ছ-সাত কোশ পথ। যেতে আসতে বার-চোক কোশ। করোর পায়ে তা কিছুই লয়, কিন্ত হাতমপুরে একঘরও হিন্দু নাই। "হেতমপুর হিঁতু নান্তি মূলুকে অভিরামপুর"—সব মোগল, সব মোগল। জল ধাব কোথায় ? তা ছাড়া হাতমপুর আমি যাব না। যে প্টাজ গোল্ডের খনর্

ছুটিয়ে পাকার ওরা, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমি খাই
চাই না-খাই গেলে জাত-জ্ঞাতে আমাকে পতিত করবে।

—কিন্তু এ পাথর আমি নেব কেন? তুমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে ঘর-সংসার কর। পাথরটি তিনি নামিরে দিরেছিলেন।

— উত্ত। ঘর সংসার আমার হবে না গোঁসাই। আমি একেবারে আনাড়ী। তা—। তা তুমি যদি না লাও তবে ষেখানে পেয়েছিলাম সেইখানে ফেলে দেব। সেই ভাল।

মাধবানন্দ বলেছিলেন, আচ্ছা রাথ, আমি একবার থোঁজ করব হেতমপুরে। নতুন বিদেশী শেখ চাকরি করছে। নাম জান ?

—হাফেজ মিয়া গো। ওই যে হাতেম থারের খুব পেয়ারের লোক হয়েছে, সেই গো।

লোকটিকে এই একটি ঘটনা থেকেই তিনি শ্বেহ করেছেন অস্করে অস্করে। তাই কয়োকে দেখে সম্বেহ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আজও একটি কপর্দক তার গামছার ফেলে দিরে তিনি এগিয়ে গেলেন ওই সয়াসীদের আডার দিকে।

পতাকায় প্রতীক-চিছ্ন লৈব সন্নাসী-সম্প্রদারের। কিন্তু শহর মঠের নয়।
অখথগাছটির তলায় সন্নাসীরা ত্রিশূল গেড়ে আসন পেতেছেন। গাছটির
গোড়াতে হাতীর পিঠের হাওদায় গদি পেতে তার উপর মুগচর্ম বিছিয়ে
বিশে আছেন সম্প্রদায়ের প্রধান। পরনে মাত্র বহিবাস, উর্ধান্ধ নয়—মুথে
দাড়ি গোঁফ, মাথায় বড় বড় চুলগুলি সভ-স্নানের পর খোলা রয়েছে। সর্বাক্ধে
ভশ্মমাথা শেষ করে সন্নাসী ত্রিপুগুক তিলক রচনা করছেন। গলায় ছোটবড় ফলাক্ষের কয়েকগাছা মালা; ফলাক্ষের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ফটিকগুলি ঝিকমিক করছে। বাছতে ফলাক্ষের তাগা। শরীরখানি সিংহের
মত। প্রশান্ত পেশী, সবল বক্ষস্থল, ক্ষীণ কটি, আশ্রুর্য সবল ছটি বাছ। ডান
দিকের বুকের পাশে দীর্ঘ একটি ক্ষতিচ্ছ; ভশ্মাচ্ছাদনেও তা ঢাকা পড়ে
নি। তীক্ষদৃষ্টে দেখছিলেন মাধ্যানন্দ। যেন সন্ধান করছিলেন কিছুর।

হঠাৎ সন্ন্যাসী মৃথ তুললেন, চোখাচোখি হুতেই মাধবানন্দ হাত তুলে অভি-বাদন জানালেন, নমো নাবারণায়!

সন্ন্যাসী হাত তুললেন না, শুধু মুখে বললেন, নমো নারায়ণায়! তারপর আবার ত্রিপুঞ্ক রচনায় মন দিলেন।

মাধবানন্দ বললেন, অমুমতি হলে বসব মহারাজ।

— বর্ষটিরে মহরাজ। সব ভূমি হার ভগবানকে। বয়টিরে।—বলেই ভেকে উঠলেন, শিব শভো!

মাধবানন্দ বললেন, মহারাজ আসছেন শ্রীক্ষেত্র থেকে? এ পথে? তাই প্রশ্ন করছি। পঞ্চলেটের পথ ছেড়ে এ দিকে? কোন্ ক্ষেত্রমূখে চলেছেন?

সন্ধাসী বাবেকের জন্ম মৃথ তুলে আবার মৃথ নামিয়ে বললেন, বন্ধদেশে নাকি অনেক শক্তিপীঠ আছে শুনেছি। মহাপীঠই পাঁচ-সাতটি। আমি স্থাদিষ্ট হয়েছি এই পীঠগুলি পরিভ্রমণ করবার জন্ম। এখানে শুনেছি শ্রামর্কাণা দেবীর পীঠ ছিল একদা, এদিকে জন্মদেব গোস্বামীর সাধনপীঠ, তাই এখানে—ছদিন থাকবার বাসনা।

মাধবানন্দ বললেন, বন্ধদেশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি হলেন কালিকা। 'কালিকা বন্ধদেশে।' কিন্তু শক্তি এখানে এখন নিজেই নিজামগ্ন। এখানকার লোকে বলে—শ্রামা এখন শ্রাম হয়ে অসি ফেলে বাঁশী ধরেছেন। এতটা ঘুরলেন, শক্তির সাক্ষাৎ পেলেন কোথাও?

বলতে বলতেই তিনি চকিত হয়ে উঠলেন—সন্ন্যাসীর কয়েকজন অন্নচর এনে দাঁড়াল। চমকে উঠলেন তাদের অভিবাদনের ভঙ্গি দেখে। ঠিক গুরু-শিষ্মের অভিবাদন নয়। এ যেন সৈক্যাধ্যক্ষের প্রতি সৈনিকের অভিবাদন।

সন্ধ্যাসী বললেন, তামাম হিন্দোন্তানেরই এই হাল। বন্ধদেশের লোকেরা তার উপর ভীরু শান্তিবিলাসী। কিছু মনে করো না—এই জাতিটাই চরিত্র-ল্রষ্ট জাতি। এরা নাচতে জানে গাইতে জানে, তাও ধ্রুপদ ধামার নয়— থেমটা। হাসলেন সন্ধ্যাসী।

মাধবানন্দ বললেন, বাঙালীর চরিত্রে অনেক ক্রটি আছে। তার ধর্মে পর্যস্ত ব্যক্তিচার চুকেছে। কিন্তু এক এক সময় ভাবি, প্রকৃতির এ তুর্বলতা কোথায় নেই ? এত বড় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, ভবানীর বরপুত্র, এমন সাধনা এমন চরিত্র—তাঁর জীবনে জীবনেই শেষ ? তাঁর জীবদশাতেই তাঁর পুত্র যুবরাজ শন্তাজী—

—শিব শব্দো শিব শব্দো! বলে সন্ন্যাসী ইষ্টদেবতাকে শ্বরণ করে উঠলেন অকশ্বাৎ।

মাধবানন্দ বললেন, সাক্ষাৎ শিবতুল্য রামদাস স্বামীর দেওরা ভগোরা জেন্দা নিশান; সেই নিশান আজ—

- —রহে দেও মহারাজ। উ সব বাত থাক্। পরের চিস্তা ছেড়ে নিজের চিস্তা কর। তার পর হেসে বললেন, মহারাজের দেখি ধর্মচর্চা থেকে রাজনীতির চর্চাতেই আসক্তি বেশী।
- —না না। হেসে মাধবানন্দ বললেন, আমি ভেবেছিলাম মহারাজের এ চর্চা ভাল লাগবে। আছো মহারাজ, আমি উঠলাম। যদি ওপারে ত্থামরূপার পীঠ দর্শনে যান তবে অবশ্রুই আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে। ওপারে ওইখানেই আমার আশ্রম। নমো নারারণার!

—নমো নারায়ণায়!

এরা সাধুর ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র সৈনিক। গুপ্তচর। মাধবানন্দের মনে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 'ওদিকে দিল্লীতে মুঘলশক্তি পতনোমুখ। সিংহাসন অধিকারের কলহে সব হারিরে বসে আছে। স্থবায় স্থবায় স্থবায় স্থবায় বাদারেরা, নবাব রাজারা প্রত্যেকেই স্থাধীন হরে উঠতে চেটা করছে। ভারতবর্ষের সন্মাসীরা এক বিরাট শক্তি। তারা অবশ্য সে শক্তি দিরে কোনদিন দেশ অধিকার করতে চেটা করে নি; রক্ষা করতেও অগ্রসর হয় নি। তারা ধর্ম এবং দেবস্থান এবং মহাভারতের অস্তররাজ্য নিরেই বসে আছে। এবার তারাও চঞ্চল হয়েছে। গোকুলে মাধবানন্দ তার কিছু আভাস পেরেছেন। সেই প্রত্যাশাতেই তিনি শৈব সাধুর ঝাণ্ডা দেখে এসেছিলেন, যদি তেমন কোন দ্রদ্ধিসম্পন্ন সাধুর সাক্ষাৎ পান! কিছু সে দূরে থাক্, তিনি শক্ষিত হয়ে উঠেছেন। এরা সন্মাসীই নর। সন্মাসীর ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র গুপ্তচর। তিনি মহারাষ্ট্র ভ্রমণ করে এসেছেন। এরা বড় নিষ্ঠ্র। ছত্রপতি শিবাজীর আদর্শ ভূলে গিরে লুগ্ঠনের নেশার এরা উন্মন্ত হয়ে উঠেছে।

শঠে শাঠাং সমাচরেং—কৌটলাের নীতিকে অবদয়ন করবার সময়, শঠকে শাঠাের বারা পরাভূত করবার কথাটাই মনে হয়েছিল, নিজেদের শঠে পরিণত হওয়ার আশকা তাদের ঘৃণাক্ষরেও মনে জাগে নি। আশ্চর্য! সর্বত্রই সেই এক সত্য। জীবন—সেই অদৃশ্য অব্যক্ত প্রাণস্রোতে নিজেকে ব্যক্ত করে মানবজন্মে এসে নিজেকে প্রকাশ করছে, অহং বলে; প্রকৃতিধর্ম থেকে সে উপনীত হয়েছে চরিত্রধর্মে। ধর্মে কর্মে বাক্যে মর্মে সে ওই চরিত্রকেই প্রকাশ করে। অন্ধ প্রকৃতির যত আক্রোশ ওই চরিত্রের উপর। চরিত্রভ্রত্ত করে অন্ধ প্রকৃতি প্রবৃত্তি-পল্পলে টেনে ক্ষেলে তার এক নিষ্ঠ্র আনন্দ। মহাপ্রভূর প্রেমধর্মের মধ্যে সে তামসী অন্ধ্রপ্রবেশ করেছে; রামদাস স্বামীর শিশ্র ভবানীর বরপুত্র ছত্রপতির শাক্তধর্মের মধ্যেও তার অন্ধ্রপ্রবেশ।

জীবনের সকল ঘারকে রুদ্ধ কর। অকস্মাৎ তাঁর চিস্তার স্ত্র ছিঁড়ে গেল অদ্ববর্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। একজন ঘোড়সওয়ার মহোল্লাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে নিজেই চিৎকার করে সমবেত যাজীদের ভীত এবং সম্রস্ত করে চলে আসছে।—হো—হট যাও। হট যাও! হা-রা-রা-রা!—তার সজে মধ্যে মধ্যে অট্টহাসি হেসে উঠছে—হা-হা-হা! হাসির কারণ, কোন ভয়ার্ত গ্রামবাসী সরে যেতে গিয়ে পড়ে গেছে। জ্ববা মেয়েদের দল উর্ধ্বাসে ছুটে পালাছে। লোকটা হাতের চাব্ক নিয়ে দৃশ্য মার্গে ঘোরাছে।

লোকটার অভ্ত বর্বর চেহারা! বয়স অল্প, যৌবনমদমন্ত, বেশেবাসে উচ্ছ, খল ধনীপুত্র বলেই মনে হন। ওঃ! রক্তান্ত গোল চোথ, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, কালো রঙ, লোকটা যেন বর্বরতার প্রতিমূর্তি। পান চিবচ্ছে। লোকটা ব্রতও করে নি, দেবদর্শন করতেও আসে নি; এসেছে মেলা দেখতে, নারী-সন্ধানে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একজন সন্ন্যাসী পড়ল সামনে। ওই আগস্তক সম্প্রদায়ের একজন। বর্বর লোকটা চিৎকার করে উঠল। সন্ন্যাসীটি ধেন ইচ্ছে করেই সামনে থেকে সরে গেল না। আর ঘোড়াটাকে সামলাবার সাধ্য নেই। চাপা পড়ে মরবে। সেই কারণেই বর্বর সওরারটা এমন চিৎকার করে উঠেছে। মুখে মেরে ফেলবার ভয় দেখায় সংসারে নিরানব্ব ই জন, কিন্তু সত্যই মেরে ফেলা বা হত্যা করা এত সহজ নর—দে হয়তো একজন পারে; সে একজন অন্তত এ লোকটা নর। কিন্তু সন্মাসীটি হয়তো সেই একজন। এ জনেরা শুধু মারতেই পারে না, মরতেও পারে। আশ্চর্য শক্তি এবং কৌশলের সঙ্গে ঘোড়াটার লাগাম ধরে ই্যাচকা টান দিরে ঘোড়াটাকে এমন ভাবে ঘ্রিয়েছে যে নিজের গতিবেগের সঙ্গে এই বিপরীত-মুখী প্রচণ্ড টানের সামঞ্জন্ম রাখতে না পেরে পিছনের পা হড়কে ঘোড়াটা গেল পড়ে এবং বর্বর আখারোহীটাও সশব্দে তার সঙ্গে পড়ে গেল—ঘোড়ার তলায় একটা পা পড়ল চাপা।

প্রথমে উঠল একটা হাসি—হো-হো-হো! দৃষ্টটা সত্যই উপভোগ্য বকমের হাস্তকর। তারপরই কোলাহল উঠল চারিদিকে। চারিদিকে ভিড় জমে গেল। রব উঠল—ছোট সরকার! ছোট সরকার! ইলেমবাজারের ছোট সরকার!

পর-মূহুর্তেই ভিড়টা ফাঁক হয়ে গেল। আরোহীবিহীন ঘোড়াটা ছুটে বেরিরে গেল।

মাধবানন্দ সেই পথে ভিতরে চুকে গেলেন। লোকটা পড়ে চিৎকার করছে। যে সন্ন্যাসী তার এ ছর্দশা করেছে সে কিন্তু চলে গেছে। কাতর চিৎকার, না ক্রুদ্ধ চিৎকার ঠিক বোঝা যায় না—হয়তো ছুইই। মাধবানন্দ গিয়ে তার হাত ধরে বললেন, আগে ওঠ, আগে ওঠ। পরে গালাগাল করবে। ক্রোথায় লেগেছে দেখি।

কুৎসিত গালিগালাজ দিয়ে উঠল লোকটা। পর-মুহুর্তেই থু-থু করে থুতু ছিটতে আরম্ভ করল। মাধবানন্দের মাথার মধ্যে যেন আগুন জলে গেল। ইচ্ছা হল—। কিন্তু সে ইচ্ছাকে দমন করে তিনি বাইরে এলেন। মনে পড়ে গেল মহাভারতে বর্ণিত মহারাজ নলের কথা। বনবাসী মহারাজ নল একদিন দেখলেন, চারিদিকে বনের আগুনের মধ্যে এক নাগ মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে। নাগের দৃষ্টি দেখে মনে হল, সে তাঁর কাছে যেন করণা ভিজ্ঞা করছে। নল করণাপরবশ হয়েই একটা বৃক্ষশাধার সাহায়ে তাকে তুলে

আভানের গণ্ডীর বাইরে নিরাপদ স্থানে রেখে দিয়ে বললেন, যা, চলে যা। নাগ চলে গেল না। সে মৃহুর্তে মহারাজ নলকেই আক্রমণ করলে। যার যা সভাব! এরাই সমাজের বিকৃতির কুংসিততম প্রকাশ; কটুতম বিষফল। সমাজের পচ-ধরা জীবনের কুমিকীট।

ক্রোধ দমন করেই ঘাটে এসে তিনি নৌকায় চড়লেন। মাঝি লখাই ডোম লগি ঠেলে নৌকাটা স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বললে, ছোট সরকার ঘোড়াচাপা পড়ে মরেছে গোঁসাইবাবা ?

- —না, মরে নি। কিন্তু ছোট সরকার লোকটা কে?
- —বাপ রে, অক্র দাস-সরকার। ইলেমবান্ধারের বড় গদির মালিকের বেটা।

-- 0

—একটা গোটা পাঁঠা সরকারের নক্সি। তিন-চার বোতল মদ থেয়ে একটুকুন টলে না। ভারি ঘোঁড়স'র (ঘোড়সওয়ার)। গায়ে ক্ষ্যামতাও খুব। এখানকার যত লেঠেল দাঙ্গাবাজ—সব বড় সরকারের তনথা খায়। কতক ছোট সরকারের সঙ্গে খুব ভাব। নাগা সন্মাসীটা ভাল কাজ করে নাই গোঁসাইবাবা। অক্রুর সরকার সহজে ছাড়বে না। হাঙ্গামাএ কটা লাগাবেই। ওই—ওই বুঝি লাগল—

কয়েকজন শক্ত সমর্থ জোয়ানও এসে জমেছে তার পাশে। অন্ত দিকে সমবেত জনতার মধ্যে রোল উঠেছে, পালা—পালা—পালা!

नथारे उन्ता, रन। नागा मद्यामीताद रन।

नथारे छरे मन्नामीत्मय नामा मन्नामी वर्ण यत्न करत्रह ।

লখাই তথনও বলছিল, সরকারের ভয়-ভর নাই। আজলগরের (রাজ-নগরের) ফৌজদার সাহেব হাতেম খাঁয়ের সঙ্গেও খুব দহরম-মহরম। আঘব-পুরের (রাঘবপুরের) আঘব-ঠাকুরের সাঁতে হালামার সময় আগনেক সাহায্য করেছিল দাস-সরকারেরা। একটা ফ্টো ক্যানে সাতখুন মাপ ওদের। সন্মাসীদের আজ হল।

মাধবানন্দের কপালে সারি সারি চিস্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। হালামা বাধলে—! লখাই জানে না, ওই ছোট সরকারও জানে না, ওই সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকে নিপুণ যোদ্ধা। শুধু তাই নয়, মহারাষ্ট্র ভ্রমণের সময় আরও অনেক জায়গা তিনি ঘূরেছেন; গোয়াতে গিয়েছিলেন বর্গীদের লুঠন-অভিন্যানের কিছুদিন পরেই। সেখানে যা শুনে এসেছেন—। শুনে নয়, দেখেও এসেছেন। এক হতভাগিনীকে দেখে এসেছিলেন। তার বুকের স্ক্ষাভাগু ছির চিহ্নমাত্র নাই; সে নয় বক্ষেই পথের ধারে বসে ভিন্না করছিল। শুনেছিলেন বর্গীরা তাকে শাস্তি দিয়ে গেছে, শুন ছুটি কেটে দিয়েছে! ওরা যদি—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, চল, তুমি তাড়াতাড়ি চল।

বেলা বেড়েছে। স্র্রের আলোতে উদ্ভাপ অমুভূত হচ্ছে। শ্রোত পার হরে অজ্যের বালি অতিক্রম করে বনভূমে এসে ঢুকলেন। মঞ্জরী-জাতীয় ফুলে মধু বেশী এবং গুণে ও গদ্ধে অপেক্ষাকৃত উগ্র। রৌশ্রোপ্তাপে এরই মধ্যে মাধ্বীগদ্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভ্রমরগুলি মাতাল হয়েছে; পরস্পরকে তাড়া দিয়ে তাদের ছুটাছুটির আর অস্ত নাই। বনতল আলোছায়ার টুকরো টুকরো ছাপে ছাপে বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। গাছে চড়ে সাঁওতাল-ছেলেমেরেরা মছয়া সংগ্রহ করছে। কেউ কেউ কাঠ ভাঙছে। ছোট করেকটা ছেলে তিতির-থরগোশের সন্ধানে তীরধম্বক হাতে পা টিপে টিপে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বনে কোথায় কে গাছ কাটছে! কুড়ুলের শব্দ বিচিত্র গতিতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছুটে গিয়ে দিকে দিকে পর পর প্রতিধনি তুলে চলেছে। আরও একটু অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অদুরেই তাঁর আশ্রম। অতি মধুর নারীক্ঠের গান শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

প্রতিক্মলাকুচমগুল, ধৃতকুগুল, কলিত ললিত বনমাল। জয় জয় দেব হরে।

বারেকের জন্ত থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপরই গতি ক্রততর করলেন। ক্রতপদে আশ্রমে এসে তাঁর আর বিশ্বরের অবধি রইল না। একটি যুবতী, একটি কিশোরী দেবতার গৃহের সামনে বসে গান গাইছে। দেখে বুঝতে

তাঁর ৰাকি রইল না ষে এরা সেই স্থাড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবী; বেশছ্বা দেখে আরও একটু সন্দেহ হয়। সাদা থান কাপড়ের মধ্যে থাকে যে
পরিচ্ছন্ন বৈরাগ্য, পবিধান-পাবিপাট্যে তা বিলাস মনে হচ্ছে। মেয়ে ছটি স্নান
করেই এসেছে, চুলে কোন বিস্থাস নেই—এলানো চুল পিঠের উপর পড়ে
আছে, কিন্তু অবিক্রন্ত চুলের মধ্যেও অভ্যন্ত বিস্থাসের শাসন ফুটে রয়েছে
বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। মুখে শুধু যৌবন ও স্বাস্থ্যের সহজ রূপের সৌন্দর্বই
নেই—প্রসাধন-মার্জনার ছটাও রয়েছে সেথানে। যুবতীটির চোথের কোণে
ছটি কালো দাগের আভাস আরও কিছুকে যেন ব্যক্ত করছে।

আশ্রমের সকলে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন পাঠে রত।
তাদের সামনে পুঁথি শুধু খোলাই আছে। তাদের চোথ ছটি বন্ধ হয়ে
গেছে। দেবতার ঘরে দেবতার সম্মুখে আসনে বসে কেশবানন্দ ধ্যানে ময়
হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার করগণনায় আঙুল আর চলছে না। বাহ্নদেবানন্দ
সন্ত ফিরে এসেছে, সে হাত পা ধুছে এবং গুনগুন করে ওই স্থরের সঙ্গে
ম্ব মেলাতে চেষ্টা করছে। শুধু গোপালানন্দ হাইপুই শ্রামাঙ্গী গাভী শ্রামনীর
পিঠে হাতখানি রেখে চোথ বুজে বিভোর হয়ে গান শুনছে। কারণ গানের
ভালে তালে তার সর্বাকে দোলা লাগছে।

ঠাকুরঘরের সামনে একখানি শালপাতার উপর একটি ছোট ভালার মনোরম করে সাজানো ভেট নামানো রয়েছে। তার মধ্যে লাল কাঞ্চন-ফুলগুলি ঝলমল করছে। এরাই নামিরে দিয়েছে তা বুঝতে বাকি থাকে না।

মাধবানন্দ নীরবে দেবগৃহের দাওয়ায় উঠে গেলেন। কোন দিকে ফিরেও তাকালেন না।

গান গাইছিল ক্ষণাসী এবং মোহিনী। গাইছিল ক্ষণাসী, মোহিনীর তরুণ স্বরথানি সরলগতি বাতাসের সঙ্গে বনের কচি শালের পল্পবান্দোলনের বেগের মত মিলে মিশে ঘাচ্ছিল। মাধবানদকে দেখে ত্জনেরই মুথ উজ্জল হলে উঠল। মা-মেয়ে পরম্পরের মুথের দিকে বারেকের জন্ম তাকিয়ে আবার তাকালে নবীন গোস্বামীর দিকে। অপরূপ নবীন গোস্বামী। শুধু রূপই নয়, স্বারও যেন কী আছে! হাপরের মধ্যে গলা সোনার দীপ্তি আর হাপরের

কুঁরে গনগনে হয়ে জ্বলে ওঠা করলার ছটার মধ্যে তফাত আছে। এ রূপে ওই গলানো সোনার মত একটি মহিমা আছে। ওঁকে দর্শন করতেই তারা এসেছে এখানে।

কৃষ্ণদাসী আর মোহিনী কেন্দুলী থেকে নবীন সন্ধ্যাসীর মঠ দেথতেই এসেছে। তাঁকে দেথতেই এসেছে। কল্পো বোরেগী মেলায় এই কথাটাই মাধবানন্দকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘোড়সওয়ার আসায় বলা হয় নি।

আজকের স্থান-পার্বণে রাধাবিনােদজীকে দর্শন করতে তারা প্রতি বৎসরই আসে। অন্থবারের আসার সঙ্গে কিন্তু এবারের আসার একটা পার্থক্য আছে। এবার সকালে সকালে এসেছে। অন্থবার আসে পায়ে হেঁটে দলের সঙ্গে। এবার এসেছে দল বাদ দিয়ে নােকায়, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওই কয়ােকে। মেলা পর্যন্ত এসে কয়াে আর আসতে রাজী হয় নি। বলেছে, মা-জাঁ, কয়াে নেহাতই কয়াে—বাঘও নয়, হাতীও নয়, ভালকুভাও নয়। বিপদ হলে কয়াে কয়াের মতই উড়ে পালাবে। আর পথ চেনাতেও তােমাকে হবে না। তুমি এদেশ তাে এদেশ—পুরী বিন্দাবন ঘেঁটে এসেছ। আর তােমার আছে মস্তর-তন্তর। তােমার ভয় কী ? চলে যাও, দেখে এস গা সয়ােসীকে, তার আশ্রমকে। তবে বড় কড়া লােক। একটুকুন সাবধান। বুয়েচ ? মানে—বেশী হাসি—কী চােখটোক—

বাধা দিয়ে কৃষ্ণদাসী বলেছিল, বুঝেছি রে মড়া মুখপোড়া, তোকে আর মানে বুঝাতে হবে না। বেশী হাসি—! হাসি কাঁদি যা করি, তু করে। তার মর্ম কী বুঝবি ? বেশী হাসি! আমি যেন হাসতেই যাচছি!

মেরেকে নিয়ে চলে এসেছে রুঞ্চদাসী।

নারীচরিত্র বিচিত্র। তারও মধ্যে বিচিত্র কৃষ্ণদাসীদের মত মেয়েদের চরিত্র।

এই নবীন অপরপ সম্নাসীটিকে দেখা অবধি রুঞ্চাসীর অস্তর আশ্চর্যভাবে উতলা হয়ে উঠেছে। সে উতলা ভাবটি অনেকটা অস্তরের আগুনের অকস্মাৎ জলে ওঠার মত। কিন্তু রুঞ্চাসী জানে, তার জীবনের আগুনে আর সে. দীপ্তি সে উত্তাপ নেই যাতে সম্নাসীর মত সোনা গলে। তবু তাকে গলাতে

ভার বড় বাসনা, বড় কামনা। কত কর্মনাই সে এ ক্য়দিন করেছে! অজরের কোন দহে, কোন বিশেষ লগ্নে আন করে উঠে বাড়ি এসে বার বার আয়না নিয়ে নিজেকে দেখেছে। কিছু যা চেয়েছে তা পায় নি। নিজের জানা ময়তয় জড়িব্টি অতি সংগোপনে ব্যবহার করেও দেখেছে। কিছু ফল হয় নি। অবশেষে সে নিজের সেই হারানো দীপ্তি ও উত্তাপ খুঁজে পেয়েছে মোহিনীর মধ্যে। এই তো—এই তো। মেয়ের মধ্যে দিয়ে কামনার ধনকে পাওয়ার বাসনা জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে। বার বার দিনের মধ্যে শতবার মেয়ের কাছে গল্প করেছে ওই সয়াসীর।

মাস্থাটি যেন তেন্তোমর মণি। মাটির বুকের মণিতে ছটা আছে, দীপ্তির আছে, এ মণিতে তার সঙ্গে তেজ আছে। মণির সঙ্গে তেজ; সে যে দিনমণির ভগ্নাংশ! ওই মণির তেজে আরুষ্ট হরে তার কাছে উড়ে যাবার ব্যগ্র কামনার তার মনোপতঙ্গের যেন পক্ষোপাম হয়েছে। মনে মনে মনের সঙ্গে অনেক কথা বলে ক্লান্ত হয়েছে, মনের কথা বলবার মাস্থ্য না-পেয়ে অবশেষে মেয়েকেই বলেছে। নিজের মনের বিশ্ময় মেয়ের মনে সঞ্চারিত করেছে। একদিনে বলে নি, দিনে দিনে থানিকটা থানিকটা করে বলেছে। তাই আরও গাঢ়তর করে মেয়ের মনে ছবি এঁকে দিয়েছে। দাস-সরকার বলেছিল একগুন, সে তাকে দশগুণ করে তুলেছে। রমণ সরকার ওদের বাড়ি ঘর-দোরের কথা বলে নি; দাসী মেয়েকে সাতমহলা বাড়ির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে; হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিংথাবে-মোড়া ষোল বেহারার পালকি, হাঙরমুথো নৌকা, পাইক-বরকন্দাজের হিসেবনিকেশ দিতেও বাকি রাথে নি। সবশেষে উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বলেছে, সেই স—ব ছেড়ে চলে এসেছে নবীন গোঁসাই।

মোহিনী শুনে অবাক হরেছে। দাসী নিব্দে বলতে বলতে বিশ্বরে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বসে নতুন করে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। হাতী ঘোড়া থাকার বিশ্বর তোঁ সংসারে কম নয়, অনেক। রাজার ছেলে রথে যায়—পথে ভিড় জমে, কিন্তু এসব ছেড়ে আসার বিশ্বর যে তার চেয়ে অনেক বেশী। এর সীমা আছে, তার সীমা নেই। দাসী বলতে বলতে এবং মোহিনী শুনতে ন্তনতে একসঙ্গে কেঁদে ফেলেছিল। আপনা-আপনি বেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

কাল সন্ধার অকস্মাৎ দাসীর মনের বাসনা আগুন হয়ে জলেছে। মধুক্ষারয়েদনীর পুণ্যস্নানে কেন্দুলী তারা প্রতিবৎসরই যায়। তারই আয়াজন
করতে করতে হঠাৎ মনে হয়েছে, কেন্দুলীর ওপারেই তো শ্রামর্রপার গড়—
ইছাই ঘোষের দেউল; ওথানে গেলেই তো দর্শন মেলে নবীন সন্ন্যাসীর। নৃতন
আশ্রম গড়ছে; কয়ো তার বিবরণ বলেছে; সে সব তো চোখে দেখা হয়।
করেক মৃহুর্তের জন্ম মনের মধ্যে হাঁ-না করে দ্বন্দ চলেছিল, মাত্র কয়েকটা মুহুর্ত,
তার পরই 'না' শন্দটা মনের দিয়্বলয়ে কোথায় কোন্ অক্লে নৈঃশন্সের মধ্যে
হারিয়ে গিয়েছিল। 'হা' ধ্বনিতে বাদ্ময় হয়ে উঠেছিল অস্তরলোক। সঙ্কেন্দ্রই ডেকেছিল, মোহিনী।

মোহিনী আকাশে তারা দেখছিল গুনছিল—এক তারা নাড়াখাড়া, তুই তারা কাপাদের খাড়া, তিন তারা চাষীভূষী, চার তারা পাটে বিসি, পাঁচ তারা ঘোরমোর—

মারের ডাক শুনে তারা গনায় ক্ষান্ত দিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাকে ডাকছ ?

—শোন্। শিগ্রি! পিগ্রি! একেবারে স্থীর কৌতৃহল তার কঠে। মোহিনীও আহলাদী মেরে, সেও ছুটে গিরে বলেছিল, কী মা?

মেরের চোখে চোখ রেখে অকারণে চুপি চুপি দাসী বলেছিল, মোহিনী, কাল কেনুলীতে চান করে প্রভুকে দর্শন করে অজ্ঞয় পেরিয়ে ত্যামরূপা যাবি ? দেই নবীন গোঁসাইকে দেখে আসব, নতুন মঠ গড়ছে দেখে আসব। যাবি ? যেন মেরের সম্বতির উপরেই যাওরাটা নির্ভর করছে।

আর বলে দিতে হয় নি। মোহিনীর মনে দাসীর মনের কথা প্রতিধ্বনি তুলিছিল সঙ্গে সঙ্গে।—নবীন গোঁসাইয়ের মঠে ? সত্যি, মা, যাবি ?

---रै।।

তারপরই খুব চুপি চুপি বলেছিল, কিন্তু খবরদার, কাউকে বলিস না। ব্র্থলি ? আমরা দলের সঙ্গে যাব না। তৃত্তনাতে যাব শুধু! কয়োকে নিয়ে ভোর ভোর নৌকো করে চলে যাব; কেউ জানতে পারবে না। চানটি করে

রাধাবিনোদজীকে পুজো ভেট দিয়ে আড়ে আড়ে চলে যাব। দলবল নিয়ে গেলে হৈ-চৈ হবে। ভাল কয়ে দর্শন হবে না। তুটো কথা নিবেদন করতে পাব না। ভাল করে চরণ ছুঁয়ে পেনাম করতেই দেবে না স্বাই।

আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না মোহিনীর। রাত্রিতে তার ভাল ঘুম হয় নি। বুকের ভিতরটা একটা আশ্চর্য উদ্বেগে অস্থির হয়েছে, কেঁপেছে। চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করবে, গোঁসাই মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন— তথন কেমন হবে তার ?

কৃষ্ণদাসীর মনে শেষের দিকে একটা শহা হয়েছিল। অজয় পার হয়ে বনে ঢুকে সে বার ছয়েক থমকে দাঁড়িয়েছিল। রাধা মানে না গোঁসাই। পরকীয়া-মতের উপর বিরাগ। যদি—। মোহিনী সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, দাঁড়ালি যে? চলু না কেন! কতবার বলি, এত করে ছুধ খাস না, আর গুই কছে। দিন দিন মোটা হচ্ছিস।

মেরের উৎসাহে তার শঙ্কার অবসন্ধতা কেটে গিয়েছে। শঙ্কাতে মান্থযকে বড় তুর্বল করে দেয়। অভয়ের চেয়ে বল নাই।

অভিনব জলধর স্থলর। ধৃতমন্দর। শ্রীমূথ চন্দ্রচকোর॥ জর জয় দেব হরে॥

তব চরণে প্রণতাবয়। মিতি ভাবয়। কুরু কুশলং প্রণতেষ্॥ জয় জয় দেব হরে॥

গান গাইতে গাইতেই তারা এসে আশ্রমে ঢুকেছিল। ওপার থেকেই ভেট নিয়ে এসেছিল। ওই টগরের স্তবকের মধ্যে কাঞ্চনফুলের পরন দেওয়া মালা। কিছু মাধবীফুল; কিছু চিনির মুড়কি; কিছু মিষ্টান্ন; তার সঙ্গে একটি ছোট বাটিতে ঘষা চন্দন, অগুরুচন্দন লেপন।

কিন্তু কই, নবীন সন্ন্যাসী কই ? মাধবানন্দ তথন শ্রামরূপা হয়ে ওপারের মূথে চলেছিলেন। অশু একজন সন্ন্যাসী এসে বিগ্রহের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল।

॥ यष्ठं श्रीतरुष्ट्रण ॥

সন্মাসী প্রশ্ন করেছিলেন, কী চাই? কারণ তিলক ফোঁটা সত্ত্বেও ভিক্ষুকের বেশ তাদের ছিল না।

দাসী বলেছিল, নবীন গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব হয়েছে, দর্শন করতে এসেছি, গীতগোবিন্দ শোনাতে এসেছি। শিশুটি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়েছিল।

দাসী হেসে বলেছিল, প্রভুকে, নবীন গোঁসাইকে দর্শন করব।

এবার শিষ্মাট বলেছিল, তিনি তো এখন আশ্রমে নেই। ওপারে গেছেন।

—ওপারে? তবে? পর-মূহুর্তেই বসে পড়ে বলেছিল, তা হলে বিসি।

ঠাকুরকে গান শোনাই। বলেই আরম্ভ করেছিল গান। রুফ্নাসী নিজেকে
ভাল করে জানত। সে জানত তার রূপের দীপ্তি উত্তাপ যতই কমে
থাক্, তার কণ্ঠস্বরের স্থরের তেজ মাধুর্য একবিন্দু কমে নি। এ গান, এ

হর কানে ঢুকলে তাকে বসতে দিতেই হবে। হ্যেছিলও তাই। তাদের
গান শুনে গোটা আশ্রমের অধিবাসী কয়েকজন একেবারে সম্মোহিত হয়ে
গিয়েছিল। ঠিক এমনি একটি মূহুর্তেই মাধবানন্দ এসে আশ্রমে ঢুকলেন।

বারেকের জন্ম তিনি ওদের দেখলেন। কৃষ্ণদাসীর রূপ তাঁকে পীড়িত করে তুলল। এদের তিনি চেনেন; বাল্যকালে এদের দেখেছেন। তাঁর জাতিদের ঘরের যুবকদের সঙ্গে এদের একটা গোপন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই কৃষ্ণদাসীর মত পরিণতযৌবনা বৈষ্ণবীরা—তাদের চোথের নীচে যে কালি পড়েছে, সেই কালি দিয়েই বৈষ্ণব-প্রেমের কাজল এঁকে দিত তাদের চোথে। সন্ত-ফোটা ফুলের মত কিশোরী মেরেটিকে দেখে করুণা হল, একেও দীক্ষা দিতে শুক্ করেছে ওই বর্ষীয়সী! মুধ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের

—তার জ কৃঞ্চিত। নারীকঠের গান তার আশ্রমে?

দাওরার উপর উঠলেন। ক্রফদাসী এবং মোহিনীর মুখ উচ্ছল হরে উঠল। বেন নিবে-আসে-আসে এমন ছটি প্রদীপ—নৃতন করে খত-অভিবিক্ত হরে প্রদীপ্ত হরে জলে উঠেছে।

কৃষ্ণদাসী ডাকলে, প্রভূ!

বারেকের জন্ম আবার একবার ফিরে তাকালেন মাধবানন্দ।

কৃষ্ণদাসীর বৃক্তে আবেগ জ্বমে উঠেছে, সেই আবেগে কথাও এসে জ্বমেছে মনের মধ্যে। সে বলতে চাচ্ছে—ঠাকুর, আমাদের বাঁচাতে পার? উদ্ধার করতে পার?

এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে যে কাহিনী সে শুনেছে, তার পটভূমিতে দাঁছিরে তার চোথের সম্মুথে মাধবানন্দ যেন আর লালসার জন নয়; এ যেন উদ্ধার-কর্তা। এর কাছে কটাক্ষ হেনে কোনমতেই বলা যায় না—"চাও করুণানয়নে।" ও কথা বলতে হলে সজল চোথেই বলতে হয়, পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে হয়। রুফানাসী সত্য সত্যই সেই মৃহুর্তে, উদ্ধারের আশায় আকুলভাবে আর্তা। কিছু মাধবানন্দ মৃথ ফিরিয়ে নিয়ে ঘয়ে ঢুকে গেলেন। তাঁর অবসর নেই। তিনি ডাকলেন, কেশবানন্দ! কেশবানন্দ কোথায়? তাঁর চিত্তে এদের জন্ম বিরক্তির চেয়েও আরও গুরুতর চিন্তা রয়েছে। প্রধান শিশ্র কেশবানন্দকে বলতে হবে—সাবধান, সাধুর ছয়্মবেশে বর্গীদের দেখে এসেছি ওপারে।

কৃষ্ণদাসীর মনে তখন অনেক কথা জেগে উঠেছে।—উদ্ধার করতে পার প্রভু, রমণ দাস-সরকারের মত অজগরের পাক থেকে। বাঁচাও গোঁসাই, কিশোরী হরিণীর মত এই আমার মোহিনীকে অক্রের মত চিতে বাঘের গ্রাস থেকে।

সে আবার ডাকলে, গোঁসাই! ঠাকুর! প্রভু!

মোহিনী শুর; তার মুখে কথা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই, সে নিক্ষণ প্রদীপ-শিথার মত জলছে, তার সকল ছটা গিরে পড়েছে দেবতার মত ওই মাহুষটির পা থেকে মুখ পর্যস্ত সর্বাব্দে। একটিমাত্র অস্টুট কামনা—সে শুধু প্রাণাম করবে, তার মাথার হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবে গোঁসাই, তার সারা আদ্ধানেই আশীর্বাদে থরথর করে কেঁপে উঠবে। দাসী আবার ডাকলে, গোঁসাই! বেরিরে এলেন আর-একজন। মাধবানন্দের একজন শিশু—বন্ধসে প্রোট়। ইনিই দেবতার পূজা করে থাকেন। হাতে তাঁর নির্মাল্য এবং কিছু প্রসাদ।

--নাও।

ওরা কথা বলতে পারল না। নির্বাক হরে কলের পুত্লের মত হাত পেতে গ্রহণ করল। প্রোচ্ সন্ত্যাসী চলে যাচ্ছিলেন, দাসী তাঁকেই ডাকলে, প্রভূ!

—বল, কী বলছ? বলেই আবার বললেন, এখানে পূজায় কোন মানস সিদ্ধি হয় না। কোন কবচ-টবচ আমাদের নেই। যা নির্মাল্য আর প্রসাদ দিয়েছি, এর বেশী কিছু দেবার নেই বাছা।

হাতথানি বাড়িয়ে রুঞ্দাসী বললে, গোম্বামী প্রভূকে একবার প্রণাম করব। কটি কথা বলব।

- —উনি খুব ব্যস্ত এখন।
- —খুব ব্যন্ত !
- —হা। চলে যাবার জন্ম উন্মত হলেন সন্ন্যাসী।—কেশবানন্দজী!
 মহারাজ!
 - —প্রভূ! আবার ডাকলে কৃঞ্চাসী।
 - —আরে মারী, ফের ডাকলে উনি গোস্থা হয়ে যাবেন। জরুরী কাজ।
- —না ঠাকুর। সে কথা বলি নি। বলছি, আমরা গোবিন্দের জন্ম ভেট এনেছি। ওই রেখেছি। ওই কটি তা হলে নিবেদন করে দিন।

দাওয়ার ওপর নামানো ভেটের ভালাটি সে দেখিয়ে দিল। সবার উপরে টগরফুলের গাঁথনির মধ্যে লাল কাঞ্চনের পরন-দেওয়া সেই মালাখানি অস্লান মাধুর্যে উজ্জ্বল রয়েছে, কয়েকটি মৌমাছি তার উপর উড়ে উড়ে ফিরছে।

শিশু কিছু বলবার বা করবার আগেই মাধবানন্দ নিজেই বেরিরে এলেন, তিনি সব শুনেছেন। বললেন, ওখান থেকেই নিবেদন করা হয়ে গেছে। নিয়ে যাও প্রসাদ।

দাসী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আমাদের আনা ফুল ফল ঠাকুর ছোঁবেন না? অর্থ সে বুঝেছে।

শাস্ত গম্ভীর স্বরে মাধবানন্দ বললেন, দেবতার দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত।

সব জারগার পড়ে, দেওয়ালের ঘেরে তো আটকায় না; ওঁর ভোগ তো দৃষ্টিতে। দৃষ্টি নিশ্চয় পড়েছে ভোমাদের নৈবেক্সের উপর।

দাসী বললে, রাধাবিনোদের দরবারে, জগরাথ প্রভুর দরবারে কোথাও তো এমন নিরম নাই গোঁসাই। ওই তো, ওই তো তোমার গলার রাধা-বিনোদজীর প্রসাদী মালা, ও মালা তো আমার মেয়ের হাতের—এই মোহিনীর হাতের গাঁথা। কই, সেখানে তো—

তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল; মাধবানন্দ গলা থেকে মালাগাছি খুলে ফেলেছেন দেখে তার সমস্ত দেহমন যেন পঙ্গু হয়ে গেল। পর-মুহুর্তেই মেয়ের হাত ধরে সে টানলে, আর, সঙ্গের মত দাঁড়িয়ে থাকিস না। মোহিনী!

মোহিনী নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে, আমরা কী করলাম ?

মাধবানন্দ মালাগাছি তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন: নাও। ধর। রাধা-বিনোদের প্রসাদ।

মোহিনী হাত বাড়ালে, সে সব কথা ঠিক ব্রতে পারছে না। ব্ক তুরু তুরু করে ভয়ে কাঁপছে।

ওদিক থেকে দাসী সবলে তাকে আকর্ষণ করলে: না। তারা চলে গেল।

মাধবানন্দ মালাগাছি দরজার চৌকাঠের মাথায় খোদাই হাতীর ওঁড়ের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। কাল অজন্তের স্রোতে ভাসিয়ে দেবেন।

ঠিক এই মৃহুর্তেই লখিলার মাঝির উৎকণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠে নিঃশব্দ শাস্ত আশ্রম-খানি যেন চকিত হয়ে উঠল—কুলে ফুলে মধুপানরত মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে উড়ল, শ্রমরেরা উচ্চতর শব্দ করে প্রচণ্ড বেগে উড়ে চলে গেল এক দিক থেকে অন্ত দিকে; কল্লেকটা বিশ্রামরত কোকিল চকিত কুছ কুছ শব্দ করে পাখার শব্দ ছড়িরে দিয়ে উড়ে গেল। গাই কটি নড়ে চড়ে উঠল— যে কটি বলে রোমন্থন করছিল তারা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। আশ্রমের সন্মানীরা বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

লখিন্দর শহিত কঠে চিৎকার করতে করতে এসে আশ্রমে চুকল— মহারাজ গুক মহারাজ! গোস্বামী মহারাজ!

- কী ? মাধবানন্দ ঘর থেকেই প্রশ্ন করলেন।
- —ওপারে দাঙ্গা লেগে গিয়েছে মহারাজ!
- —माना ? कांत्र मान ? कांथांत्र ? श्री कंत्रलम किमार्गामन !
- —নাগা সন্ধ্যাসীদের সঙ্গে ছোট সরকাবের দলের। ওপারের চরে লেগেছিল। নাগারা এই পারে চলে আসছে বনের বাগে (দিকে)।
- —কেশবানন্দ! মাধবানন্দ আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারলেন না, বেরিরের এলেন।

লথাই তথনও বলছে—ওরে বাপ রে। নাগারা কোথা থেকে সড়কিতরোয়াল তীর-ধমুক বার করলে, তার পরেতে সে কী কাণ্ড! হাতীতে চড়ে
ঘোড়ায় চড়ে সরকারের লেঠেলের দলকে কচ্-কাটা করে মেলা লগুভগু
করে চলে আসছে এই দিকে। বন্দুকও রয়েছে গো ওদের সঙ্গে!

—প্রস্তুত হও কেশবানন্দ। এরা সন্ন্যাসী নয়। আমার বিশাস এরা ছন্মবেশী বর্গী! মহারাষ্ট্রে এদের হিন্দুস্থান লুঠের উত্যোগের কানাঘুবো আমি শুনে এদেছি। এদের সঙ্গে কথা কয়ে, এদের কথার টান শুনে, এদের চেহারা দেখে আমার দৃঢ়বিখাস হয়েছে এরা বর্গী। বর্গীদের কাছে লুঠতরাজের সময় পৃথিবীর কোন বাধাই বাধা নয়। আমাদের আশ্রম পথে পড়বে; আশ্রম লুঠ করতে ওরা বিধা করবে না। তোমরা তৈরী হও। ওদের সঙ্গে হাতী আছে।

কেশবানন্দ ডাকলেন, গোপালানন্দ!
ভীমকান্ন গোপালানন্দ তার আর-তৃজন সঙ্গীকে নিয়ে এসে দাঁড়াল।
—এস। বের কর।

দণ্ড খানেক সময়ের মধ্যে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। কোথা থেকে বের হরে এল গোটা বিশেক পর্তু গীজ ফিরিঙ্গীদের তৈরী বন্দুক, বারুদ, গুলি। আরও বের হল রাজপুতানার ভীলদের তৈরী ধন্দক-তীর। তার সঙ্গে তরবারি। বের করে আনলে বড় বড় মই। মইগুলি লাগানো হল কয়েকটা বিরাটশীর্ষ গাছের গায়ে। গাছগুলির ডালের উপর কবে কখন মাচা বাঁধা ইয়েছে বাইবের লোক ঘুণাক্ষরে টের পায় নি, এমন কি লখিন্দর পর্যন্ত পার নি। তার বিশ্বরের আর অবধি রইল না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভরও জেগে উঠন মনে। এরা কারা ? এরা কী ? ওপারে কেন্দুলীর মহাস্তদের গদি অবঙ সে দেখেছে—তাদের পাইকদের বহরও দেখেছে, লাঠি সড়কি প্রভৃতির সরঞ্জামও না-দেখা নয়, কিছু এদের এ-সব ব্যবহার ধারাধ্যন রক্মসক্ম স্বই আলাদা।

চারটে মাচার আট জন লোক উঠে গেল। আটটা বন্দুক বারুদ গুলি উঠিরে নিল তারা। তার সঙ্গে তীর ধহক। আশ্রমের ঘের শক্ত শাল্যুটি দিয়ে তৈরী, তার মধ্যে ছটি ফটক; ফটক ছটির মুখে শক্ত আগড় টেনে এনে ঠিক করে রাখল, যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্ধ করে দেওরা যার।

মাধবানন্দ বললেন, দেখতে পাচ্ছ কিছু?

পশ্চিম দিকের সব চেয়ে উচু শালগাছটির মাচা থেকে তরুণ সন্ন্যার্গা শ্রামানন্দ বললে, পাচ্ছি, ওরা অঙ্করের স্রোত পার হয়ে এপারের চরে উঠছে। তুটো হাতী, দশটা ঘোড়া, লোক প্রায় পঁচিশ জন।

--ওপারের অবস্থা ?

—ওপারে কাতারে কাতারে লোক জমছে। দীভিয়ে দেখছে। গুরু মহারাজ!—কথা বলতে বলতেই স্থামানন্দ অকমাৎ উত্তেজিত কণ্ঠমরের বলে উঠল, গুরু মহারাজ! কণ্ঠমরের উত্তেজনার মধ্যেও শহার আভাস। অকমাৎ একটা কিছু যেন ঘটেছে!

মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন, কী ?

—বাল্চরের ওপর ছটি মেরে! ছুটছে—পালাচ্ছে। ওদের চরের উপর উঠতে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে। সেই মেয়ে ছটি। যারা এখুনি এখান থেকে গেল। মহারাঞ্জ, ওরাও মেয়ে ছটিকে দেখেছে। বর্বর আনন্দে চেঁচাচ্ছে। মহারাজ—ছজন নাগা, ছুটেছে।

नथिन्तर वतन छेर्रन, हेत्नमवाकारत्रत्र मा-की!

মাধবানন্দ বললেন, গোপালানন্দ! তোমরা চারজন এস আমার সঙ্গে। বন্দুক নাও সঙ্গে। আমি বন্দুক ছুঁড়লে, তোমরা এক সঙ্গে চারটে বন্দুকের আওয়ান্দ করবে। গুলি পৌছবে না, কিন্তু শব্দে কাজ হবে।

: क्लावानम वनतन, वांशन यादन महादाक ?

—নারীকে রক্ষা করতে না পারলে ধর্ম চঞ্চল হবেন। প্রভূ মূখ কেরাবেন। আর তুমি জান না কেশবানন্দ, আমি নিজে চোখে গোয়াতে দেখে এলেছি, মেয়েদের কী নিষ্ঠুর নির্বাতন করে এরা!

তিনি শিউরে উঠলেন। পরক্ষণেই 'জয় চক্রধারী, জয় নারারণ!' বলে তিনি ক্রত পদে বেরিয়ে গেলেন। হাতে নিলেন একথানি তরবারি। বিপুলকায় গোপালানন্দ চার জন সঙ্গী নিয়ে বাঘের মত লাফ দিয়ে তাঁর সঙ্গ নিল।

ধাবার সময় মাধবানন্দ চিৎকার করে বললেন, তোমরা নাকাড়ায় ঘা দাও। ঘাটে বজরার ওদের সাবধান করে দাও।

সামনে অন্ধরের ঘাটে আশ্রমের করেকখানা নৌকা বাঁধা আছে। যে বজরায় তিনি এসেছেন, সেখানা এবং তার সঙ্গে আরও করেকখানা—তার মাল্লা-মাঝিরাও আশ্রমেরই লোক। তবে ঠিক সন্ধ্যাসী নয়। তারাও লড়তে জানে। উত্তরবঙ্গের পাকা মাঝি এবং সড়কিবাজ নমশূল তারা। মাধবানন্দ, তাঁর পিতৃকুলের অন্থগত মাঝি-সম্প্রদায় থেকে এদের সংগ্রহ করে এনেছেন। যারা নৌকায় পদ্মার ডাকাতি করে ফেরে, চর নিয়ে দান্দা করে, এরা তাদেরই সস্ততি। মাধবানন্দ এদের নতুন জীবনে শিক্ষা দিছেন। দীক্ষা এখনও হর নি। লখিন্দরের মত কয়েকজন এখানকার লোকও সম্প্রতি নিয়েছেন এদের সঙ্গে।

অজরের জলস্রোতকে মাঝথানে রেথে সন্ন্যাসী-সম্প্রদার দক্ষিণ তীরে বালির উপর তাদের দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারে কেন্দুলীর তীরে প্রায় সারা মেলাটার লোক জমেছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদার, বিশেষ করে যারা হাতী ঘোড়া এবং শিশুসেবকের দল নিয়ে দেশ ভ্রমণ করে, তারা প্রশ্নেজন হলেই ত্রিশূল এবং চিমটেকে অস্ত্র হিসেবে উন্নত করে লড়াই করে থাকে। তীর্থপথে দক্ষে দলে সংঘর্ষ হয়, যাত্রীদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, আবার স্থানীয় লোকেদের সঙ্গেও হয়, কিছু এমন হয় না। তাদের সঙ্গে বড় জাের তলােয়ার বাঘনথ থাকে, বন্দুক থাকে না। সারা মেলাটার লােক চমকে গেছে। যতক্ষণ না তারা নদী পার হয়ে এপারে এসেছে, ততক্ষণ পর্যন্তও তারা পশুর মত ছুটোছুটি করেছে। সারা চরটা প্রায় জনশূন্তই হয়ে পড়েছিল। ওরা জলে নেমে মাঝ নদী পর্যন্ত যাওরার পর লােকেরা উকিয়ুঁকি মারতে

ভক্ষ করে। এপারের কাছাকাছি হতেই বেরিয়ে এসে নদীর পাড়ে দাঁড়ার; এখন এসে নদীর চরভূমে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করছে—গেল। গেল। গেল। গেল ওই মেয়ে ফুটো।

এপারে কৃষ্ণদাসী আর মোহিনী ভরে প্রাণপণে ছুটছে। ছুটে পালিয়ে চলেছে বিপরীত মুখে। লক্ষ্যন বোধ করি মনের মধ্যে স্থির করবারও অবকাশ হয় নি; বাঁয়ে অজয়, ভাইনে অদ্বে বন—তার মধ্যে শরবন কাশবন ও নানান তৃণে আচ্ছন্ন সেই চরভূমি ধরে তারা ছুটছে। এই মুহুর্তে বিশ্ববদ্ধাণে এইটি ছাড়া আর কোন আশ্রয়দ্ধান তাদের আর নাই, মনে পড়ছে না।

দেউলের ঘাটে বাঁধা বজরাখানা এবং অপর নৌকাগুলি ঘাট ছেড়ে নিরাপত্তার জ্বন্ত গভীর জ্বনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—মাল্লারা সড়কি-হাতে নৌকার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক জনের হাতে তীর ধমুক।

তৃজন সন্থাসী পলায়নপর মেয়ে তৃটোর দিকে বর্বর উল্লাসে চিৎকার করে ধরবার জন্ম ছুটেছে। হাতীর হাওদার উপর দাঁড়িরে আছে সেই প্রধান সন্থাসী। নিষ্ঠ্র ক্রোধে তার মুখখানা ভরুকর হরে উঠেছে। চিৎকার করে বলছে, আমার অভিশাপে একদিন এই তামাম মুলুক ছারেখারে যাবে। ঘর জ্বলবে। শিবের অন্থচরের তাগুবে তছনচ হয়ে যাবে সব। পঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেলবে দেশ। হাঁ! আর মধ্যে মধ্যে এদিকে মুখ ফিরিয়ে বলছে—পাকড়কে লাও। পাকড়কে লাও।

মাধবানন্দ সঙ্গীদের নিয়ে যেখানে দাঁড়ালেন—দে স্থানটি ঠিক পলায়নপর ক্ষেদাসীর ও অন্থারগরত সম্ঞাসী তৃজনের মধ্যে পূর্বপশ্চিমে সরলরেখা টানলে তার প্রায় মাঝখানে, কিছু অনেকটা দক্ষিণে। একটি স্থূলকোণ তিভুজের মত অনেকটা। ওই স্থূলকোণের বিন্দৃটির উপর মাধবানন্দ এবং সামনে অতিভূজের তৃই প্রাস্থে অপর তৃই কোণের এক কোণে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনী 🚜 অন্থা কোণে সন্থাসী তৃজন। মাধবানন্দ বললেন, এক বন্দুক দাগো গোপালানন্দ। জলদি।

গোপালানন্দ মূহুর্তে বন্দৃক দেগে দিল। অজয়ের গর্ভে গর্ভে একটি শব্দ এপারে-ওপারে প্রতিহত হতে ছতে তৃপাশে ছড়িরে পড়ল। করেক মূহুর্ত বেতে না বেতে, পর পর আটটি বন্দুকের শব্দ ধ্বনিত হরে উঠল তখন আকাশ-লোকে, প্রায় বনভূমির মাধার উপর।

ছই পারের ছই পক্ষই চকিত হয়ে উঠল। ওপারের জনতা ঘটনাটা ঠিক কী ব্যতে না পেরে ছুটতে লাগল। পালাতে লাগল। এপারে অফুসঁরণরত সন্ন্যাসী হজন থমকে দাঁড়াল। ওদিকে হাতীর হাওদার উপর খাড়া সন্ন্যাসী চকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে মাধবানন্দদের দেখে দাঁতে দাঁত ঘমে কঠোর কিছু উচ্চারণ করল। একবার হাতীটা মাহুতের ইন্ধিতে কয়েক পা অগ্রসরও হল মাধবানন্দের দিকে, কিছু তারপরই পর পর আটিটা বন্দুকের শব্দে চমকে উঠে কিছু বলতেই হাতী থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল নাকাড়ার শব—ডুম-ডুম-ডুম, ডুম-ডুম-ডুম-ডুম। ওদিকে বজরা এবং নৌকা থেকে মাল্লারা ঝপাঝপ জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে এসে কুলে উঠে সারিব্র হয়ে দাঁড়িয়ে বাংলার বহুবিখ্যাত কুক অর্থাৎ যুক্তধানি দিয়ে উঠল—ম্থে হাতের তালু সঞ্চালনের ফলে সে ধানি অতিবিচিত্র—আ-বা-বা-বা-বা-বা। ঠিক সেই মুহুর্তটিতে মেয়ে ছটিও বারেকের জন্ম ফিরে তাকিয়ে সব দেখে থমকে দাঁড়াল; একটি আর্তস্থরের চিৎকার উঠল, পর-মূহুর্তেই কিশোরীটি চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল সেইখানে। ক্রফ্ডাসীও বসে পড়ে চিৎকার করে উঠল।—হে গৌর, রক্ষা কর। বাঁচাও। ওগো ঠাকুর মু

মাধবানন্দ তাঁর দল নিয়ে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন খানিকটা। মাল্লারাও এগিয়ে আসছে। ওদিকে পিছনে বনের মধ্যে নাকাড়ার শব্দ গাছে গাছে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ধ্বনি-তরঙ্গ তুলেছে। আকাশে ভয়ার্ত পাথিরা উড়ছে। অজয়ের চরভূমের কাশ ও শরবনের আশ্রয় থেকে সজাক্ষ খরগোশ কয়েকটা ছটে পালাল। একটা ঝোপ থেকে একসঙ্গে চার-পাঁচটা বুনো শুয়োর দিখিদিকজ্ঞানশুয় হয়ে ছটল।

মাধবানন্দ দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, এরা সন্মাসী নয়, এরা সন্মাসীর ছদ্মবেশে বর্গীর দল। তোমরা ওপারে কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে থেকো না, এগিয়ে এস। কোন ভর নেই। দেউলের আশ্রমের সন্মাসী আমরা—আমরা থাকব সর্বাগ্রে—সামনে।

কথায় ফল হল। কিছু সবল স্বস্থ জোয়ান চিৎকার করতে করতে অজয়ের জলে নামল। মার্—মার্ বেটাদের। মার্—

সন্মাসীর দলের প্রধান দাঁড়িরে ছিলেন হাওদার উপর, তিনি বসে পড়লেন।

একটা শিঙা তুলে বাজিয়ে দিতেই দলের পদাতিকেরা বনের দিকে চলতে লাগল; অহসরণকারী সন্মাসী ছজনও ফিরল। পদাতিকের পিছনে চলল ঘোড়সওয়ারেরা। তার পিছনে হাতী। হাতীর হাওদার উপর আরোহীরা পিছন দিকে অহসরণকারীদের জন্ম বন্দুক প্রস্তুত রেখে চলতে লাগল। হঠাৎ অহসরণরত সন্মাসী ছজনের একজন একটা চিৎকার করে হাত ছটোকে উপরের দিকে তুলে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। গোপালানন্দ জাহ্ম পেতে বসে রাজপুতানার ভীলদের ধহ্মকে আকর্ণ জ্যা টেনে নিপুণ লক্ষ্যে তীর ছেড়েছিল। সে তীর ছুটস্ত মাহ্মর ছটির একটিকে বিদ্ধ করেছে। হাতীর উপর থেকে প্রধান সন্মাসী কিছু বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আহত সন্মাসীর সঙ্গী তার হাতের তলায়ারখানি সঙ্গীর বুকে আম্ল বিদ্ধ করে তাকে নিশ্চিত-রূপে হত্যা করে তলায়ারখানা আবার টেনে নিয়ে উপর্বাসে ছুটল। গোটা দলটি তখন বনের প্রাস্তুদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নাকাড়ার শন্ধ যেদিক থেকে আসছে সে দিকটা যথাসম্ভব দূরে রেখে দিক নির্ণন্ধ করে বনের মধ্যে ঢুকছে।

মাধবানন্দ এগিয়ে গিয়ে কিশোরী মেয়েটির শিয়রে দাঁড়ালেন। চমকে উঠলেন তিনি। ভীক কিশোরী কি আতক্ষেই মরে গেছে? বসে তিনি তার হাতথানি তুলে ধরলেন। নাড়ী পরীক্ষা করলেন। অতি ক্ষীণ ভাবে নাড়ীর গতির আভাস পাওয়া যাচছে। মধ্যে মধ্যে কেটেও যাচছে। এখনও জীবন আছে। কিন্তু অবিলম্বে কোন সঞ্জীবনী ওষ্ধ না-পড়লে বিপদ্ব ঘটবে। মকর্মজ্য বা মগনাভি।

—গোপালানন্দ! শিগগির একজন এখানে এস। শিগগির। আর তোমরা অন্থসরণ কর। আশ্রম থেকে বন্দুকধারীদের কয়েকজনকে নাও। বনের আশ্রেরে বাঘ বড় ভয়ধ্ব শক্র। যতদ্র পারা যায় ওদের তাড়িয়ে দিয়ে এস। লোক জড়ো কর। লোক চাই। নাকাড়া বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চল।

क्रथमात्री हि॰ कांत्र करत्र छेठेन, तका कत्र शौंगारे, खर्गा शोत्र, तका कत्र।

্ অনেককণ পর মোহিনী চোখ মেলল।

চৈত্রের স্থ তথন অপরাহের দিকে চলেছে। মাধবানন্দ তাকে একথানি নৌকার উপর শুইরে দিয়েছিলেন। আশ্রম অনেক দ্র; বাল্চরে ছায়া নেই; তাই একথানি নৌকাকে কাছাকাছি এনে সম্ভর্গনে তার ছইয়ের নীচে পাটাতনের উপর শুইয়ে দিয়েছিলেন। একজন সেবককে আশ্রমে পাঠিয়ে চিকিৎসা-বিভার অভিজ্ঞ রামানন্দকে সংবাদ দিয়েছিলেন। রামানন্দ শঙ্কিত হয়েছিলেন প্রথমটায়। ভেবেছিলেন হয়তো যে কোন মৃহুর্তে হল্পিণ্ডের গতি স্তর্ক হয়ে বাবে। সে আশ্রমা দুরে গেল, মোহিনী চোথ মেলে চাইল।

মাধবানন্দ ভাবছিলেন, চলে যাবেন। তাঁর তো আর করার কিছু নেই! ওদিকে রুফদাসী যেন পাথর হয়ে গেছে। স্থাপুর মত বসে আছে। তথু চোথের দৃষ্টি তার অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল। নৌকার উপর মোহিনীকে ত্লবার আগে পর্যন্ত সে বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলেছে। অচেতন মোহিনীর অদ্রে দাঁড়িয়ে বলেছে, চোখ মেল, মোহিনী, চোখ চেয়ে দেখ—, ওরে নবীন গোঁসাই—দেবতা তোর মুখের দিকে চেয়ে। তয় নাই, আর ভয় নাই। চোখ চা মা, চোখ চা।

মাধবানন্দ ৰির্জ্জি প্রকাশ করে বলেছিলেন, চিৎকার কোর না তুমি।

কিছুক্ষণের জন্ম শুরু থেকে আবার ক্লফদাসী শুরু করেছিল, তোর অনেক ভাগ্যি—তোর অনেক ভাগ্যি! সাতজন্মের তপশুলা না থাকলে দেবতার সেবা কেউ এমন করে পায় না।

মাধবানন্দ এবার জ্রক্ঞিত করে তার দিকে তাকিরেছিলেন শুধু। চুপ করে গিয়েছিল রুঞ্চাসী।

এর পর মোহিনীকে শিশুর মত তুই হাতের উপর তুলে নিয়ে নৌকার উপর তাকে স্যত্নে শুইরে দিতেই, রুফ্দাসী তাঁর কাছে এসে তাঁর পায়ে হাত দিরে বলেছিল, দরাল তুমি ওকে চরণে রাখ—

এবার মাধবানন্দ তাঁর পা টেনে নিয়ে সরে এসে বলেছিলেন, দূর থেকে প্রণাম কর। পায়ে হাভ দিয়ে নয়।

তারণরই যে কথাটি বলেছিলেন—সে কথা কথা নয়—সে কথা মর্মচ্ছেদী উত্তপ্ত লৌহশলাকা। বলেছিলেন, পার্শিষ্ঠা কোথাকার!

ক্লুক্লাসীর কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁর কাছে গুর্বোধ্য ছিল না। এদের এই বাক্ত দির সদে তাঁর পরিচয় বাল্যকালের। তাঁর বাল্যকালে ঠিক এমনি একটি বৈষ্ণবী ছিল তাঁলের গ্রামের কাছে। তারও ছিল একটি পালিতা কক্সা। গান গাইতে স্মাসত। জাঁদের কাছারিতে বৈঞ্চব-পর্ব বৃদ্ধি নিডে আসত; দোলে-ঝুলনে-রাসে-জন্মাইমীতে হু আনা হিসেবে বৃত্তি। মেয়েট ভোভাপাথির মত কথা বলত—বৈষ্ণবী বুলি, গানের সময় মন্দিরা বাজাত, স্থরে হব মেলাত। মাধবানন্দের সঙ্গে বয়সের অল্লই পার্থক্য ছিল ভামিনীর: মেমেটির নাম ছিল কৃষ্ণভামিনী। সে-ই কিছু বড ছিল। কৃষ্ণভামিনী গান পাইত, তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। তের-চোদ বছর বয়সে ক্লফভামিনী ঠিক মোহিনীর মত হলে উঠল। মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে সে রাঙা হয়ে উঠত। মাধবানন্দের বয়স তথন বারো-তেরো। কিন্তু বাডির কুন্তিগীরের সঙ্গে আথড়ার মাটি মেথে এবং হুধ ঘিয়ের প্রাচর্ষে তথনই তিনি মাথায় বেড়ে উঠেছেন, দেহে শক্তির জোয়ার এসেছে। অফুট ভাবে অনেক আভাস দূরে-ফোটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধের মত তাঁর নাকে আসতে আরম্ভ করেছে। গভীর রাত্তে আধোঘুমের মধ্যে দুরে-ফোটা কামিনীফুলের গদ্ধে চঞ্চলতার মত একটা চঞ্চলতা তিনি অমুভব করতেন ভামিনী কাছে এলে।

ভামিনীর পালিকা মাপ্রোচা বৈক্ষবী ঠিক এমনি ধরনের কথা বলত। বলত, গোবিন্দের চেরে রাধা কিছু বড়ই ছিল গো, কিশোর ঠাকুর। বলে হাসত।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ওই বৈশ্ববীই তাঁকে প্রথম শুনিয়েছিল। বলেছিল, জান কিশোর ঠাকুর, কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দে আছে— সে দিন আকাশে খ্ব মেঘ করেছে, সে ঘনঘটার নীল আকাশ ঘনশ্রাম হয়ে উঠেছে। গুরু গুরু শব্দে মেঘ ভাকছে, রন্দাবনের বনে একে কালো তমালগাছের ভিড়, তার উপরে রাত্রিকাল। মহারাজ নন্দ য্বতী রাধাকে ভেকে ভার হাতে কিশোর কৃষ্ণকে দিয়ে বললেন—রাধে, তুমি আমার ঘূলাল মাধবকে নিরে ঘরে দিরে এস। বল তো কিশোর ঠাকুর, ভামিনী ভোমাকে দাঁড়িয়ে আন্দে বাদ্ধি পর্যন্ত।

সন্ধ্যাবেল। সেদিন মা ও মেয়ের সন্দে তাঁর গ্রামপ্রান্তে দেখা হরেছিল।

ক্রেকটা কথা তিনিই বলেছিলেন ডেকে; তারপর অকম্মাৎ সন্ধ্যার কথা মনে হতেই বলেছিলেন, আজ বাড়ি যাই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মা বকবেন।

বৈষ্ণবী ওই কথাই বলেছিল সে দিন; অবশ্য ভামিনীকে দাঁড়িয়ে দেবার জন্য সঙ্গে নেন নি তিনি—সলজ্জ ভাবে 'ধেং' বলে নিজেই চলে এসেছিলেন। কিন্তু সে কথা মনে আজও আছে। এবং আরও মনে আছে—তাঁর মা সেদিন তাঁকে মৃত্ ভর্ৎ সনা করেছিলেন, চোথ দিয়ে তাঁর জল পড়েছিল, কথা বলতে কেইদিনই তাঁর বাপের, তাঁদের বংশের অন্ধকার ঘরের ইতিহাস ছেলের সামনে খ্লে ধরেছিলেন। সে অন্ধকার ঘর—বাইরের নাটমন্দির দেবমন্দির কীতিকলাপ সব-কিছুর চেয়ে অনেক বিপুল অনেক বিশাল; বিরাট এক গ্রাস বিস্তার করে সে এগিয়ে আসছে, একদিন উদরসাৎ করে নিশ্চিম্ভ হবে। কোঁটা তেথ্য চোথের জল তাঁর স্বাক্তে খবে পড়েছিল। সেই বৎসরই হল তাঁর উপনয়ন। মা দিলেন দীক্ষা। শিক্ষার ভার নিলেন এক আচার্য। এবং সেই বৎসরই তাঁরই জ্ঞাতি দাদার কুঞ্জে রুষ্ণভামিনী দাদার সাধনসন্ধিনী হয়ে প্রবেশ করল। অমাবস্থার অন্ধকারে—এরা জ্ঞানাকীপোকার মত মেকী জ্যোতির ছলনা, তেমনি হুর্গন্ধময়—তেমনি বিষাক্ত। সেই কারণেই জিহ্বা তাঁর অসঙ্কোচে উচ্চারণ করেছিল—পাপিষ্ঠা কোথাকার!

মোহিনী চোথ মেলে চাইল।

সামনেই দাঁডিয়ে মাধবানন। তিনি ভাবছিলেন, চলে যাবেন।

একটা দীর্ঘশাস ফেললে মোহিনী। আখাসের দীর্ঘনিখাস। সামনে নবীন গোঁসাই, তা হলে আর ভয় নাই। তারপর তার চোথে পড়ল, সেনোকোর উপর শুয়ে আছে। তা হলে নবীন গোঁসাই তাকে বাঁচিরেছেন! সে ছবি যে তার চোথের উপর ভাসছে। বন্দুকের শব্দ শুনে চোথ ফিরিয়ে সে দেখেছিল, নবীন সয়্ল্যাসীকে তলায়ার হাতে অভয়দাতা দেবতার মত। থানিকটা দুরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তারপর আর তার মনে নেই। চেতনা আসায় তাঁকে এত কাছে সামনে দেখে তার আর কোন ভয় রইল না। সংশয় রইল না। গৌর তাকে কাঁচিয়েছেন! তার চোথ ফেটে জলধারা বেরিয়ে এল, টলমল করে উঠল চোথ ছটি। পরম নিশ্বিস্ক

ভরে সে চোথ বৃজ্জলে, ভয় নেই—গৌর তাকে রক্ষা করেছেন, তাঁরই নৌকায় তাকে ঠাঁই দিয়েছেন, সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন—আবার কী ? চোথের নেমে-আসা পাতা ছটির চাপে চোথের কুলে কুলে ভরা জল দরদর ধারায় বেরিয়ে এল—

- —জ্ঞান হরেছে। কে কথাটা বললে, বুঝতে পারলে না মোহিনী। তবে গৌর নয়। তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ী দেখে বললে, তুর্বলতা কমে আসছে। তবে বিশ্রাম প্রয়োজন। আকম্মিক ত্রস্ত ভরে হদ্যন্ত তুর্বল হরে পড়েছিল।
- —এই নৌকাতেই এদের—কোথায় বাড়ি সেই গ্রামের ঘাটে পৌছে
 দাও।—এ কণ্ঠস্বর তাঁর, চোখ মেললে মোহিনী। দেখলে, পিছন ফিরে
 চলে যাচ্ছেন তিনি। নৌকাটি অল্ল ছলছে। মাধ্বানন্দ নৌকা থেকে
 নেমে পাঁছলেন।

মোহিনী উঠে দেখবার চেষ্টা করলে। কিছু প্রোচ় সন্মাসী বারণ করলেন, উঠোনা। উঠোনা।

মোহিনী ফ্যালফ্যাল করে চেরে রইল—জেদ করবার মত তার মনের ধাতুর দৃঢ়তাই নেই, একবার কাতর অমুনয়ে বলতেও পারলে না—গৌরের চরণের একটু ধুলো!

দীর্ঘনিখাস ফেলে সে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে সে প্রশ্ন করলে, মা? স্থামার মা?

— আছে। এই যে বসে আছে।

ক্ষুক্ষদাসী সেই থেকে পাথরের মত বসে আছে; চোখে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টি।
দুরে বনের মধ্যে তথনও নাকাড়া বাজছে। ওপারের ভিড় কমে এসেছে,
কিন্তু এখনও অনেক লোক জমে রয়েছে। কিছু লোক এপার পর্যন্ত এসেছে।
চারিদিকে উত্তেজনার চিহ্ন এখনও বিকীর্ণ হচ্ছে—পুড়ে-যাওয়া ঘরের ভন্মশুপের উত্তাপের মত। ছোট ছোট দলে ভাগ হরে আলোচনা করছে।

মাধবানন্দ তীরে উঠবামাত্র একদল লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। সেদিন যারা তাঁকে নৌকার উপর স্থ্বন্দনার সময় সকালের আলোয় তাঁর রূপ দেখে মুখ্য হয়েছিল, আজ তারা তাঁকে স্কার একরূপে দেখেছে। রূপে মাহ্যব মুখ্য হয়—বীর্ষে মাহ্যব অভিভূত হয়ে নত হয়। তারা ছইই হয়েছে। মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন, ওপারে কী হরেছিল—কেউ বলতে পার ? আমি স্থ্রপাত দেখে এসেছিলাম। একজন ঘোড়সওয়ার—একজন সন্ন্যাসীর প্রায় ওপরে গড়বার উপক্রম হতেই সন্মাসী ঘোড়ার লাগাম ধরে এমনি টান দিরেছিল যে ঘোড়াটা পড়ে যায়—

- —ই্যা। ইলেমবাজারের ছোট দাস-সরকার।
- —হাঁা, কয়েকবারই নামটা শুনেছি। ইলামবাজারের খুব বড় গদিওয়ালার ছেলে। খুবই ছুর্ধর্ব ! চিৎকারও করছিল, হামারা কোই হায় রে!
- —আজ্ঞে হাঁ। এখানকার লেঠেল-টেটেল সবই ওদের টাকা খায়।
 তা ছাড়া ছোট দাস-সরকার ওদের নিরে ইয়ার বন্ধীর মত ওঠে বসে।
 মদটদ খার। আর কাছেই লাউসেন তালাওয়ের চারিপাশে অনেক ডোম
 লেঠেল আছে। তারা খবর পেয়ে হারে রে' করে ছুটে আসে। ওরা লাঠিবাজি পেলে আর কিছু চায় না, দালাতে ভারি নেশা—
 - —থাক্ সে কথা। ওপারের ঘটনাটা শুধু জানতে চাচ্ছি।

ছোট সরকারের হাঁকে তারা এসে জমেছিল। তারপর বচসা গালাগাল। সরকার খুব গালাগাল করে ছকুম দিয়েছিল—দে বেটাদের পিটে ভাগিয়ে। কেড়ে নে হাতী ঘোড়া যা পারিস। ওরে বাবা, সঙ্গে সঙ্গে নাগারা সড়কি তলায়ার বার করে—

- —কেউ কি মরেছে ? **জ্পম হয়েছে** ?
- —সরকারের দলের একজন মরেছে। জথম হয়েছে পাঁচ-সাত জন।
 সরকারের পাখানা আগেই জথম হয়েছিল, দাঙ্গার সময় পালাতে গিয়ে মৃথ
 থ্বড়ে পড়ে নাকে খ্ব চোট খেয়েছে। আর যাত্রীদের মধ্যে পালাতে
 গিয়ে পায়ের চাপে জন কতক জথম হয়েছে। হাতীর পায়ের চাপে এক
 বৃড়ী মারা গিয়েছে।

মাধবানন্দ ভিড় ঠেলে বাইরে এলেন।

নৌকাটা তথন ইলেমবান্ধারের ঘাটের দিকে **অগ্রসর হতে শু**রু করেছে। ওপারের চরের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে একজন লোক ছুটছে আর চিৎকার করছে।

—করো ঠিক বেছে মা-জী—তুমি জ্জেবা না। করো ঠিক চলছে সক্ষে শঙ্গে মা-জী। ঘটনাটার কয়েকদিন পর। মাধবানন্দ ভোরবেলা উঠেই প্রবীণ সন্ন্যাসী কেশবানন্দকে ডেকে বললেন, এ কয়েকদিন ছশ্চিস্তায় আমার নিদ্রা হচ্ছে না কেশবানন্দ। আমি বড় চিস্তিত হয়ে পড়েছি।

কেশবানন্দ বড় ধীর মাত্র্য, পশ্চিমদেশীয় লালা-বংশের লোক; জীবনে রাজকর্মে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বংশের সন্তান। সংসারে নিঃসন্তান পত্নীর অনাসক্তি এবং গুরুর প্রতি ভক্তির বাছল্য দেখে তিক্ত হয়ে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মাধবানন্দের সঙ্গে পরিচয় হয় কাশীতে। মাধবানন্দের নৃতন সাধনা তাঁকে আরুষ্ট করেছে। তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। আশ্রম সংগঠনের কল্পনা-বৃদ্ধি সবই তাঁর। মাধবানন্দের এই কথা কটি শুনে তিনি চুপ করেই রইলেন। প্রতীক্ষা করে রইলেন চিস্তার কারণ শুনবার জন্ম। উত্তর তার পর দেবেন।

মাধবানন্দ বললেন, কালকের ঘটনার কথাই বলছি। ঘটনাটা লোকের মূথে মূথে অনেক বড় হরে ছড়িয়ে পড়বে। আমি ভাবছি আমাদের বন্দৃক এবং অক্সান্ত অস্ত্রের কথা, আমাদের লোকবলের কথা নবাবী কাছারিতে গিয়ে না পৌছয়। ওপারে কেন্দুলীর মহাস্তের গদিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করে।

আবার কয়েক মূহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, স্থানীয় লোকের কাছেও থানিকটা সন্দেহের স্থল হয়ে পড়বে আমাদের আশ্রম। কী মনে কর তুমি ?

- —অসম্ভব তো নয়ই এবং তাই সম্ভব। কিন্তু—
- --- वन ।
- —ভাতে বিচলিত হলে বা ভয় পেলে ভো চলবে না।

—না। তাচলবেনা।

কেশবানন্দ বললেন, স্থানীর লোকের সন্দেহ কেন্দুলীর মহান্তের চাঞ্চল্য বা শক্রতাও যদি হয় তাতে আমাদের বিচলিত হবার কোন হেতু নেই। ভয় শুরু নবাবের। কিন্তু স্থজাউদ্দীন যতদিন গদিতে আছে ততদিন নবাবদরবারেও পুব আশহা আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ নবাব স্থজাউদ্দিন বিলাসী এবং অলস, নিতাস্তই দেহলালকারে আবদ্ধ জীব। এই সব কারণে তিনি শান্তিপ্রিয়। তার উপর লোকার্টি কিন্তু ইিসাবী। উড়িগ্রায় নায়েব তকীথার অত্যাচারে পুরুষোন্তমের রাজা ক্রিগ্রাথ-বিগ্রহমূতি চিন্ধা হদের অপর পারে স্থাপন করবার সংকল্প করেছিল। এক বছর নিয়েও গিয়েছিল। তাতে উড়িগ্রায় তীর্থযাত্তীর অভাবে রাজস্ব কমে গিয়েছিল। নবাব স্থজা সঙ্গে তকীথাকে সরিয়ে দিয়ে কুলিথাকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন—এই ঘটনা উপলক্ষ্য করেই আমি উপঢৌকন নিয়ে মুরশিদাবাদ গিয়ে আপ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের জল্যে কিছু অন্ত রাখবার অভ্যাতি নিয়ে আসি।

— আমি আরও এক ঠাই থেকে বিরোধিতার আশহা করছি। হেতম-পুরের ফৌজদারের। হেতমপুরের ফৌজদার রাজনগরের রাজা উপাধিধারী মুসলমান নবাবের অধীন।

-জানি।

—রাঘবপুরের ব্রাহ্মণ জোতদার রাঘবরায়ের কথা শুনেছ ? রাঘবপুর থেকে সে ব্রাহ্মণ আজ নির্বাসিত। সেখানে অত্যাচারী কোশ্মর থাঁয়ের সম্ভৃতিরা বাস করছে। রাঘবানন্দকে দমন করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। হেতমপুরে গড় তৈরী হয়েছে সেই কারণে। তাদের বিরোধিতা আশহা করছি। বীরভূমের এলাকা অজয়ের ওপারে—এপারে তাদের অধিকার নেই। কিছু এত কাছে হিন্দুর মঠে শক্তির সন্ধান পেলে তারা স্বাভাবিক ভাবেই চঞ্চল হবে। হেতমপুর এখান থেকে মাত্র করেক ক্রোশ। সবচেরে বড় আশহা আমার ওখানে। ওরা পরকীয়া-তত্ত্ব, তার বিক্তি—এ সব ব্রেও ব্রুতে চার না। বরং এই তত্ত্বের উপর একটা অলোকিক রহস্ত আরোপ করে খুনী হয়। অনেকে প্রান্ধণ্ড হয়। তুমি জান না, এ দেশে অনেক

মৃসলমান আমীর গোপনে কৃষ্ণ করে বৈষ্ণবীদের কীর্তন শোনে; কাঁদেও আনেকে; মালাও জপে। তারা রাধাহীন কংসারি রুষ্ণের উপাসনা ব্রতে চাইবে না। রাজতন্ত্রের সে কাল চলে গেছে কেশবানন্দ, যে কালে প্রজার আধ্যাত্মিক কল্যাণ চরিত্রগঠন রাজা নিজের দারিছ বলে গ্রহণ করত। আজকাল প্রজা ভ্রষ্টচরিত্র আত্মিক শক্তিতে তুর্বল হলেই রাজা নিশ্চিম্ভ। বিশেষ করে রাজা এবং প্রজা যেখানে ভিন্নধর্মাবলম্বী। হিন্দুমানের মাধাভাঙা দেউলগুলো শুধু আমাদের চোখেই পড়ে না, তারাও দেখে আমাদের সঙ্গে। কছি অবতারের প্রত্যাশার কথা তো তারাও শোনে —জানে; কংসারি রুষ্ণ দেখে তাকেই কৃষ্ণি বলে ব্যাখ্যা করা বা মনে করা তো স্বাভাবিক।

কেশবানন্দ চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

- --কেশবাননা!
- —আপনি কি স্থানান্তরে যাওয়ার কথা কল্পনা করছেন ?
- —করি নি। ভাবছি। ভাবছি, প্রারম্ভেই এই বিম !
- —ভেবে দেখুন। আমি ইতিমধ্যে আরও কিছু বল সংগ্রহের চেটা করি।
 আমাদের আশ্রমকে স্থৃদ্দ করে তুলি। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।
 তামাম হিন্দুছানে বাদশা ঔরংজীবের পর সব সন্থাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ
 সাড়া জেগেছে গুরু মহারাজ। রাজেন্দর গিরি গোঁসাইকে নিজের চোথে
 আপনি দেখে এসেছেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভা'। এ ছাড়া পথ নেই
 গুরু মহারাজ।
- লপথ নেই ? প্রশ্নের স্থারে কথাটিকে আকাশলোকের দিকে উচ্চারণ করে বোধ করি উত্তরের জন্ম সেই দিকেই চেরে রইলেন। করেক মৃহুর্ত পর বললেন, না কেশবাননা। আমি স্বীকার করি নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, কিন্তু সে বল নিছক অস্ত্রবল নয়, প্রতিশোধের জন্ম তার প্রয়োগ নয়; তার প্রয়োগ অন্যারের প্রতিকারের জন্ম। তার প্রেরণা হিংসা নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, তার প্রেরণা ন্যায়বোধ। তার উৎস চরিত্রবল এবং সংযম। সয়্মাসীস্প্রালারের মধ্যে যে-সাড়া আমি দেখেছি সে-সাড়ার মধ্যে হিংসার রক্তাক্র দেখেছি, কুটিল আক্রোশের গর্জন শুনেছি। আমি তো সে পথের পথিক নই। আমার সাধনা চরিত্রের, সংযমের, সাহসের, চৈতক্তের। মাছ্যকে আমি

কল্যাণ-চৈতত্তে জাগাতে চাই। প্রতিরোধ চাই, প্রতিশোধ নর কেশবানন্দ। তাতে অকল্যাণ। মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম আমি অস্তর দিরে গ্রহণ করেছি। গেখানে কোন বিরোধ নেই।

কেশবানন্দ প্রবীণ মাহ্নয়, দীর্ঘকাল রাজকর্মে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মূখভাবের মধ্যে মনোভাব কখনও প্রকাশ পায় না। তিনি প্রশ্ন করলেন ধীর কঠে, আপনার কী অভিপ্রায় বলুন ?

- —ঠিক বুঝতে পারছি না। তেবে দেখি। আমি ভাবছি —
- —की वन्न, यिन वांधा ना थारक ?
- —বাধা থাকলে কথাটা তোমার কাছে উত্থাপন করব কেন ? গুরু হলেও আমি বরুদে তোমার চেয়ে ছোট। তোমার পরামর্শ চাই বলেই কথা উত্থাপন করেছি। আমি যদি, কেশবানন্দ, হেতমপুরের ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলি ?
- —নিজে থেকে যাবেন! রাজচরিত্রের স্বভাব হল সবই বিপরীত দিক থেকে দেখা।
- —আমার একটি অজ্হাত আছে কেশবানন্দ। অবশ্য অজ্হাত কথাটা ঠিক নয়। এ ঘটনাটা না ঘটলেও আমাকে একবার যেতে হত। কয়ো লোকটিকে দেখেছ, সে এই আশ্রমের কাছে কোথাও একটি বছম্ল্য নীলা কুড়িয়ে পেয়েছে। রজুটি সে আমার ভেবেই আমাকে দিতে এসেছিল, কিছ সে আমার নয় শুনে বললে—তা হলে সেই মোগল-বিবির হবে। হেতমপুরে এখন যে হাফেজ খাঁ—হাতেম খাঁরের সর্বাধিক প্রিয় পাত্র, পুত্রাধিক প্রিয়, সর্বেসর্বা—সেই হাফেজ খাঁ ওখানে কর্মলাভের পূর্বে প্রথম এই বনের এই দেউলে এসে উঠছিল। হয়তো নিতান্তই কর্মসন্ধানীর মত পথের মধ্যে আশ্রয় দেখে বিশ্রাম করেছিল। হয়তো বা, কেশবানন্দ, তা ছাড়াও আরও কিছুর মত—পলাতকের মত। কারণ লোকান্তর ছেড়ে এই বনে তার পরমান্তনেরী স্বীকে নিয়ে আশ্রয় নেওয়াটা ঠিক যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কয়ো বলে, এমনি রক্ম সে দেখেছিল সেই মেয়েটির আভরণের মধ্যে। আমি তারই একটা সন্ধান করতে যেতামই; তাই যাব। সেই স্ত্রে ধ্রেই কথা তুলব।

— चर्णका कक्रन महावाज। तिथून, कन की ह्य !

মাধবানন্দ বললেন, অপেকা করতে বলছ? আছো। তাই হোক। দেখি।

মাধবানন্দের আশঙ্কা অমূলক নয়। আর দিন পাঁচেক পরেই ওপার থেকে কেন্দুলীর মহাস্ত ভরত দাস সংবাদ পাঠালেন। একজন শিশ্ব এল একখানি লিপি নিরে। দেবনাগরীতে ব্রক্তভাষায় লেখা পত্র—

"কংসারি দারকাধীশ শব্ধ-চক্রধারী শ্রীক্লফের সেবক মাধবানন্দজী, তােুমার ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। মধুকুঞা-ত্রয়োদশী-স্থানপর্বে হুরু ত্তদমনে তোমরা যে বীর্ষের পরাকাষ্টা দেখাইরাছ—তাহার জন্ম দেবতা অবশুই প্রসন্ন হইরাছেন। কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হইলে অস্করেরা অপ্রসন্ন হর। দে অপ্রসমতার সংবাদ তোমাকে জানাইতেছি। ইলামবাজারের ধনী তুলা ও গালা-ওয়ালা রাধারমণ দে-সরকারের পুত্র সেদিনের সেই হান্সামার মূল —অক্র দে-সরকার তোমার উপর উপদ্রব অত্যাচারের সংকল্প করিয়াছে এবং ষড়যন্ত্র করিতেছে। কারণ ঠিক অফুমান করিতে পারিতেছি না— তবু সংবাদ সভ্য। সমুধ-সংঘর্ষে সাহসী না হইরা সে স্থানীয় বীরভূম রাজের ফৌজনার হাতেম খাঁায়ের নিকট তোমার বিরুদ্ধে অনেক শিকাইত করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে রাঘবপুরের রাঘবানন্দ রায় নামক ত্রাহ্মণের সঙ্গে অনেক হান্সামা হইয়াছিল—প্রজা-বিদ্রোহ হইয়াছিল। সে-কারণ ফৌজদারের সহজেই উৎকণ্ঠিত হওয়ার কথা। তাহার উপর নানান স্থানে তীর্থপথে 'সন্ন্যাসীদের' বারা লুঠতরাজের সংবাদ দেশময় ছড়াইরা পড়িরাছে। ভাহারা সকলেই ছন্মবেশী বর্গী নয়। স্থতরাং হাতেম থাঁ অবশ্রুই এ বিষয়ে উত্যোগী হইবে। কেবল এলাকা তাহার নয়—বর্ধমানের এলাকা বলিয়াই ইতন্তত করিতেছে। তোমার অবগতির জন্ম সব জ্ঞাত করিলাম।"

পরিশেষে পুনশ্চ লিখেছেন—"ইলামবাজার দাস-সরকারের এলাকা। বেশবানে কোন কারণেই যাওয়া সঙ্গত হইবে না।"

কেশবানন্দ বললেন, আপনি চিস্তিত হবেন না। দাদ-সরকারের ওই বক্তপৃকরের মত প্রটাকে ভয় করবার কোন হেতু নাই। বক্তপৃকরের উপদ্রব তৃণভূমিতে, কন্দজাতীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে; নদীর পলিমাটিতে; শালকাগুকে তার ওই দাঁত দিরে ফেড়ে ফেলা যায় না। আমিও এই কদিন নিশ্চিত বেসে নেই। লোক সংগ্রহ করেছি। অখও সংগ্রহ করেছি। এবং হেতমপুরের ফৌজদারের ভান হাত সেই হাফেজ খাঁ সম্পর্কেও আমি সন্ধান করছি। আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে গুরু মহারাজ, যদি তা সত্য হয়—তা হলে সে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।

মাধবানন্দ বিশ্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন কেশবানন্দের দিকে।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি সেদিন নীলার কথা বললেন। তাই থেকে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আপনি কি মথুরার ঘাটে দিল্লীর বাদশাহ-বংশের সেই উচ্ছ্রখল যুবকের কথা ভূলে গেছেন গুরু মহারাজ! হুসেন আলি—! চোখের কোলে সেই আশ্চর্য কালির দাগ।

হুসেন আলি ! স্থপুরুষ অভিজাত বংশের সস্তান—স্থলর মুখে ব্যভিচার ও উচ্ছ্ অলতার ছাপ। বড় বড় চোথ ছটির কোলে আশ্চর্য কালো দাগ! মনে পড়েছে বইকি। হঠাৎ একখানা নৌকা এসে ভিড়েছিল তাঁর বজরার গায়ে; নৌকা থেকে বজরায় উঠে বলেছিল—হিন্দু ফকির, শুনেছি তোমরা গণনা করে অনেক কিছু বলতে পার তুমি কিছু পার ? না, বুজরুক!

মাধবানন্দের চোখে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হয়েছিল। কিন্তু চতুর কেশবানন্দ তাঁকে আড়াল করে সামনে এসে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এক কালের বিজ্ঞ রাজকর্মচারী—স্থচতুর বৃদ্ধির লালা-বংশের সন্তান—অতি সহজ্ঞেই মন্তাপ হসেন আলির সঙ্গে কথা বলে তার কাছ থেকে কথা সংগ্রহ করেই তাকে উত্তর দিরে তুষ্ট করেছিলেন। মাধবানন্দ কথাটা বিশ্বত হরেছিলেন।

হুসেন আলি বলেছিল, তার প্রেয়দী বাদশাহ-বংশেরই কন্তা আমিনা ওদমান বলে এক ওমরাহপুত্রের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্ধেশ হয়েছে। হুসেন আলি তাদেরই সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। যত দূর সংবাদ পেয়েছে তাতে তারা আগ্রার দিকেই এসেছে।

চতুর কেশবানন্দ বলেছিল, আগ্রা বোধ হয় ত্যাগ করেছে তারা এতক্ষণে।
গণনা করে তৃজনের আকৃতি এবং রূপও বর্ণনা করেছিল, ঠিক মিলিয়ে
দিয়েছিল। এমন কি অলহারও। সেই প্রসালে বলেছিল, বহুমূল্য রত্ন রয়েছে
বেন। নানা বর্ণের নীলা—

লকে সক্ষে হুসেন বলেছিল, নীলা। বছমূল্য নীলা সেধানা। বাদশাহ শাহজাহান যে লব জহরতকে পেয়ার করতেন, শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কাছে রেখেছিলেন, তারই মধ্যে ছিল ওই নীলাধানা। কোনক্রমে এসেছিল আমাদের হাতে। ওই নীলাধানা আমি তাকেই দিয়েছিলাম।

কেশবানন্দ বললেন, আমার বিশ্বাস, গুরু মহারাজ, এরা তারাই। কয়ের কুড়িয়ে পাওয়া ওই নীলা বছমূল্য। বাদশাহী জহরত বলেই আমার ধারণা। গুই নীলা থেকে এবং তারা যে ভাবে এই বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল যার কৈফিয়ত একমাত্র আত্মগোপন ছাড়া কিছু হতে পারে না, এই ছই তথ্য থেকে আমার ধারণা এরা তারাই। এ কথা ঘূণাক্ষরে তার কানে তুললে সে আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে বাধ্য। আপনি কোন চিস্তা করবেন না।

— চিস্তা! না। চিস্তার আমার অবসর নেই বর্তমানে কেশবানন্দ। চৈত্ত্বের শেষ হবে কাল। বৈশাখ মাস তপস্তার মাস। সেই চিস্তাই আমার একমাত্র চিস্তা বর্তমানে।

ছাদশ রাশিতে স্থ ছাদশ মাসে অবস্থান করবেন, তাঁর সপ্তাশবাহিত রথে বারো মাসে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ করে পৃথিবী-পরিক্রমা শেষ করেন আর বিষ্ণুপ্রিয়া ধরিত্রী ছাদশ মাসে ছাদশ যাত্রায় ছাদশ উপাচারে পূজা করেন। বৈশাথে মেষ রাশিস্থ ভাস্করে প্রথরতম তাপের দিনে অগুরুচন্দনের লেপন প্রস্তুত করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ চর্চিত করেণদেয়। প্রথর উত্তাপ ! বড় ক্লেশ স্থেবে। চৈতক্তময় পরমপুরুষ শ্লিগ্ধ শাস্ত হলেই সব শ্লিগ্ধ শাস্ত।

মাধবানন্দ দেব-অঙ্গ চন্দনচর্চিত করে দিলেন। তারপর একে একে আশ্রমের সকলেই চন্দন অর্থ্য দিলেন ভগবানের ভাব-বিগ্রহের চরণে। নিজের নিজের মন্তকে ললাটে এবং বুকে চন্দন-প্রসাদের তিলক এঁকে নিলেন। এবং এর পর গোস্বামীরা একে একে বার হরে গেলেন।

এ মাসে অনেক কাজ। কাজ নর ব্রত। বৈশাথ ব্রতেরই মাস। স্বচেরে
রুড় কাজ এ মাসে জলদানের কাজ। অনেকগুলি জলসত্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন
মাধবানন্দ। এই স্থানীর্ঘ বছকোশব্যাপী অরণ্যের মধ্য দিয়ে বছকালের সড়ক

চলে গিয়েছে। এদিকে বর্ধমান থেকে, ওদিকে বছ দেশাস্থর পার হয়ে চলে গিরেছে, পঞ্চনদ পর্যস্ত। আবার রানীগঞ্জের ওখানে দামোদর পার হয়ে, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পার হয়ে চলে গিয়েছে শ্রীক্ষেত্র। স্থদীর্ঘ অরণ্যপথে ছারা স্থলভ, কিন্তু জল স্থলভ নয়। মধ্যে মধ্যে অনেক ছোট ছোট নালা-নদী এদিকে অজয়, ওদিকে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু বনের মধ্যে তাদের খুঁজে বের করা শক্ত; দুর থেকে দেখা যায় না, চলার পথে বনের আড়াল থেকে হঠাৎ সামনে পড়ে; তার উপর গ্রীম্মকালে শুকিয়ে যায়; দামোদর এবং অজয়ের নিজেদেরই অবস্থা ওই সময় উপবাস-ক্লিষ্টের মত বিশীর্ণ; বালিয়াড়ির মত ধু-ধু করে। বৈশাখ-দ্বিপ্রহরে গ্রম বাতাসে বালি ওড়ে। মধ্যে মধ্যে ত্-চারটি অতি তৃষ্ণার্ত পথিকের নদীর বালির উপর পড়ে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ করে দামোদরের গর্ভে। দামোদরের এক-কুলবর্তী স্রোতের জলের আশার তৃষ্ণার্ত পথিক বিশাল বালুময় বুকের উপর দিয়ে আসতে আসতে মাথার উপর স্থর্যের এবং পায়ের তলার বালির উত্তাপে জ্ঞান হারিরে পড়ে যায়। তার মৃত্যু হয়। কিছুক্ষণ মুখ ঘদড়ায় বালিতে, নাক-মুখ দিয়ে খানিকটা বক্ত গড়িয়ে পড়ে, তারপর শেষ হয়ে যায়। এদিকে অজয় অবশ্য এতথানি নয়, এবং অজয়ের ওপার দিয়ে যে পথ, সে-পথ এমন অরণ্যসঙ্কুলও নয় আর এ পথটির মত এমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। পশ্চিমে নগরী অর্থাৎ রাজনগর থেকে উত্তরে রাজমহল পর্যস্ত পথের योगायां चाह् वर्त, किन्न थ्वरे तभी लोकन दाँ न। जत अमिरक এক-একটা খাঁ-খাঁ করা মাঠ আছে। গ্রাম নেই, গাছ নেই, জলাশয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন প্রান্তরে পড়েও মাহুষ তৃষ্ণায় মরে। এই তুই দিকেই পার্রমের ব্যয়ে ও উছোগে জলসত্র খোলা হবে। বৈশাখে জলদান শ্রেষ্ঠ দান। প্রতি স্থানের জলসত্তে স্থানীয় কমীরাই অবশ্য প্রধান হয়ে থাকবে। সেখানকার লোক বেছে ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। ছোলা, গুড়, জলের জালা—খরচপত্র সবই আশ্রমের, তত্তাবধানও করবে আশ্রমের গোস্বামীরাই, কিন্ত হাতে-কলমে স্ব-কিছু করবার দায়িত্ব স্থানীয় লোকের। প্রতি সত্তে জন সরবরাহের জন্ম এক-একখানা গরুর গাড়ি কেনা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কর্ম গ্রহণ করেছে আশ্রম। সন্ধ্যার গোস্বামীরা গ্রামে গ্রামে গিরে

ভাগবত-কথা শুনিরে আসবেন। বলে আসবেন, "মাস্য অসত্য থেকে সত্যে চল, অসততা থেকে সততার চল, অশুদ্ধতা থেকে শুদ্ধতায় চল, আচার আর অন্ধবিশ্বাস থেকে চৈতন্তে জাগো।" এই তো সাধন। সেবা এবং ভগবদ্দির পুণ্যে চৈতন্ত্রময়ের পূজা।

মাধবানন্দ নিজে নিয়েছেন পঞ্চতপার মত ব্রত। পঞ্চতপা নয়। আশ্রমের উঠানের ঠিক মাঝখানে বড় নিমগাছটার তলার মাটি-বাঁধানো বেদীটির উপর বসে সমস্ত দিন হোমকর্মে মগ্ন থাকবেন; অর্থাৎ সারাটা দিন বাইরে থেকে স্থিকিরণকে যথাসম্ভব দেহে মনে গ্রহণ করবেন। জলগ্রহণ করবেন স্থান্তের পর।

"ওঁ বৈশাথে মাসি মেষ রাশিন্থে ভাস্করে শুক্রপক্ষে—" দিনশেষে মাধবানন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি প্রদান করছিলেন। একখানি গরুর গাড়ি এসে আশ্রেমের মধ্যে চুকল। গাড়িখানি মাটির জালা, বড় বড় মাটির কলসী, কয়েকটা বস্তা প্রভৃতি জলসত্ত্রের সরঞ্জামে বোঝাই। কোন স্থানের জলসত্ত্রের গাড়ি ফিরে এল; সঙ্গে একজন তরুণ সন্ন্যাসী আর একজন সন্ন্যাসী, সে ওই গোপালানন্দের দলভুক্ত।

কেশবানন্দ প্রশ্ন করলেন, এ কী, তুমি ফিরে এলে যে গাড়ি নিয়ে?

গাড়িগুলির ফেরার কথা নয়, সয়্ল্যাসীদেরও নয়, যে গ্রামে জলসত্ত দেওয়া হরেছে সেই গ্রামেই তাদের বৈশাখী সংক্রান্তি পর্যন্ত থাকবার কথা।

মাধবানন্দ বারেকের জন্ম সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে আবার আপন কর্মে মন দিলেন। আপন অজ্ঞাতসারেই বোধ করি জ্র তৃটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

- —একটা হাসামার জন্ম ফিরে আসতে হল গোস্বামী মহারাজ।
- —হাকামা ? কী হাকামা ?
- স্থামাদের জলসত্তে কেউ জল থাবে না মহারাজ। কাউকে খেতেও দেবে না। স্থামরা 'রাধা'কে বর্জন করেছি। গোটা গ্রামটাই স্থামাদের উপর বিরূপ হরে উঠল মহারাজ।
 - —কই, এ পর্যস্ত তো ঘুণাক্ষরে এ কথার **আভাস** পাই নি !

- —হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল, তা থেকেই এমন হবে গেল মহারাজ।
- -- हंठा९ की घंटेन ?

—এক বৈষ্ণবী, মহারাজ, যে বৈষ্ণবী তার মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছিল, নদীর চরের উপর গুরু মহারাজ যাদের বর্গীদের হাত থেকে বাচিয়েছিলেন সেই বৈফবী—সে কোথায় যাচ্ছিল। পথে তৃফার্ড হয়ে এসে দাড়াল আমাদের জলসত্তে জলপানের জন্ম, অঞ্চলিও পাতলে কিছু হঠাৎ कनभान कदाल शिरा अक्षनित जन काल किरा है के माहिएय वनल-ना। ना। ना। এ जल नव-এ व्याखन, এ विष। এ विष। यात्रा त्राधात्र मधा পাপ দেখে. যারা গোবিনের পাশ থেকে রাধাকে বর্জন করেছে, তাদের জল-मृत्वित्र खन विष, जाखन। मर्वनाम इत्व, हेह्रानिक यात्व, भत्रानाक यात्व, যে এ জলসত্তের জল পান করবে। হঠাৎ যেন উন্নাদ হরে গেল সে। চোধ ঘুটি মেয়েটির বড়। সেই বড় বড় চোধ যেন আগুনের মত জলতে লাগল। চিৎকার করতে লাগল-রাধার প্রেমে কলুষ! হা-হা-হো-রে! ক্রমে লোক জ্বমে গেল। তারপর লোকজনেরা বিরূপ হয়ে উঠল, তারা কেউ কেউ আমাদের সব-কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে চাইলে। হুটো জালা ভেঙেও গেছে। তারপর আরম্ভ হল নামগান। তারা নাম-গান করতে করতে চলে গেল। আমরা চলে আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছি। মেরেটি কিছু সাধারণ নর মহারাজ। অনুর্গল তার চোথে ধারা वरेष्टिन। लात्क वनल, तम नाकि मिक्तारे-भाख्या विकरी; अत्मन आथड़ान পাটই সিদ্ধাইয়ের পাট।

কেশবানন বললেন, চলে এসেছ ভাল করেছ। বিশ্রাম কর।

মাধবানন্দ ধীরে ধীরে উঠে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সিদ্ধাই ? কফদাসীর মুখখানা মনে পড়ল; তার বেশভ্ষা মনে পড়ল। তার সিদ্ধাই ? সে-সিদ্ধাই কোন সিদ্ধাই ?

কেশবানন্দ মন্দিরে প্রবেশ করলেন, বললেন, চিস্তিত হবেন না গুরু মহারাজ। কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় হবে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কালই স্পুরের আনন্দর্চাদ গোস্বামীর কাছে যাব।

স্পুরের আনন্দর্চাদ গোস্বামী এক তরুণ বৈষ্ণব সাধক। মাধবানন্দ তাঁর

নাম শুনেছেন। এখানকার বৈষ্ণব সম্প্রাদায়ের মাথার মণি। তিনি না_{কি} অলোকিক অনেক-কিছু করতে পারেন।

কেশবানন্দ বললেন, আনন্দটাদ গোস্বামী, আমি যা শুনেছি তাতে যে সাধনাই তাঁর থাক্ তিনি বিষয়াসক্ত। ঘোরতর বিষয়াসক্ত। এ অঞ্চলের উত্তরাধিকারীহীন বৈষ্ণবদের মৃত্যু হলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তিনি। দক্ষিণা নিয়ে পাপীর পাপমোক্ষণ করে দেন। তাঁর বিগ্রহসেবা আছে, তাঁর বিগ্রহের জন্ম কিছু অলঙ্কার নিয়ে যাব আমি।

মাধবাননদ নীরবে বিগ্রহের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। করেক মুহুর্ত পর ঘাড় নেড়ে বললেন, না। এমনি যেতে পার। অলঙ্কার নিরে নর।

-- গুরু মহারাজ !

বাইরে থেকে ডাকলে শ্রামানন্দ, তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠ। তুইই রনরন করছে।

- —কী ? কেশবানন্দ বাইরে গেলেন।
- আরও পাঁচখানা গ্রাম থেকে লোক ফিরে আসছে গুরু মহারাজ। এখানে তারা গাড়ি গরু সব কেড়ে নিয়েছে। আমাদের সেবকদের মারপিট করেছে। সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। স্থথবাজারে আমাদের সেবক যাদবানন্দের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তার অবস্থা ভাল নর।

কেশবানন্দ কঠিন হয়ে উঠলেন, বিশ্বিতও হলেন—একটা সামান্ত স্ত্রীলোকের এত প্রভাব! সিদ্ধাই! সিদ্ধাই তিনি জ্ঞানেন। দীর্ঘকাল রাজকর্মে অতিবাহিত করেছেন, এ সব অনেক ঘেঁটেছেন। জ্ঞানেন তিনি। উয়ত্তের মত চিংকার কর, হাস, কাঁদ, ধুলোয় গড়াগড়ি দাও, যা খুশি তাই বল—তথু জ্ঞার করে বল, চিংকার করে বল, অপর সকলের কণ্ঠস্বরকে চুপ করিয়ে দেবার মত জ্ঞার দিয়ে বল। তৎক্ষণাৎ লোকে তোমার কথা অলৌকিক বলে মেনে নেবে। সিদ্ধপুরুষ বলে খ্যাতি রটবে। কঠিন অথচ শাস্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, কে লোক এসেছে? কোথায় সে?

বিশ্বিত হলেন কেশবানন্দ।

এসব গ্রামে ওই বৈষ্ণবী কিছু করে নি। করেছে অশু লোক—ইলামবাজারের তুলোর গদির মালিক রমণ দাস-সরকারের বর্বর পুত্র, যে সেদিন
কেন্দুলিতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বা সন্ন্যাসীর ছন্মবেশী বর্গীদের সঙ্গে হাজামা
বাধিয়েছিল, যার নাকটা তাবা ভেঙে দিরে গেছে, সেই অক্রুর সরকার।
এবং বিশ্বয়ের কথাটা হল এই যে, এই বৈষ্ণবীই অক্রুর সরকারের কার্যকলাপে
বাধা দিয়েছে। "স্তিরাশ্চরিত্রম্—দেবা ন জানস্তি কুতো মহন্সাং!" যে বৈষ্ণবী
চিৎকার করে লোককে এই রাধা-বর্জনকারী আশ্রমের জলসত্রকে বিষ বলে
জল থেতে বারণ করলে, লোকজনকে জড়ো করে রাধানাম কীর্তন করে সারা
অঞ্চলে মাতন তুললে, সে-ই অক্রুর সরকারের অত্যাচারের স্থানে এসে
চিৎকার করে বললে—মহাপাপ। মহাপাপ হবে। বললে—ওই যে বর্বর
পিশাচের মত চেহারা ওই যে সরকার, ও সাক্ষাৎ পাপ। সাক্ষাৎ অধর্ম।
ওর কথায় তোমরা সন্ন্যাসীর গারে হাত তুলো না। জ্বলে যাবে সব, পুড়ে
বাবে সব, মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যাবে সব। আমি বলছি। আমি দিব্য
চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

এ তো বিচিত্র ব্যাপার!

জ্ঞ ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠল কেশবানন্দের। কী ? ঘটনাটার মর্মস্থলের সত্য তা হলে কী ?

মাৰ্শবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, চৈত্র-সংক্রাপ্তিতে সংক্রম করে জলসত্তের ব্রত গ্রহণ করেছি, সে তো ভঙ্গ করতে পারব না। এদিকে আমি ব্রত করেছি। প্রথম দিনের হোম হয়ে গেছে। আমি নিজেও তো ব্রত ছেড়ে যেতে পারব না। তোমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির কর—কী করা হবে! সংঘর্ষ আমি চাই না। কিন্তু সংঘর্ষের ভরে পশ্চাৎপদ হওয়ার অর্থ—পরাজর। ব্রতভক্ষের পরাজয় আর মৃত্যুতে পার্থক্য কোথার ?

কেশবানন্দ বললেন, কাল ভোরবেলা আবার এদের পাঠাব গুরু মহারাজ। অবশ্য ওই গ্রামগুলিতে নয়—অহা গ্রামে। এবং ওপারে নয়—এপারে।
শহর রানীগঞ্জ পর্যন্ত বাদশাহী সড়কের তুই পাশে এই জন্মলের পর মরুভূমির মত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে জলাভাবে পথিকের মৃত্যু ঘটে। ওদের সেই দিকে পাঠাব। আমরা হাত বাড়িরে হাত গুটিয়ে নিচ্ছিনা গুরুজী। আমরা এ দিকে যে হাতটা বাড়িয়েছিলাম, সেটা অন্ত দিকে বাড়াচ্ছি।

একটু চূপ করে থেকে বললেন, বর্বর অক্রুর সরকার এবং তার বাবা দাস-সরকারের সন্দে—হেতমপুরের বৃদ্ধ ফৌজদারের সম্পর্কটা সত্যই নিবিড়। হওয়াই স্বাভাবিক। দাস-সরকার নিজের স্বার্থের জন্ম স্বজাতি-জ্ঞাতি-আত্মীর-ধর্ম সমস্ত-কিছুকেই বিপন্ন করতে দ্বিধা করে না। প্রাহ্মণ রাঘব রায়ের বিল্লোহ দমনের সমন্ন দাস-সরকার অনেক সাহায্য করেছে হাতেম থাঁকে। হাতেম খাঁরের কাছে তারা আমাদের সম্পর্কে সংবাদও পাঠিরেছে। সে সংবাদও আমি পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে সেবকদের ওপারে পাঠানোর অর্থ—

- -প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ! ব্রক্তপাত !
- —আমাদের তো রক্তপাতের অধিকার আপনি দেন নি। রক্ত আমাদের দিতে হবে। জীবনও যেতে পারে।
 - -কংসারির সেবকেরা কি ভীত কেশবাননা ?
- —ভীত নয়। কিন্তু কুরুক্কেত্রের যুদ্ধে মহাবীর কর্ণ যথন ভীষণ নাগান্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, তথন কংসারি—কপিধ্বজের অশ্বগুলিকে নতজান্ত করে, রুপটিকে অবনত করেছিলেন—কর্ণের লক্ষ্যরেখার নীচে নেমে গিরেছিল অর্জুনের মন্তক। ফলে অর্জুনের শিরপ্রাণই কাটা গিয়েছিল, অর্জুন ছিলেন অক্ষত। তাতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কলন্ধও স্পর্শ করে নাই। আপনি এতে আপত্তি করবেন না।

অনেকক্ষণ হুদ্ধ থেকে মাধবানন্দ বললেন, তোমার কল্যাণ হোক কেশবানন্দ। আজ তোমার কথায় এক মহাসত্যকে আমি উপলব্ধি কর্লাম।

- —কী গুরু মহারাজ ?
- —কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি হয়, কার্যোদ্ধার হয়—কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না।
 কৌশলের জন্মদাত্তী বৃদ্ধি—তারই মধ্যে কোথায় যেন অদৃশুভাবে অবস্থান
 করছে—মিথ্যা। জীবনে যুদ্ধে হোক, সন্ধিতে হোক, বন্ধুদ্ধে হোক, যেথানে
 বৃদ্ধিকে সর্বস্থ করবে, সেইখানেই মিথ্যা এসে রন্ধুপথে শনির মত প্রবেশ

করবে। কৌশলে সত্যরক্ষার অধিকার কারও নেই। অবতারেরও নেই। না, নেই। তার জন্ম অবতারকেও মাশুল দিতে হয়। তাতেও জের মেটে না, কাল থেকে কালাস্করে চলে দৃষিত জলধারার মত।

ধীরপদক্ষেপে তিনি মন্দিরে গিরে প্রবেশ করলেন।

কেশবানন্দ একটু হাসলেন; গুরুকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করেন। কিছ তিনি বয়সে নবীন। তিনি তো জানেন না এই হৃদর এই মানবহৃদয়,—সে কত ছলনা করে!

অন্তম পরিচেছদ

আরও কিছুদিন পর। আধাত মাস। রথযাত্তার দিন।

আশ্রমে বিশেষ আয়োজন। ভগবান বিষ্ণুর দাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা রথযাত্রা। মাধবানন্দের ইচ্ছা ছিল অনেক—বড় রথ তৈরি করে সেই রখে কংসারি কৃষ্ণকে চড়িয়ে অজয়ের বল্লারোধী প্রশন্ত বাঁধটির উপর রথযাত্রার অষ্ণুষ্ঠান করেন। শুরু হোক মায়ুষের জীবনে নবীন যাত্রা;
কিন্তু এতথানি করতে পারেন নি। হেতমপুরের ফৌজদার হাতেম খায়ের বিরোধিতার উত্তোগের আভাস পেয়েছেন। ফৌজদার সন্দেহ করেছেন।
হাতেম খাঁ সন্দিশ্ধ প্রকৃতির লোক। তার উপর ইলামবাজারের দাস-সরকার তাঁর সন্দেহকে উগ্র করে তুলেছে। বিশেষ করে তার সেই বর্বর পুত্রটা।
তার সঙ্গে আছে সেই বৈষ্ণবীর বিচিত্র ব্যবহার। সেটাও স্থানীয় লোকের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নি।

হাতেম থাঁ রাঘবানন রায়ের বিদ্রোহ দমন করার পর থেকে অত্যন্ত ধর্মছেবাঁ হয়ে উঠেছে। রাজনগরের রাজা বাদিওজ্জমান থাঁ ভাল লোক কিছা নিজের ফৌজদার এবং ভিয়ধর্মাবলম্বী প্রজাতে অনেক প্রভেদ। বিচারে ভ্ল হয়। ভ্ল না-হলেও প্রতিকারে অনেক বাধা। এই তো স্থজাউদ্দিনের মত ধর্মে গোঁড়ামিহীন নবাব উড়িয়ায় জগয়াথক্ষেত্রের উপর তকী থাঁর জ্লুমের কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। তকী থাঁ অবশ্য স্থজাউদ্দিনের পুত্র, কিছা পুত্র না-হয়ে অন্ত কেউ হলেও সম্ভবপর হত না। তকী থাঁর জ্লুমের জন্ম পুত্র না-হয়ে অন্ত কেউ হলেও সভ্রবপর হত না। তকী থাঁর জ্লুমের জন্ম পুক্রমোন্তমের রাজা জগয়াথদেবের বিগ্রহ নিয়ে চিছা ছদের অপর পারে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে তকী থাঁর

অকালমৃত্যু ঘটায় প্রতিকার সম্ভবপর হল। স্থাউদ্দিনের বিতীয় জামাতা ঢাকা থেকে উড়িয়ায় নারেব-নাজিম হয়ে গিয়ে পুরুষোত্তমের রাজার সদ্দেরখার্বার্তা বলে জগল্লাথদেবকে পুরীতেই রেখেছেন। সেটুকু নারেব-নাজিমের ধর্মের উদারতার জন্মই শুধু নয়—জগলাথদেব চিন্ধার অপর পারে গেলে যাত্রীর অভাবে উড়িয়ার সমৃদ্ধির হানি ঘটত, নবাবী রাজন্মে ঘাটতি হত; নৃতন নারেব-নাজিমের বিষয়বৃদ্ধি তীক্ষ। মূল কারণ সেইটাই। অনেক বিবেচনা করে মাধবানন্দ আশ্রমের পর্বপার্বণের সমারোহ—আশ্রমের প্রসার-চেন্তাকে সংযত করেছেন। বিশেষ করে সমারোহের দিকটা। সমারোহের ধনি বর্ণছেটা এসব বড় উচ্চ। এগুলি লোককে শুধু মৃদ্ধই করে না; ক্রেবিশেষে শন্ধিত করে, ঈর্বান্বিত করে। তবুও যাত্রী কম হয় নি। প্রায় হাজারখানেক লোক সমবেত হয়েছিল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রথের দিন বর্ষণটা এ-দেশে প্রবাদ-সম্মত। বৃষ্টি
না-কি হতেই হয়। প্রবল হোক বা না-হোক ছ্-এক পসলা হবেই। তবৃপ্ত
এসেছে লোকজন ভিড় করে। রথে ভগবানকে দেখবে। মহাপুণ্য হবে।
প্রসাদ পাবে। উৎসব সমারোহ বাহ্যভাগু ধ্বজা পতাকা এসব বেশী না
করলেও মাধবানন্দ অন্নমহোৎসবের দিকটা এতটুকু খর্ব করেন নি। দেশে
মন প্রচুর। কিছুদিন আগেও টাকার আট মণ চাল ছিল। এখনও টাকার
গাত মণ। কিছু তবৃপ্ত অন্নাভাব আছে। উদয়ান্ত পরিশ্রেম করে পাঁচ গণ্ডা
কড়ি অর্থাৎ একটা পরসা উপার্জন করাও অত্যন্ত কঠিন। কিছুদিন আগেই
ম্বনিদাবাদে এক বেগম পথে ভিক্কুকদের দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, হতভাগ্যেরা
কি ছবেলা পেটপুরে পোলাও খেতেও পার না? নবাব বলেছিলেন, না।
মধ্যে উপবাসও করতে হয়।

সম্ভবত বেগম বিশ্বরে হতবাক হয়ে স্থামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। উত্তরে বাধ করি নবাব নিজের কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, সবই নসীব বিশ্বসাহেবা। নসীবে না থাকলে জুটবে কী করে ?

বেলা তুপহরের পর রথ চলল। তারপর আরস্ত হল অন্ধ-মহোৎসব।

রিধিনি দিয়ে বসে গেল প্রসাদপ্রার্থী অন্নভিক্ষ্র দল। বড় সমারোহ।

পট পুরে অন্ধ, কাঁচাকলাইরের ডাল, তুটো ব্যশ্বন, অম্বল, তার উপর গুড়ের

শাষেদ এবং গুড়ের মণ্ডা। হরি হরি বোল। হরিধবনি আকাশ স্পর্শ করছে। ওদিকে সংকীর্তন চলেছে। রাত্রি নামল। মশাল জ্বেলে দেওয়া হল। তথনও দরিত্র-ভগবানের ভোগ চলছে।

মাধবানন্দ পরিপ্রান্ত শরীরে আপ্রমের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অন্ধকারের মধ্য থেকে কে ডাকলে, প্রভূ !

一(7

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল করে। বৈরাগী।

- —কয়ো! **আ**শ্রমে কে রয়েছ?
- এসে দাঁড়াল একজন তরুণ শিষ্য। —গুরু মহারাজ !
- —একে ছটি কপর্দক দিয়ো। তোমার ভোজন হয়েছে করো?
- —পেট ভরে গোঁদাই। একদিন বলেছিলাম, এ আপনারা গরাক্ষেত্র করেছ, এখানের অন্ন দেখি পিগু। আজ পরমান্ন মণ্ডা খেরে পেট বোঝাই করেছি।
 - —ভনে খুব খুনী হলাম। তোমার মধ্যে প্রচ্ছন্ত দামোদর আছেন কয়ো।
- —না প্রভু, কয়ে এঁটোকাঁটায় তুই। দামোদরের মত গেরাম বসতি জাের করে পেটে পুরতে পারে না। কয়ে অজয়ও নয়। কয়ে নেহাত মাঠের নালা। গাঁ-ধােয়া জলেই ভরে যায়।

হাসলেন মাধবানন।

করো বললে, একটা কথা বলব বলে দাঁড়িরে আছি গোঁসাই। নইলে এতক্ষণ করো চলে যেত। খাওয়া হলে কয়ো দাঁড়ায় না।

- —কথা ? ও! সেই পাথরটি কার সন্ধান পেয়েছ বুঝি ?
- —না গোঁসাই।
- —তবে ?
- —ছলনা করোনা গোঁসাই, তুমি তো সিদ্ধপুরুষ। আমার কথা তু^{মি} জাননা, এই কী হয় ?
- —না করো, আমি সিদ্ধপুরুষ নই। লোকের মনের কথা কেউ জানতে ১২২

পারে কি না জানি না। তবে শুনেছি না কি পারে। আমি পারি না। দিম্বপুরুষেরা যা যা পারেন বলে শুনেছ তার কিছুই আমি পারি না।

- —তবে মা-জী পাগল হল কেনে গোঁসাই ?
- —কে? মা-জীকে?
- —কেন্ত্রদাসী বৈষ্ণবী। ইলেমবাজারে আমাদের সম্প্রদারের মা-জী। সেদিন মধুরুঞ্চা-তেরোদশীর দিন সেই গোঁসাই-সাজা বরগীর দল যারা মা-বেটাকে ধরতে গিয়েছিল—

এক মূহুর্তেই সব শ্বতিপথে উদিত হল। একটি দৃশ্রপটের মতই ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে। সঙ্গে শ্রুতিও যোগ হল। শ্বরণে এসে গেল। এই মেয়েই তো বৈশাথ মাসে জলসত্ত্বের সময় তৃষ্ণার জল উপেক্ষা করে চিৎকার করেছে, রাধাকে যারা কলঙ্কিনী বলে শ্রামের পাশ থেকে নির্বাসন দিয়েছে, থেয়ো না—তাদের জল কেউ থেয়ো না। আবার ওই বৈষ্ণবীই নাকি অগুত্র তাঁর আশ্রেমের সেবকদের রক্ষা করেছে ইলামবাজ্ঞারের বর্বর ধনীপুত্র অক্রের অক্রচরদের আক্রমণের হাত থেকে। চিৎকার করে বলেছে, তা হলে সর্বনাশ হবে। জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এ চাকলা। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। থবরদার! থবরদার!

সে পাগল হয়ে গেছে ? পরস্পর-বিরোধী আচরণ এবং উজি থেকে সেই সত্যই প্রকাশ পাছে নিঃসন্দেহে; কিন্ধ কয়ে। তাঁকে দারী করে কেন ? মা এবং মেরেকে তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে। তাদের তিনি বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করে সয়য়ে নৌকায়োগে ইলামবাজারে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। অকরণা বা ক্রোধ, এ তো তাঁর মনের মধ্যে উদর হওরার কথা স্মরণ করতে পারছেন না!

জকুঞ্চিত করে মাধবানন্দ বললেন, এ সব ভূল কয়ে। মেয়েটি পাগল হয়ে গয়ে থাকলে ব্যাধিতে হয়েছে। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এমন কোন মহিমাও আমার নেই, যাতে আমার কোধে কোভে কারও কোন অনিষ্ট হয়!

- किन्न श्राह एवं श्रीमारे। स्माहिनी वन एक आत कां पह ।
- —মোহিনী কে? সেই কিশোরী মেয়েটি?

—ইয়া গোঁসাই। কেইদাসীও বলছে—ওরে, আমি ক্যানে গিরেছিলাম রে! মণির ছটা দেপে, বিষধরের কথা ভূলে ক্যানে হাত বাড়িয়েছিলাম। আলে গেল। বিষে আমি জলে গেলাম। আমি বারণ করেছিলাম গোঁসাই। তেরোদশীর দিন যথন ওপার থেকে এখানে আসে—মালা নিয়ে ফুল নিয়ে ভেট নিয়ে, তথুনিই আমি বারণ করেছিলাম। আমিই বলেছিলাম—আমিই বলেছিলাম গোঁসাই, মণির লোভে ফণির গর্তে হাত বাড়িয়ো না মা-জী। মা-জী বলেছিল—ওরে ক্যো, সে ফণি হলে আমিও ফণিধকনী। আমার মোহিনী মস্তর আছে। গোঁসাই, সে ওই মেয়ে মোহিনীকে তোমার পায়ে পুজো দিতে এসেছিল, ভোলাতে এসেছিল।

স্থির দৃষ্টিতে করোর দিকে তাকিরে রইলেন মাধবাননা। এ মেরেটির মনের কথা তিনি না-জানলেও এদের এ চরিত্রের কথা তো তাঁর অজ্ঞানা নয়, এবং ক্লফ্ডদাসীকে দেখে সেইদিনই তাঁর নিজের বাল্যস্থৃতির একটি ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়েছিল।

দৃষ্টি দেখে ভয় পেল কয়ো। সভয়ে মিনতি করে বললে, আমার উপর বাগ করছ গোঁসাই ?

- না। কিন্তু এ সব কথা আমি ভনে কী করব? কেন বলছ?
- —তোমার করুণার জন্মে গোঁসাই। তোমার মনের অজাস্তে তোমার রাগ—
 - --বাগ আমি করি নি।
 - —মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে গোঁসাই। ওই পাষ্ও অক্র—
 কানে আঙুল দিয়ে মাধ্বানন্দ চলে গেলেন।

কয়ো কিছুক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশাস ফেলে শ্বাপন মনেই বললে, বরাত। সবই বরাত।

—নাও। ধর। একজন সন্ন্যাসী এসে সামনে দাঁড়ালেন—কপর্দক!

করে। কপর্দক ছটি নিয়ে গামছার খুঁটে বাঁধছিল। বাঁধছিল আর ভাবছিল, সংসারে কপর্দক এক ফ্যাসাদ। লোকের কাছে কড়ি ছুর্লভ সামগ্রী। কপর্দক তো সত্যকারের ধনসম্পদ। এ 'সে রাধ্বে কোথার? মা-জী ভাল থাকলে—

- —দাড়াও করো।
- —গোঁসাই!
- —হা। তুমি এটি নিরে যাও। সেই নীলাট।
- —লোকে জানলে যে আমার গলা কেটে দেবে গোঁসাই। আমি রাখব কোথা?
- -—এক কাজ কর। এটি নিয়ে তুমি হেতমপুরে হাফেজ থাঁয়ের সঙ্গে দেখা কর। এ রত্নটি যদি তাঁদের হয় তবে পেলে খুব খুনী হবেন। তথন যদি তুমি ওই মেয়েটিকে বর্বর অক্রুরের হাত থেকে বাঁচাবার জ্ঞান্তে সাহায্য চাও তবে নিশ্চয় পাবে। যদি তাঁদের নাও হয় কয়েয়, তা হলেও এটি নজরানা দিয়ে সাহায্য চাইলেও পাবে।

নীলাটি কয়ের হাতে দিরে মাধবানন্দ নি:শব্দে গিয়ে আশ্রম-কক্ষে প্রবেশ করলেন। কয়ে অগত্যা ফিরল। হতভাগিনী মা-জী। মা-জীর পরিত্তাণের আর কোনও উপার নেই। হার মা-জী! সারা জীবনটাই তুমি অপচয় করলে! সারাজীবন! ভগবানের কম দয়া তো তোমার উপর ছিল না! তোমার শ্রন্থর প্রেমদাসের এত বড় সিদ্ধপাটের মহিমা—তুমি পেয়েছ। সিদ্ধি তোমার হাতের মুঠোয় ছিল। সে ফেলে দিরে তুমি—! আঃ, সহশক্তি তোমার একেবারে নাই! দেবতা গোঁসাই মান না তুমি!

সেদিন অর্থাৎ ওই সন্ন্যাসীদের হাঙ্গামার দিন মাধবানন্দ ওদের মা-মেরেকে নৌকা করে ইলামবাজার পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। নৌকায় সারাটাক্ষণ কেইদাসী যেন পাথরের মত বসে ছিল। মোহিনী মায়ের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি দেখে বার কয়েকই মৃত্ত্বরে মাকে ভেকেছিল, মা—মা!
মা গো! কিন্তু কেইদাসী উত্তর দেয় নি; পলকও পড়ে নি তার চোখে।

ইলামবাজারের ঘাটে নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে যেন প্রথম তার সচেতনতা ফিরেছিল। চোথে একটা আগুনের ঝলক যেন দপ করে জলে উঠল। ঘাটে নেমে অজরের ওপারের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে নিমন্তরে বললে, আমরা এত পাপী ? এমন অচ্ছুত ? তোমার পা ছুলৈ তোমার শরীরে জালা ধরত ? তোমার পায়ের রঙ কালো হরে যেত ? তোমার পুণাের এত অহ্বার ? তুমি রাজার ছেলে, তুমি পুণ্যাত্মা আর আমরা ভিধারী বৈরেগী বাউল বটুম বলে—

মোহিনী ভর পাচ্ছিল গোড়া থেকেই। আর সে সহু করতে পারে নি, সভরে সে মারের হাত ধরে তাকে ডেকেছিল, মা, মা গো! হাত ধরে তাকে নাড়া দিরেছিল।

এবার চকিত হরে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনেছিল এবং খপ করে মেয়ের হাত ধরে বলেছিল, আর তুই ?

তারপরই তাকে প্রায় টানতে টানতে পথ চলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ বলেছিল, কচি খুকী! তুইও কচি খুকী।

মোহিনী সভয়ে বলেছিল, আমি কী করলাম ?

- —ক্যানে তু মালা নিতে হাত বাড়িয়েছিলি ?
- —আমি মনে করলাম আমাকে দেবে গোঁসাই।
- চোথ হুটো জ্বলজ্ব করছিল ক্যানে তোর ? নৌকোয় ক্যানে এমন করে তাকিয়ে কাঁদছিলি ? আমি ভাবতাম, মেয়ে আমার সত্যিই কচি খুকী। ভাবতাম, হাবাগোবা। তুমি খুব সেয়ানা!

কুৎসিত কথা বলতে শুরু করেছিল কেষ্ট্রদাসী। মোহিনী বিবর্ণ মুখে বলেছিল, মা গো, ওসব বলিস না মা গো। তোর পায়ে পড়ি গো।

তবুও ক্রোধের শান্তি হয় নি কেটদাসীর।—জানি, ওই রাজার ছেলে ভণ্ড গোঁসাইদেরও আমি জানি। আমি তো কিশোরী নই। আমি তো কুঁড়ি নই। তাই আমি অভ্ত। আর চাঁপার কলির দিকে চাউনি, সে চাউনিতে—

কুৎসিত উপমা দিয়ে কথা শেষ করলে সে। তারপর আবার বললে, এই পুরিমেতেই তোমাকে অক্রুর চণ্ডালের আটিচালার উচ্ছুগু করব আমি।

এবার কেঁদে উঠল মোহিনী।—মা গো! না গো, না—না—; আমি মরে বাব গো! আমি মরে বাব।

সন্ধ্যার পর কেষ্টদাসী কয়োকে সঙ্গে নিরে নিজেই গিরেছিল রমণ সন্ধকারের বাড়ি। অক্র রকে দেখবার অছিলা করে তার কাছে প্রতিশ্রুতি নিতে গিরেছিল। ভিতরটা তার অপমানে ক্ষোভে অলে যাছিল যে।
এত বড় আঘাত সে জীবনে পার নি। এমন কি, তাদের সমাজের উপর
প্রতিপত্তি নিরে, যার সঙ্গে তার শশুরের মৃত্যুর পর থেকে ছোটথাটো
কত ঝগড়া হরে গেল, সেই স্পুরের আনন্দটাদ ঠাকুরের কাছেও পার নি।
আনন্দটাদ ঠাকুরও ব্রন্ধচারী। বৈষ্ণবী শক্তি নিয়ে ভঙ্গনপূজন সেও করে না।
কিছু বৈষ্ণবী বলে ঘেরাও করে না। ঠাকুরের সাধন দৃতীভাবের সাধনা।
সে বৃন্দার মত স্নেহ করে শ্রন্ধা করে বৈষ্ণবীদের। ঠাকুরও মহংবংশের
ছেলে। আজ নিজে সে রাজাবিশেষ লোক। তার বাড়িতেও যুগল-বিগ্রহ
আছে। শিশ্বসেবকের সংখ্যা নেই। ঠাকুর সিদ্ধাইও পেয়েছে।

খুস্টিকুরির পীরত্ল্য সিদ্ধপুরুষ হজরং হোসেন সাহেব একবার আনন্দ ঠাকুরের শক্তি পরীক্ষার জন্ত বাঘের পিঠে চড়ে দেখা করতে এসেছিলেন। দক্ষে উপঢৌকন এনেছিলেন সোনার থালায় হ্রন্দর থাঞিপোশে ঢেকে হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস। আনন্দ ঠাকুর তথন একটা ভাঙা পাঁচিলের উপর বসে কাজকর্ম শেষছিলেন। হজরং বাঘের পিঠে হুপুরের প্রাস্তে উপন্থিত হতেই ঠাকুর পাঁচিলকে বললেন, চল। পাঁচিল চলতে লাগল, এসে হাজির হল গ্রামে চুকবার প্রবেশপথে। হজরং অবাক হলেন। তাঁর আর সাহস হচ্ছিল না হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস উপঢৌকন দিতে। কিন্তু ঠাকুর বললেন, ও কী হজরং, আমার জন্তে এমন সমাদর করে উপঢৌকন এনে আমাকে না দিরে আপনি শৃক্ছেন? না না না, দিন, দিন।—বলে থালাখানি প্রান্ধ কেড়ে নিয়ে থাঞ্চিপোশ খুলে ফেললেন। সে অবাক কথা, সাধারণ মান্তব ছার, হজরং সাহেবই অবাক হরে দেখলেন—থালার মাংস কোথায়! মাংস নেই; তার পরিবর্তে ররেছে সন্থ-ফোটা একরাশি লাল পদ্ম পুশা; তার গদ্ধে চারিপাশে মৌমাছি উড়ছে।

এমন আনন্দ ঠাকুরের কাছে নবীন গোঁসাই তুমি? তোমার এত অহংকার? কেইদাসীও সিদ্ধপাটের অধিকারিণী, তার ছকুমে পাঁচিল না চলুক, বাঘ তার বশ না মাহুক, ইচ্ছে করলে সে বাঘিনী হতে পারে, কালনাগিনী হতে পারে। নবীন গোঁসাই, তুমি কালনাগিনীর মাথার পা দিয়েছ। লখাইরের রূপ দেখে বিমোহিত হয়েও কালনাগিনী লাখি থেয়ে

আক্ষেপ করে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে দংশন করেছিল, কেইদাসীও ঠিক তাই বলে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে তোমাকে দংশাবে।

সাক্ষী থেকো চক্স-সূর্য।

পা ভেঙে অক্র বিছানায় শুয়ে যাঁড়ের মত চিৎকার করছিল। সত্যই যাঁড়ের মত; কণ্ঠস্বরে তার মাস্থবের মাধুর্যের চেয়ে জন্তুর, বিশেষ করে যাঁড়-মহিষের, কর্কশতাই বেশী। যন্ত্রণার অভিব্যক্তির সঙ্গে তথনও অকারণ কোখের প্রকাশ সমানে চলেছে। অকারণে এই কারণে যে ক্রোধের যার। লক্ষ্য তারা তথন বহুদ্বে, ছল্মবেশী বর্গী সন্ত্র্যাসীরা তথন অস্তুত বনে বনে দশ-বারো ক্রোশ পথ নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে চলে গেছে। বিছানার পড়ে অক্রুর তাদেরই ক্রুদ্ধ কঠে কুৎসিত ভাষার গালিগালাজ করে চলেছে।

কেইদাসীকে দেখে সে থানিকটা শান্ত হল। মোহিনীর মা তাকে দেখতে এসেছে! তার উপর কেইদাসীর বিরূপতা সে জানে। সেই কেইদাসী আজ সদয় হয়ে দেখতে এসেছে এ কি কম কথা! কুংসিত হু পাটি দম্ভ বিস্তার করে অক্রুর বললে, মা-জী, এস।

তারপরেই সে আর একদফা চিৎকার করে উঠল। যাত্রাদলের ভীমের মত ক্রদ্ধ চিৎকারে বলে উঠল, এবার পেলে শালাদিগে আমি—

দাতে দাতে ঘষে কড়মড় শব্দ করে বললে, শালাদিগে চিবিয়ে খাব আমি। তার মনে পড়ে গেল বর্গীদের হাতে মা-জী এবং মোহিনীও চরম লাঞ্চিত হতে হতে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছে।

— ওই শালা বর্গী গোঁসাইদের। এর পর শুরু করলে সে একদফা অঙ্গীন গালি-গালাজ। কেইদাসী বললে, আছ কেমন ?

—শালার পা-খানা ভেতে গিরেছে। হাড় ভেঙেছে। কবরেজ হাড় জ্বোড়া দিরে বেঁধে দিরেছে। পাজী বেটারা বিভানাথের ঘোড়া বানিরে দিয়ে পোল—ডান পাটা লটোর-পটোর বাঁ পাটা খোঁড়া, বাবা বিভানাথের ঘোড়া।

बलाइ हि-हि करत्र शामरक नागन।

তার পরই হাত বাড়িয়ে অমচরকে বললে, দেরে বেটা, বোতল দে।

সেই মুরণিদাবাদের আমদানী কড়া জিনিসটা। শালা, মদ থেয়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নাই।

মদ থানিকটা গিলে বললে, শোন মা-জী। একটা কথা বলি ভোমাকে। কেষ্টদাসী বললে, ভোমার সঙ্গে আমারও কথা আছে অক্র। ভোমার চাকরবাকরকে বাইরে যেতে বল।

—এই শালা, শ্রাবের বাচ্চারা, যা—যা—বাইরে যা। দোর দিয়ে দেরে আবাগীর ব্যাটা! তারপর—শোন মা-জী। আমার কথাটা আগে শোন। তোমার কথা পরে শুনব। মোহিনীকে তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দাও। সে গায়ে হাত ব্লবে। তাতেও আমার আরাম হবে। নরম কচি হাতের হাত ব্লুনি ভারি ওযুদ।

তারপরেই শাসনের ভঙ্গিতে বললে, না-দিলে—ছঁ—ছাঁ। বুঝতে পারছ? হম অক্র হার। তার নিজের সম্পর্কে রচনা করা মহিমন্তোত্রটি সে আউড়ে দিল—

হম অকুর হায়। লেকিন ছনিয়া বোলতা হম ক্রুর হায়—জবরদন্ত শ্র হায়। শুনো মা-জী, কাজীকে দরবার দ্র হায়; বহুত কাজী হম দেখা হায়। জেব মে রপেয়া হায়; কাজী হাজী গাজি পাজী সবই ইসমে রাজী হায়। এইবার সহজ বাংলায় বলি—শোন মা-জী, সহজে তুমি রাজী না হলে—আমি আজই লোক পাঠিরে মোহিনীকে তুলে আনাব, হাঁ।

বলেই সে নিজের এ হেন কাব্যপ্রতিভার উদ্দীপ্ত হয়ে হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

দাসী সহজে ভয় পায় না। জীবনে সে অনেক দেখেছে। সে স্থিরদৃষ্টিতে চেরে বলেছিল, আমি তোমাকে ডাকিনী বিছেতে বাণ মেরে পেড়ে ফেলব ছোট সরকার। বর্গীরা পা ভেঙে দিয়ে গিরেছে, সে সারবে—খুঁড়িরে হলেও চলভে পারবে। আমার বাণে তোমাকে চিরজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে; বোবা হৃদ্ধ করে দেব আমি। আমার শশুরের সিদ্ধাই হারায় নি, সে আমার কাছে আছে।

এবার ভয় পেলে অক্র। হে-হে করে দেতা হাসি হেসে সে কেই-দাসীর একটু তোষামোদ করেই বললে, না—না—না। ও আমি তামাশা করে বলছিলাম মা-জী। তুমি যে বাবার সেবাদাসী, নইলে তোমাকেই বলতাম, তুমিই থাক দাসী, গায়ে মাথার হাত বুলিরে দাও।

কেষ্টদাসী মেঝেতে থুতু ফেলে বললে, মাছের মধ্যে হাত্তর, পাথির মধ্যে শকুনি, জন্তুর মধ্যে বুনো শুরোর, পোকার মধ্যে মাছি, আর মাফুষের মধ্যে তুমি ছোট সরকার—তোমাদের তুলনা নাই। কিন্তু তবু তোমার হাতে মোহিনীকে আমি দেব। আজ বলি ভোমাকে, এতদিন—দেব দেব মুখে বলেছি কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছিলাম, দেব না। কিছুতেই না। দরকার হলে পালাব। কিন্তু আজ সত্যি করে বলছি, দেব—দেব—দেব। তবে এক শর্তে।

- —কত টাকা ?
- —টাকা নয়।
- —বেশ, সম্পত্তি ?
- --না, তাও নয়।
- —তবে ?
- —কেন্দুলীর ওপারে গড়ম্বললে এক নতুন গোঁসাই এসেছে—
- —ই্যা। কোথাকার রাজার ছেলে। সেই তো—

বাধা দিরে কেষ্ট্রদাসী বললে, মহারাজার ছেলে হোক দেবতা হোক, ওকে যদি অপমান করতে পার, বাজারের নটী দিরে যদি অপমান করাতে পার, তা হলে—গুধু তা হলে তোমার হাতে মোহিনীকে দেব।

অক্র জীবনে কোন কাজেই হিসেব করে না, থতিয়েও বোঝে না, তথু নির্বোধের মত কাজটাই করে যার; মন্দ কাজ হলে তার সঙ্গে জোটে তার বর্ধর উল্লাস। বর্ধর উল্লাসের সঙ্গেই সে বললে, আঃ! হায়! হায়! হায়! হায়! হম পা ভাঙকে—বিস্তারামে পড়া হুয়া হায়, নেহি তো—। আছো, আভি! আভি! আভি! আভি নটার দল হম ভেজুকা উসকা মঠমে। উলোক—লেংটা নাচ নাচকে মু-মে থুকু দেকে চলা আয়েগা।

- —ন। ইলেমবাজাবে ওকে আসতেই হবে—কোন-না-কোন কাজ পড়বেই। তথনই—এই বাজারে।
 - —বৃহত আচ্ছা। তাই হোগা। বলেই সে নিজের বুকে তবলার বোল

বাজিরে দিয়েছিল !—তেটে খেটে—। ওটা তার একটা স্বভাব। বেশী খুশী হলেই সে বুকে তবলা বাজায়—তেটে খেটে তেটে খেটে—কত্তে গদি ঘিনি ধা।

হঠাৎ কিন্তু তবলা বাজানো বন্ধ করে কেষ্ট্রদাসীর দিকে সবিশ্ময়ে চেয়ে বলেছিল, কিন্তু মা-জী!

- --কী ?
- —ওই গোঁসাই-ই তো তোমাদের আজ—
- —বর্গীদের হাত থেকে বাঁচিরেছে ? ই্যা, বাঁচিয়েছে।
- —তবে ?
- —তোমার কি মনে কিন্তু হচ্ছে অক্রুর?

হা-হা করে হেসে অক্রুর বলেছিল, আমার মনে কিছা? আমি পড়ে গেলে ওই গোঁদাই আমার হাত ধরে তুলতে এসেছিল, আমি গাল দিরে তার মুখে থুতু দিয়েছি। আমার কথা নয়। তোমার কথা। তোমার হল কী?

- —সে আমাদের অপমান করেছে অক্র। আমি তার শোধ চাই। এই শোধ যে নেবে তাকেই দেব আমি মোহিনীকে।
- —কী অপমান করেছে? অপমানটো কেয়া গো?—হি-হি করে হেলে উঠল অক্রর: বলি, মতলব নিয়ে গিয়েছিলে বৃঝি? পাকড়াবার মতলব?

কঠিন দৃষ্টিতে অক্রের দিকে তাকিরে কেইদাসী বলেছিল, সে তৃমি ব্রবে না অক্র। তবে এইটি জেনে রেখো, সে থাকতে মোহিনীকে তৃমি পাবে না। আমি তাকে পাকড়াতে পারি বা না-পারি, সে পাকড়েছে আমার বেটাকে। হারামঙ্গাদী মজেছে অক্রুর।

বলেই চলে এসেছিল কেপ্টদাসী। কয়ে বাইরে বসে প্রায় সকল কথাই শুনেছিল। সে বলেছিল মোহিনীকে। বলেছিল, মোহিনী, তু সাবধান হ। তু বরং ওই মাধবদাসের সঙ্গে পালিয়ে যা। মা তোর তোকে জবাই করবে রে।

মোহিনী ভয়ে ফুঁ পিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

করে। জীবনে কাউকে কখনও সাম্বনা দের নি—দিতে পারে না; তার নিজের কোন ভাবনা নেই বলে তার ভয়ও নেই। ভয় যে-পথে আছে সে- পথে দে হাঁটেই না। ভূত প্রেত পিশাচের ভয় তার নেই, কারণ তাদের সে ভক্তি করে প্রণাম করে; সাপের ভয় সে করে না, কারণ সে সাপ ধরতে পারে—সাপের ওঝা; জলকে সে ভয় করে না, কারণ সে সাঁতার দিতে পারে কুমীরের মত। ভয় করে আগুনকে, ভয় করে ঝড়কে, আর ভয় করে মাতৃষকে, মাতৃষের মধ্যে বিশেষ করে সাধু সন্মাসী সিদ্ধপুরুষদের আর রাজ-পুরুষদের আর ডাকাতদের। সিদ্ধপুরুষদের প্রণাম করে তাদের এড়িয়ে চলে; রাঙ্গপুরুষদের ত্রিদীমানায় হাঁটে না; ডাকাতদের—সীমানা এড়াবার জন্ম হুটি কপর্দকও সে নিজের কাছে রাথতে চায় না। কাজেই তার ত্রংথ নেই— কারুর কাছ থেকে তার সাস্থনার প্রয়োজন হয় না, সে কারুর কাছ থেকে সাস্থনা-বাক্য শোনে নি। অপরের ত্রথে শোকে দে কথনও কাছে যায় না; কেউ কাদলে দূরে দাঁড়িয়ে শোনে, বেশী ত্থে অন্তত্ত করলে সেথান থেকে পালিয়ে এদে নদীর ধারে বা বনের কোন গাছতলায় চুপ করে বদে থাকে। বাক্য সে খুঁজে পায় না। সেদিন কিন্তু কয়ো মোহিনীর কাল্লা **দেখে ছ:খ অফুভ**ব করেও পালিয়ে যায় নি। সান্থনা দিয়ে বলেছিল, ভয় কি মোহিনী! কাঁদিস না। স্বামি তোকে বলছি, আমি বেঁচে থাকতে ওই অক্র অম্রকে তোর গা ছুঁতে দোব না।

মোহিনী তার হাত তৃটি ধরে বলেছিল, তা হলে করো, তৃই ওপারের গোঁসাইকে বলে আর—গোঁসাই যেন ইলেমবাজারে না আসে। পায়ে ধরে বলিস করো—গোঁসাই এসো না, এসো না, ইলেমবাজার তৃমি এসো না। ওই অক্রেকে তৃমি জান না—সে ভয়হর—সে রাক্ষস—সে সব পারে। কিছ কী? কী দেখছিস কয়ো? কথা হচ্ছিল থিড়কির দিকের ফুলবারিচার মালতীলতার কুঞ্চটার মধ্যে; স্থানটা বেশ আড়াল। কয়ো হঠাৎ উঠানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছে কিছু দেখে। মোহিনী তাই প্রশ্ন করেছিল, কী ? কী কয়ো ?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল করে। উঠানের ও-মাথাটা।

উন্নাদিনীর মত ঘুরছে কেইদাসী। চুল এলিয়ে পড়েছে, গায়ের কাপড় মাটিতে লুটছে, আকাশের দিকে মৃথ করে সে ঘুরছে।

किमिकिन करत करता वनल, 'वांठे' वहेट्ड बार इस !

'বাট বওয়া' ডাকিনী বিভার অহ। প্রেমদাস বাবাজীর বটুমী, মোহিনীর পিতামহী ছিল কামরূপের মেয়ে। বাবাজী গিয়েছিল মণিপুর, সেধান থেকে ফেরার সময় নিয়ে এসেছিল বোষ্ট্মীকে। লোকে বলে, কেষ্ট্রদাসীও বলে, শাশুড়ী ডাকিনী বিষ্যা একটি কোটোর পুরে রেখে গিয়েছিল—সেই কোটো খোলার সঙ্গে সঙ্গে দে বিজা কেইদাসীর আরত্ত হরে গিয়েছে। প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধাই, সেও নাকি ডাকিনী-সিদ্ধির সিদ্ধাই। সে সিদ্ধাই আছে আখডার গৌরান্ধ-বিগ্রহের আইনকে আশ্রয় করে। আশীর্বাদ আছে-তিন বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন হলেই, ওই গৌরাক-বিগ্রহকে ফুল জল দিলেই, তু বেলা আরতি করলেই সে সিদ্ধাই নিশ্চর পাবে। সে সিদ্ধাই কেউ কেউ বলে কেষ্টদাসী পেরেছে। কিন্তু কয়ো জানে না। সে সিদ্ধাই পার নি এখনও মা-জী। মা-জী নিজে শাসার লোককে সে শাশুড়ীর ডাকিনী বিছার জোরে। ডাকিনী বিছাকে জাগাতে হলে বাট বইতে হয়। তার শুরুটা ঠিক এই রকম। এর পর গভীর রাত্রে চারিদিক নিষ্তি হলে মা-জী মাথা নিচু দিকে করে পা উপরের দিকে তুলে হাতের উপর হেঁটে বেড়াবে। সারা অবে একগাছি স্থতো বলতে কিছু থাকবে না। সে সময় কেউ যদি সামনে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে চিংকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে এবং তাতেই হবে তার স্থনিশ্চিত মৃত্যু।

মোহিনী সভরে অক্ট চিৎকার করে উঠেছিল। করো তার হাতথানা মুখে চাপা দিরে বলেছিল, চুপ। আয়, ঘরে আর। ও দেখতে নাই। পালিরে আয়।

দারাটা রাত্রি মোহিনী আতক্ষে অভিভূত হরে মাটির মৃতির মত বসে ছিল।
তথন বোধ হর শেষ রাত্রি, কারণ তথন চাঁদ উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীরাত্রির চাঁদ। ছাব্রিশ দণ্ড পার হরে গেছে। একটা কাতর আর্তনাদ শুনে
মোহিনী চমকে শিউরে উঠেছিল।

—এ আমি কী করলাম! এ আমি কী করলাম বে!

তারপর শব্দ উঠেছিল যেন প্রহারের শব্দ। কেউ যেন কাউকে প্রহার করছে।

চিংকার করে মোহিনী ভাকতে গিয়েছিল, মা! মা গো! কিছ বাড়ির

বাইরের দিক থেকে শুনতে পেরেছিল করোর কণ্ঠশ্বর। করো বাড়ির বাইরে দাওরায় শুরে ছিল। সে সন্তর্গিত কণ্ঠে মোহিনীকে ডাকছিল, মো-হি-নী! মো-ছি-নী!

নিস্তর্ক নিষ্তি রাত্রি। তার মধ্যে এ ডাকে ব্যঞ্জনা দ্বিগুণিত হরে উঠেছিল।

—সাবধান মোহিনী! উঠিস না। দোর খুলিস না। ডাকিস না। খবরদার!

কয়োও শুনতে পেরেছিল এ আর্তনাদ।

আর্তনাদ তথনও শেষ হয় নি। সেই মুহুর্তেই আবার আর্তনাদ উঠেছিল, রক্ষা কর—তুমি রক্ষা কর ঠাকুর—মহাপ্রভূ—হে গৌরাঙ্গ—দয়াল—তুমি রক্ষা কর।

সকালে উঠে মোহিনী সম্ভর্পণে দরজা খুলে বাইরে এসে উঠানের চারিদিক চেরে দেখেও মাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু নীচে নেমে আসতেও তার ভরদা হয় নি। কয়ো একটা গাছের উপর চড়ে তারই একটা ভাল বেয়ে অয় একটা গাছের ভাল বেয়ে পর পর কয়েকটা গাছ অতিক্রম করে এসে নেমেছিল বাড়ির মধ্যে। এ বিছাতে কয়ো বানরের চেয়েও পটু, কাঠবিড়ালীর মত। তারই সাহসে নেমে এসে মোহিনী মাকে আবিক্ষার করেছিল। কেইদাসী পড়েছিল ঠাকুর-ঘরে—বিগ্রহের সম্মুখে। সে অথোরে মুমছেছ।

সে-ঘুম ভেঙেছিল কাঁসর-ঘন্টার শব্দে। ও-পাড়ার মন্দিরে মঙ্গলারতি হচ্ছে। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে কেইদাসী উঠে বসেছিল। কেইদাসীর চোথ ছ্টি তথন যেন লাল হরে উঠেছে। ঘুম ভেঙে উঠেও সে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, চোখে নিম্পালক দৃষ্টি।

—মা! মা গো! অনেক সাহস সঞ্চয় করে ডেকেছিল মোহিনী। কন্তার দিকে সেই নিপালক দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়েছিল কেইদাসী।

—মা! মা! এবার গায়ে হাত দিয়েছিল মোহিনী।

কেষ্টদাসী ছই হাত বাড়িয়ে মেয়েকে বুকে জাপটে ধরে যেন আপন-মনেই বলে উঠেছিল, না—না—না। দেব না। আমি দেব না।

করো বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এতক্ষণে বলেছিল, মা-জী, তোমার এ চেহারা মোহিনী সহ করতে পারবে না মা-জী। তুমি তোমার সিন্ধাইরূপ সামলাও মা-জী।

- -ক্ৰো!
- --- हैं। या-जी।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল কেষ্ট্রদাসী।

— ওঠ। চান কর। প্রভুর আরিতি কর। বাল্যভোগ দাও। প্রসাদ লাও। দেরি কোর নামা-জী। এখনি পাড়া-ঘরের সকলে আসবে। বাউল্রা আসবে গান গাইতে।

করেক মুহুর্ত শুদ্ধ থেকে উঠেছিল কেন্ট্রদাসী। দিনের আলোয় যেন আনেকটা আত্মন্থ হয়েছে তখন। আলনা থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিম্বে গিয়েছিল থিড়কির পথে। কিছুক্ষণ পর থিড়কির ডোবাটাতেই স্নান সেরে এসে কাপড় ছেড়ে গিয়ে আবার চুকেছিল মন্দিরে।

তারপর সে প্জা—তার অভ্ত প্জা। এ প্জারিণী কেইদাসী যেন নতুন কেইদাসী; সে প্রনো মান্ত্যই নয়। থাওরা ভূলে, ঘর সংসার সব ভূলে প্রায় সারাদিন সে পূজাই করেছিল; পান দোক্তা পর্যন্ত থায় নি। থেয়েছিল শুধু বার কয়েক ছোট কজেতে বড় তামাক। অবসর সময়ে ভাম হয়েই বসে ছিল।

সন্ধ্যার সময় মোহিনী ভয় পেরে কয়োকে বলেছিল, আবার যে রাভ নামল কয়ো। আজ যে অমাবস্তে!

করো বলেছিল, চুপ করে থাক মোহিনী। চুপ করে ঘরে বসে থাক। এর উপায় নাই।

- --কেন এমন হল কয়ো?
- —বুঝতে পারছি না মোহিনী। বুঝতে পারছি না। ওর সব থেন ওলটপালট হয়ে গিয়েছে মনে লাগছে। এতো বাট বওয়ার মত লাগছে না। ডাকিনী বিছে জাগা তো নয় এ।

ঠিক এই সমরেই কেন্টদাসীর তীব্র ক্রুদ্ধ চিৎকারে শাস্ত আথড়াটর সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয় মৌন পরিবেশটি চিরে যেন ফালিফালি হয়ে গিয়েছিল।

কেন্তদাসী চিৎকার করে উঠেছিল, না—না—না। বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা হারামজাদারা।



থিড়কির দরকায় চিৎকার! করে। উকিয়ুঁকি মেরে দেখছিল ঘটনাটা। দেখে বিশ্বয়ের উপর বিশ্বয় বেড়ে গিয়েছিল তার। মা-জীর জক্তে দাস-সরকারের ক্স্প থেকে ডুলি এনেছে দাস-সরকারের থাস পাইক কাল্। কালুকে গালাগাল দিছে মা-জী। ডুলি ফিরিয়ে দিছে মা-জী। বলছে, বেরিয়ে যা হারামজাদারা—বেরিয়ে যা।

কেষ্ট্রদাসী তথনও চিৎকার করছিল, বেরিয়ে যা, নইলে আমি শাপাস্ত করব।

কালু যেন তব্ও কিছু বলেছিল। কেইদাসী ছুটে গিয়ে বিগ্রহের ঘরে চুকে চিৎকার করছিল, আয়! আয়! কই, আয় দেখি! আমি—আমি পেড়ে ফেলব—আমি শাপাস্ত করব।

কালু এবার সভয়ে তুলি নিম্নে ফিরে গিয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ পর। দাস-সরকার এসেছিল নিজে।—কেষ্টদাসী!

কেষ্টদাসী আবার চিৎকার করে উঠেছিল, না।

—তোমার হল কী? কখনও তো এমন কর না। তা ছাড়া ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে—

দাসী বলেছিল, ধর্ম আমি জানি দাসজী, আর ধর্মে কাজ নাই দাসজী।
তুমি আমাকে রেহাই দাও। রেহাই দাও।

- -मात्री! (कहेमात्री!
- —তোমাকে হাতজাড় করছি। জোড়হাত করছি। তুমি যাও।
- —তোমাকে সঙ্গে না-নিয়ে তো আমি যাব না। তা হলে তো তুমি ভূলি ফিরিয়ে দিয়েছ তাতেই মিটে যেত। বিবেচনা কর, আমি নিজে এসেছি কেইদাসী।
 - স্থামি যাব না দাস-সরকার।
- —না গেলে তোমার প্রত্যবায় হবে দাসী। সাধনের ব্যাপার। তুমি তোনা-জানা নও। ধর্ম তোমাকে ক্ষমা করবে না। জ্বনিষ্ট হয়ে যাবে।
- —হোক। তাই হোক। আমার দর্পাঘাত হোক, আমার ব্যাধি হোক। আমি বাব না।
 - —বেতে তোমাকে হবে। আমার লোক তোমাকে তুলে নিয়ে বাবে।

—তুলে নিয়ে যাবে ? তুলুক দেখি, কে পারে ?

বলেই সে ছুটে গিরে গৌরাক্স্তির পা গুটি জড়িরে উপুড় হয়ে শুরে পড়েছিল। বলেছিল, এই পা ছাড়িরে নিরে যাও আমাকে। দেখব!

এর পর দাস-সরকার নীরবে উঠে গিয়েছিল। ক্লফদাসী সেই চতুর্দশীর সন্ধ্যা থেকে অমাবস্থার রাত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত দেবতার চরণ ছেড়ে ওঠেনি।

ষথন উঠল, তথন চোধ হুটো তার জবাফুলের মত লাল।

মোহিনী শিউরে উঠেছিল মাকে দেখে। মা জ্রক্ষেণ করে নি। অজ্ঞ্জান করে এসে পাঁটরা খুঁজে শাশুড়ীর অর্থাৎ সিদ্ধবাউদ প্রেমদাসের সেবাদাসীর অতি জীর্ণ গেরুয়া কাপড়খানা পরে পুজোর ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মোহিনী! মোহিনী! আন্তো জাঁতি-খানা—ভালখানা।

মোহিনীর হাত থেকে জাঁতিখানা নিরে নিজের চুলের প্রাক্তভাগ তার হাতে দিয়ে বলেছিল, ধর্, টেনে ধর্। তারপর নিজের হাতে চুলের রাশি কেটে, নিজের হাতে সেগুলি খিড়কির ডোবার ফেলে দিয়ে এসেছিল।

—পাপ! পাপ! দে পাপ ঝেড়ে ফেলে। যা, দ্র হ। ভোবায় ডুবে ষা। তারপর বঙ্গেছিল পুজোর।

সে পুজো সেরে উঠেছিল তিন দিন পর। তাও নীল-সংক্রান্তির গান্তনের চাক বাজিয়ে বাণ-গোঁসাই নিয়ে গাজনের ভক্তদের হাঁকে চমকে উঠে ফিরে না-তাকালে উঠত কি না সন্দেহ। সেদিন অনেক কাজ। ঠাকুর ঝারায় বসবেন। অর্থাৎ কাঠের তেকাঠার মাথায় বহুছিদ্রযুক্ত মাটির ভাঁড় বসিয়ে সেটিকে জলপূর্ণ করে ঠাকুরের উপর স্থাপন করা হবে। প্রথর তাপে শীতল ধারা-স্নানে অভিষিক্ত হবেন দেবতা। তুলসীগাছের উপর বসানো হবে। অশ্বথরক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করতে হবে। পিতৃপুক্ষকে জলদান করবে গৃহস্থেরা। পুণ্যাত্মারা পথের পাশে জলসত্ত দেবে। কাজ অনেক।

সমস্ত ক্লুভার্ত্তলি সেবে সে বলেছিল, আমি স্থপুরে যাচ্ছি গোঁসাই ঠাকুরের কাছে।

মোহিনী আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এই রোদে যাবি মা ?

মা উত্তর দেয় নি, শুধু মেয়ের দিকে একবার তাকিয়েছিল মাত্র। তার সে দৃষ্টিতে বৈশাধের রৌদ্রের চেয়েও জালা বেলী, তাপ বেলী। মোহিনী ভয় পেরেছিল, আর কোনও কথা বলতে সাহস করে নি। গামছাখানা ভিজিরে মাথার চাপিয়ে কেইদাসী বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। পথে জলসত্র দেখে চোথে-মুখে জল দিয়ে একটু জল খাবার জন্ম গিয়ে হাত পেতে দাঁড়িরেছিল। আশ্রমের ধরজাটি বাঁধা ছিল একটি গাছের ভালে—রৌদ্রের জন্ম স্বাভাবিক ভাবেই কেইদাসী উপরের দিকে তাকার নি। জল ছোলা গুড় দিচ্ছিল যে, সেও স্থানীয় লোক। আশ্রমের সেবক তৃজন অন্য-একটি গাছতলায় কতকগুলি লোকের জমায়েতের মধ্যে বসে একখানি পুঁথি পাঠে নিময় ছিল। কেইদাসী তাদেরও দেখতে পার নি। অঞ্জলি পেতে জল নিয়ে মুখে চোখে দেবার সময় হঠাৎ চোখ পড়েছিল গেরুরা পাগড়ির উপর। হাতের জল তার—তার অজ্ঞাতসারেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গিয়েছিল, সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সয়াসীদের দিকে।

যে জল দিচ্ছিল সে বলেছিল, জল নাও গো। অ মা-জী! সাড়া দের নি কেষ্ট্রদাসী। লোকটি আবার ডেকেছিল, মা-জী!

এবার কেষ্টদাসী ছিলে-ছেড়া ধন্তকের মতই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, বিষ—বিষ। জল নয়, বিষ। রাধাকে ওরা বনবাসে দিয়েছে—
ভামের পাশ থেকে দূর করেছে। ওদের জলসত্ত্রের জল থেয়ো না—ইহকাল যাবে পরকাল যাবে। থেয়ো না। বিষ। বিষ। বিষ।

বৈশাপের প্রথব রৌদ্রও চমকে উঠেছিল বোধ হয় তার সে চিৎকারে। যারা গাছতলায় বসে পুথিপাঠ শুনছিল, তারা চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এক অন্তুত কাণ্ড।

কোথা থেকে কে কাকে থবর দিলে দে কেউ বলতে পারে না, লোক জমে গেল দলে দলে। জলসত্ত্বের জলের জালা উন্টে দিলে—ছোলা ছড়িয়ে, গুড় ছিটিয়ে কেলে দিলে, ধ্বজাটা টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। থোল এল, করতাল এল—রাধা-গোবিন্দের নামসংকীর্তনে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল।

लाटक वनल, मा-जीत छत इटाइ । अर्थाए मा-जीत मधा निटा प्रविका

কথা বলছেন। কয়েকজন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের আলখালা পাগড়ি ছিঁড়ে দিতে উন্নত হয়েছিল, কিন্তু মা-জী বলেছিল, না। ওরা ফিরে যাক।

সংকীর্তন নিয়ে কেষ্টদাসী ফিরেছিল ইলামবাজারের দিকেই। স্থপুর যাওয়ার কথা বোধ করি ভূলেই গিয়েছিল। সেখানে সারাদিন কীর্তন হবে। কেষ্টদাসী তথন নিজেও প্রায় আত্মহারা। সে গেয়েই চলেছিল—

"জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে।
রাধা আমার মহাজন, ভাম সে থাতক রে।
রাধা আমার বারিধারা, ভাম সে চাতক রে।
রাধা আমার পূর্ণ চাঁদ, ভাম সে চকোর রে।
রাধা সে অমূল্যমণি, ভাম সে আকর রে।
ভাম নব জলধর, রাধা সে বিজুরী রে।
ভাম আমার নীলকমল, রাধা সে মাধুরী রে।
রাধা চাড়া ভাম নয়, ভাম ছাড়া রাধা নয়।
রাধা-গোবিন্দ জয়, জয় রাধা-গোবিন্দ জয়।
রাধা-গোবিন্দ আমার, নিথিল ভ্বনময়।"

সকল ভ্রনময় সকল জীবনময়। কেইদাসীর গানের প্রতিধ্বনি উঠছিল জনতার কঠে কঠে। আকাশ স্পর্শ করছিল সে ধ্বনি। গানের আখরের মাধুর্যে এবং গারকদের প্রাণের আবেগে রাধা-গোবিন্দের যুগলস্তা সত্যই যেন ভ্রনময় মুর্ত হরে উঠেছিল।

সংকীর্তনের দল পথে পথে পরিপুষ্ট হতে হতে ইলামবাজারে এসে ইলামবাজারের মূল বাজার এবং বন্দর-ঘাটকে পাশে রেথে জন্মবাজারের পূর্ব-প্রান্তে এসে যখন পৌছল, তথন সেধানে হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছে। ইলাম-বাজার এবং জন্মবাজারের মধ্যবর্তী এই মাঠটির মধ্যে থানিকটা, মানে বেশ ক্ষেক বিঘা, পতিত জ্ঞমি নিয়ে একটি বড় পুকুর; এই পুকুরটির চারিপাশ ঘিরে শনিবার শনিবার সেকালে বসত গ্ল-মহিষের হাট। ক্ষেকথানা চালাঘরে ক্ষেকটা দোকান বারো মাসই থাকত সেখানে। ত্-চারথানা থালি বিকি-কিনির উপর একটা মাণ্ডল আদায় করত। বাকী তৃ-তিনখানা ছিল এখানকারই বড় পাইকার অর্থাৎ দালালদের আন্তানা। তারা এখান থেকে সন্দা করে যেত বড় বড় হাটে—হিরণপুর, পাচুন্দী এবং খাস মুরশিদাবাদ পর্যন্ত। শনিবার তৃপহর হতে হতে ঠাইটার চেহারা হত মহাভারতে বণিত উত্তর-গোগৃহের মত। অন্ত ছ দিন খাঁ-খাঁ করত, তবে তুপুরের সময় পাশের সড়ক ধরে যারা যেত-আসত তারা বিশ্রাম করত, মুড়ি-চিঁড়ে থেত, তামাক সেবন করত, তারপর আবার চলে যেত। বৈশাথ-জ্যৈষ্ঠ পুকুরটার জল বালুময় মাটির রন্ধ পথে অজয় টেনে নিত। জলের অভাব ঘটত। মাধবানন্দের শিক্ষেরা এখানেও একটি জলসত্ত খুলেছিল, হৈ-হৈ সেখানেই।

অক্রের অস্টরেরা এখানে তাণ্ডব শুরু করেছে তথন।

অক্রের মন্তিষ মাধবাননকে অপমানের উপার-উদ্ভাবনেই চিস্তান্থিত ছিল। রুঞ্চাসীই তার মন্তিক্ষকে এ বিষয়ে সক্রির করে দিরেছে সে দিন। ওই শর্ডে সে মোহিনীকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিছু নিজে সে শয্যাশারী তাই এতদিন একটা কিছু করে উঠতে পারে নি। সাধারণ লোক হলে এতদিন যাহোক একটা কিছু হয়ে যেত। কিছু মাধবানদের আশ্রমবাদীরা দেদিন, ওই নাগা সন্মাদীই হোক আর ছল্পবেশী বর্গীই হোক, ভাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। সাধারণ লোক হলে অক্রুরের অফ্রচরেরা এতদিন কোন্দিন হা-রে-রে শব্দ করে তার বাড়িতে হানা দিয়ে ঘরের চালখানা উন্টে দিয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিম্নে আসত। এবং সারা ইলামবান্ধারের বান্ধারটায় হয় কান ধরে, নয় গলায় গামছা দিয়ে টেনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। নবাবী भामन थ्रहे कड़ा। नवाव ऋकाउँ पोला, युख्त मूत्र निष्कृ निर्धात भामनदक ঠিক বজায় রেখেছেন। কিন্তু অক্র বলে, বাবা নাম দিয়া, উ তো অক্র হায়, লেকিন ছনিয়া বোলতা হম ক্রুর হায়। হাা, ক্রুর হায়, জবরদন্ত শ্র ভি হায়, নেশামে মগজ হরদম চুর হায়। কাজীকে দরবার দূর হায়। বছত কাজী হম দেখা ভি হায়। জেব মে রূপাইয়া হায়, কাজী-গাজী-পাজী সব কোই ইসমে রাজী হায়। ফৌজদার-সে স্বাদার সব দরবার মে রূপাইয়া-সে কেরা নেহি হোতা হার ?

বলেই নিজের রিদকতায় এবং এমন কাব্যপ্রতিভায় নিজেই মৃদ্ধ হয়ে অট্টহাস্থ করে ওঠে। কোন একটা কিছু যেদিন ঘটে যায়, সেই দিনই বা পরের দিন থাসি যি থেকে শুক্র করে জাকরান পর্যন্ত সাজিয়ে মধ্যস্থলে কয়েকটি স্বর্ণমুলা দিয়ে বিরাট সিধের খেলাত চলে যায় হাতেমপুরের খা সাহেবের দরবারে। কিছু এই নবীন সয়্যাসীকে দমন-সমস্থাটা এত সোজা নয়। শুধু শক্তিমান বলেই নয়, নবীন সয়্যাসীর আশ্রম হাতেমথার এলাকার বাইরে। অজয়ের ওপার বর্ধমানের রাজার এলাকা। কিছুদিন আগে শোভাসিং আর পাঠানদের বিদ্রোহের সময় বর্ধমান-রাজক্র্যাকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল, তারপর বর্ধনান নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। তেজস্থিনী বর্ধনান-কয়্যা যে দীপ্তিচ্ছটা ছড়িয়ে বংশগোরবকে উজ্জ্বল করে গিয়েছেন তার উপযুক্ত উত্তাপ সংগ্রহ করেছে বর্ধমান এবং নিজে থেকেই সঞ্চারিতও হয়েছে।

হঠাৎ সেদিন কিছুক্ষণ আগে, জলসত্র নিরে ক্রফদাসীর বিচিত্র যুদ্ধকথা শুনে বিছানা চাপড়ে বর্বর চিংকারে বাহা-বাহা করে উঠেছিল অক্র ।— বাহা রে মা-জী! বাহা বাহা বাহা! সঙ্গে সঙ্গে হাক পেড়েছিল, ওরে শুরারের বাচচা হারামজাদা কেলো!

কেলোর দল অক্রের অইপ্রথবের সঙ্গী। এই অস্থের মধ্যে তারা হাজির থাকত, গাঁজা টিপে তৈরি করে হুজুরকে খাওয়াত। অঙ্গীল গার বলত। গান করত। পদ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্ম কোমল হাতে হাত বুলাবার জন্ম নারী সংগ্রহ করে আনত। অক্রেরে হাঁকে লাফ দিরে এসে দাঁড়িয়েছিল কেলে এবং বলেছিল, কী বলছ?

- —্যা, আভি যা, ওই গো-হাটার সন্ধাসী-বেটারা যে জনসত্র বসিয়েছে দিয়ে আর ভেঙে। আর সন্ধাসী-বেটাদের—
 - —কেটেকুটে পুঁতে দোব অজয়ের গাবার ?
 - **—** मिवि ?
 - —তুমি বললেই দোব।
- —বেটাদের বন্দুক আছে রে! তার চেয়ে কান মলে, মাথার চাঁটি, পাছায় লাখি মেরে ভাগিরে দিরে আয়। নাকগুলো বেটাদের ঘষে দিবি।

কৃষ্ণদাসীর কীর্তনের দল যথন ওই হাটের কাছে এসে পৌছেছিল—
তথন কেলোর দল ওই তাওবে মেতে নৃত্য করছিল। কৃষ্ণদাসী থমকে দাঁড়িয়ে
গিরেছিল। বর্বর অক্রুবের এই পাষ্ঠ অক্রুচরের দল এই অত্যাচার করছে
নবীন সন্ন্যাসীর অক্রচরদের উপর ? সে ভূলে গিয়েছিল যে, এ অক্ররোধ সেই
করেছিল। তার প্রতিবাদ রাধার অপমানের জন্ত, তার মর্মে আঘাতের
জন্তা। অক্রের কী অধিকার ? এই পাষ্ঠেরা কিসের জন্তা এ তাওব
করছে ? কেন করবে ? সেই নবীন সন্ন্যাসীর অপমান হবে অক্রের হাতে ?

সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল রুঞ্চাসীর। অন্তরাত্মার তাড়নার সে
চিৎকার করে উঠেছিল, ধ্বংস হয়ে যাবে। সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।
খেড়া ছুটিরে আসবে যমদ্তেরা। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ওই সক্ন্যাসীদের
রক্তপাত হলে সর্বনাশ হবে। রক্তগঙ্গা—আগুন—মহামার—মহামারী!
সাবধান! সাবধান! সাবধান!

ष्यवाक इरम् शिरम्हिन मरनम लारकता।

কেলে সর্দার অক্রের অফচর। সে সহজে দমে না। সে হি-হি করে হেসে বলেছিল, তুমিই তো বলেছ গো।

তার পুরো বক্তব্যটা ছিল এই যে, তুমিই তো বলেছ গো অক্রুর সরকারকে। এ আবার এখন কী বলছ? কিন্তু অধীর, অন্থিরমন্তিদ রুফদাসী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠেছিল, ওরে পাপের অন্থচর প্রেত, ওরে নরকের আগুনের কালি, ধর্মের ভূলভ্রান্তির প্রতিকার করবি তোরা? মন্তর ভূল হয়েছে বলে হোমের বিয়ের আহতিতে জালবি তোরা? সরে যা, দ্রে যা—পাপ—পাপ—মহাপাপ! জলে যাবে, জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে দেশ—ঘর-বাড়ি ক্ষেত্ত-খামার ওই বন। দাউ দাউ করে জলবে। দলে দলে যমদ্ত আসবে রে, ঘোড়ার ক্রে ফুরে ধুলো উড়ে সব ঝাপসা হয়ে যাবে। তারপর রক্তগলা! রক্তগলা!

বলতে বলতে তার চোথ হয়ে উঠেছিল বিক্ষারিত, নাকের পেটি ত্টো ধর্ণর করে কাঁপছিল। হাতের আঙুলগুলি মৃষ্টিবদ্ধ হয়ে গিরেছিল যেন আপনা-আপনি। মনে হচ্ছিল জ্ঞান হারিরে পড়ে যাবে এখনই। জ্ঞান হারাবে নয়—জ্ঞান যেন ওর হারিয়েই গেছে; এ-লোকে দাঁড়িয়েও, এই লোকে আর সে নেই এখন। কোন অলৌকিক লোকে দাঁড়িয়ে ওই বিক্লারিত চোখে দিবাদৃষ্টির মত দৃষ্টিতে এক বিচিত্র জগৎ দেখে কথা বলছে; সে জগতে সকল কর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্তমান-ভবিশ্বৎ পটুয়াদের পটের মত খুলে যাচ্ছে।

সাধারণ মাহ্নবদের কথা থাক্, এবার ভয় পেয়েছিল ওই কেলে সদার পর্যন্ত। এ কী মৃতি! মা-জীর এমন মৃতি সে তো কথনও দেখে নি! কতদিন মা-জী সময়ে অসময়ে তাকে শাসিয়েছে, বলেছে, আমি ডাকিনী বিছে জানি কেলে। সাবধান! কেলে ভয় করেছে, আবার করে নি। এবং ভয় করা বা না-করা ছুটো দিকের কোন একটা দিক নিয়ে খুঁট পেতে দাঁড়াবার প্রয়োজনও হয় নি। অর্থাং সব সময়েই একটা মিটমাট হয়ে গেছে। আজ তার নিশ্চিত বিশাস হল—মা-জী ডাকিনীম্তি ধরছে। সে সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, আছো আছো, আমরা চলে যাছি, চলে যাছিছ। আয় রে—আয় রে, সব চলে আয়, চলে আয়।

আশ্রমের কর্মীরাও এই উন্নাদিনীর মধ্যে এক দিব্য মৃতিকে যেন প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা প্রণাম করেছিল কৃষ্ণদাসীকে। বলেছিল, তুমি মা। তুমি মা। কৃষ্ণদাসী এবার অকন্মাৎ হা-হা করে কেঁদে উঠেছিল। এবং মুহূর্ত কয়েক হা-হা শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করে কেঁদেই মাটিতে ল্টিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল।

সে জ্ঞান তার ফিরেছিল প্রায় প্রহর খানেক পর। তখন নাম-সংকীর্জনে সমাগত লোকেরা তাকে ধরাধরি করে তার আথড়ার এনে শুইয়ে দিরেছে। মোহিনী একাস্ত ভাবে অবোধ মেরে, তার বরসের অমপাতেও বোধশক্তি পরিপুট হয় নি। সে ভরে প্রায় শুস্তিত হরে নির্বাক হয়েই বসে ছিল। শুধু কাঁদছিল।

প্রাচীন বৈষ্ণবেরা এসে বসে ছিল। তারা সকলেই তাদের ধারণা অস্থবায়ী বলেছিল, দশা। দশা হঙ্কেছে ক্লফদাসীর। এতবড় সিদ্ধ পাটের মহিমা! যাবে কোথা? উঠানে সংকীর্তনের বিরাম ছিল না।

জর রাধে রাধে—জর জর বাধে! বাঁশরী বাজায়ে শ্রাম রাধানাম সাধে। রাধে! রাধে! জয় জয় বাধে!

মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে তিন ভূবন কাঁদে।

রাধে! রাধে! রাধে! রাধে! জয় রাধে! জয় রাধে! জয় রাধে!

এরই মধ্যে কৃষ্ণদাসী একসময় চেতনা পেয়ে উঠে বদেছিল। কিন্তু তথন সেপ্রায় বন্ধ উন্নাদ। অসম্ভকেশবাস রূপসী কৃষ্ণদাসী উঠে দাঁভিয়ে বলেছিল, আমি রাধা, আমি কলন্ধিনী, আমি সামান্তা, আমি গোপনারী, তোমার গরবে আমি গরবিনী—তুমি আমাকে ধুলায় লুটিয়ে দিলে। আমি যে তোমার জন্তই চন্দন মাথি অঙ্গে; সেই অঙ্গে ঢেলে দিলে কলক্ষের কালি!

বলতে বলতে আবার হা-হা করে কায়া। সে কী কায়া!

আজীবন না হোক, আযৌবনই কৃষ্ণদাসী পাপিষ্ঠা। কিন্তু ওই পাপিষ্ঠার মক্ষভূমির মত অন্তরে কোথায় ছিল ফল্কর মত অপরপের তৃষ্ণার দ্বিধ্ব একটা প্রবাহ। দেহসম্ভোগের লালসাবিক্ষ্ক লবণ-সম্ভের মত জীবনের মধ্যে কোথায় ছিল প্রেমকামনার অনিবাণ বহিংশিখা, আজ জীবনের ঘাতে-প্রতিঘাতে মক্ষভূমি বিদীর্ণ হল, সম্ভ শুকাল, বয়ে গেল একটি নিঝারিণী-প্রবাহ, তারই তীরে জলে উঠল একটি হোমকুগু। কৃষ্ণদাসী পাগল হয়ে গেল।

করে। বরাবরই তাদের কাছে কাছে আছে। মা-জীকে মোহিনীকে—

হক্ষনকেই সে ভালবাসে। সে ভালবাসা জন্তর মত ভালবাসা। যদি কেউ

বলে কুকুর-বেড়ালের মত তো বলার কিছু নেই। বলেও লোকে।

পুরুষেরা বলে—আথড়ার কুকুর। মেয়েরা বলে—কুকুর নয়, কেইদাসীর

হলো বেড়াল। ঘেউ ঘেউ নয়—ম্যাও-ম্যাও ওর ডাক। মরণ! মেনী

মোহিনীর গা চেটেই পোড়ারমুখোর স্কুখ!

কয়ো শুনতে অবশুই পার। কিছু বলে না কিছুই। থুব থোঁচালে বলে—কয়ো কয়ো। কুকুরও না, বেড়ালও না। কেইদাসী বেলগাছ, মোহিনী বেল; বাসা বেঁধে বেলগাছে আছি। বোধ হয় আর-জন্মের কমফের।

তারপর ভেবেচিন্তে আবার বলে—আর-জন্মে বেন্ধদত্যি ছিলাম, মরে

করো হয়েছি। বেলগাছ ছাড়া তাই মন ওঠে না। তোদের চামড়ার মুখে যা আসে বলে যা। তবে মোহিনীর কথা বলিস নে, পাপ হবে। বেলের নাম শ্রীফল। মা-লক্ষী নিজের তান কেটে শিবপূজা করেছিল। ওতে করো কথনও ঠোকর মারে না। পাকলেও ও-গদ্ধ কয়োর ভাল লাগে না। আমি, যে তাড়ো বেটারা বেলের লোভে আঁকশি নিয়ে আসে, তাদের মাথার ঠোকর মারি। বাস্।

করে। সে-দিনও মা-জীর পাশে পাশেই ছিল। পর্বলা বৈশাথ, বছ স্থানে বছ দান বছ সেবা বছ ভোগ। কয়ে। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছিল। আগের দিন চৈত্র-সংক্রাস্তিতে ছাতু থেয়েছিল পেট পুরে। সকালে একটু অগ্লিমন্দা ছিল। তাই এখানে ওখানে ওই ইলামবাজারেই—শশা বাতাসা গুড় ছোলাভিজে থেয়েই তৃপ্ত ছিল। ঠিক করেছিল আরও একটু বেলা চড়লে অর্থাং তুপহরের কাছাকাছি হলেই যাবে স্থপুরে, সিদ্ধপুক্ষ আনন্দ ঠাকুরের ওখানে গিয়ে এঁটোকাঁটায় তৃপ্ত হয়ে আসবে। তবে ঠাকুর বোইমদের শিরোমণি, মা-জীরও বাবার বাবার মত বাবাজী, ওঁর ঘরে এঁটো আছে কাঁটা নেই। একেবারে নিরামিষ। তা হোক, বছরের প্রথম দিন। সিদ্ধপুক্ষের গোবিন্দের প্রসাদ। আর কয়ে। হলেও কয়ে। তো বোইম বটে। আজ নিরামিষই ভাল। শুক্তো, বড়িভাজা আর গুড়-অস্থল যা মধুর, তাতে ওব কাছে অমিষের কাঁটা কোথায় লাগে!

হঠাৎ মা-জী গামছা মাথায় বের হল, মোহিনীকে বললে, আমি চললাম মপুর, ঠাকুরের কাছে। করো দক্ষ নিয়েছিল। পথে এই কাণ্ড। কাণ্ড মথন হল তথন কয়ো নিরামিষ শুক্তো বড়িভাজা শুড়-অম্বলের লোভ ত্যাগ করেই মা-জীর দক্ষে দক্ষেই ঘুরেছে। অবাক হয়ে দেখেছে। ভেবে কুল-কিনারা পায় নি। এ হল কী? মা-জীর জীবনের আলো-অক্ককারের খেলার কথা তো খুব ভাল করেই জানে। এ যে একাকার হয়ে গেল। মা-জী যদি অক্রুর সরকারের বাহন ওই কেলে দর্দারের তাণ্ডব দেখে নৃত্য করত তবে সে বিশ্বিত হত না। সুর্বে গ্রহণ লাগে—অক্ককার আলোকে গিলে ফেলতে চার; সর্বগ্রাসী গ্রহণও দেখেছে সেটা অক্সের ঘাটে লোকে

ষধন হরিনাম করেছে, স্থান করেছে, করো তথন একটা ভূষো-কালিমাখানো কাচ চোথের সামনে ধরে গ্রহণ দেখেছে—সেই গোড়া খেকে শেষ
পর্যন্ত । আর অন্ধকারকে মনে মনে প্রণাম করে বলেছে—হাঁ, তুমি জিলে
বট। বাপ রে, বাপ রে ! অমন সাক্ষাৎ আগুন—স্থায়কে গব করে গিলে
ফেললে ! তবে ভাগ্যে উগ্রে দাও । সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের কথা মনে
পড়ে, বীর হন্তমান নাকি স্থায়কে বগলে ভরে রেখেছিল ; অবিশ্রি স্থায়র
ভাতে সার ছিল ; তা থাকুক, কিন্তু স্থায় তো বটে । বোশেখ মাসে অজয়ের
বালির আঁচে ধান পড়লে থই হর, মাস্তব্য পড়ে তিন-চারটে কাত ফিরলে
ঝলসে কালো হয়ে যার—বাবা, সেই স্থায় ! মনে মনে সে হয়্তমানকেও
প্রণাম করে । আর ব্রুত্তে পারে, পশ্চিমা পালোয়ানগুলোর জোর কেন
এত বেশী ! ওই মহাবীরের চ্যালা বলে । কিন্তু আজ মা-জীর এ কী হল ?
অন্ধকারের মত আলোকে গিলতে এল, এসে আলোর তেন্তে পুড়ে ছাই হয়ে
গেল নাকি ! মা-জীর চোথে এত জল ছিল কোথায় ! কিন্তু এ যে পাগল
হয়ে গেল !

চকিতে একদিন মনে হয়ে গেল একটা কথা। এ ওই নবীন সন্মাসীর মহিমা।

সন্ন্যাসীর কাছে যে অপরাধ করেছে, কেইদাসী তারই শান্তিতে পাগল হরে গোল। আর তারই মহিমাতে তার সব অন্ধকার কালো কাপড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে গোল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার কেইদাসী বলেও উঠেছে, মণির ছটা দেখে বিষধরের কথা আমি ভূলে ক্যানে হাত বাড়িয়েছিলাম রে! অলে গোল। বিষে আমি জলে গোলাম। তার অর্থ অন্তে কে কী করে তা করো জানে না, কিন্তু তার সঠিক অর্থ কয়ো জানে। সেই কারণেই সেপ্রা করতে এসেছে মাধ্বানন্দকে। প্রতিকার ভিক্ষা করতে এসেছে।

মাধবানন্দ সমস্ত শুনে যে কথা বললেন, সে তার মনঃপৃত হল না। বিশাস হল না। সন্ত্যাসী তাকে ছলনা করলেন! বললেন, না করো, আমি সিম্পুক্ষ নই।

মোহিনীর কথা বলে তার জন্ম সে করণা ভিক্ষা করলে। হার সিদ্ধপুরুষ, ভূমি তো সব জান! তবু তোমার করণা হল না! মোহিনী সভিত্ত

কেইদাসীর মেয়ে কি না এ নিয়ে কয়োরও সম্পেই হয়। সম্পেই হয়, হয়তো কোনদিন অব্সরের ঘাটে সৈই ভোরের বেলা স্থান করতে এসেছিল কেইদাসী, সেই লয়ে এক পদ্মপাতার-উপর-ভাসিয়ে-দেওয়া মেয়ে এসে কেইদাসীর গায়ে ঠেকেছিল। রাধার মত। রাধাও নাকি এক ফুটস্ত পদ্মফুলের মধ্যে জয়ে ফুলের মতই ফুটেছিলেন। মোহিনী তেমনি মেয়ে। মাটির সংসারে ধূলা-মাটিতে এরা মলিন হয় না—হঃথ পায়। ঠাকুর, নবীন সয়াসী তৃমি, পাথর। এতটুকু কয়ণা হল না তোমার ? মায়া হল না ?

করে। জীবনে বোধ করি দীর্ঘনিখাস কথনও ফেলে নি। আজ সে সম্ভবত প্রথম দীর্ঘনিখাস ফেলল। তারপর ফিরল। সন্ধ্যা হরে আসছে। তার আর দেরি করবার উপায় নাই। আগে সে উড়ো কাক ছিল। বাসাছিল না। এখনও তার বাসা নাই, কিন্তু কেইলাসীর আখড়ার ডালে না-বসলে তার প্রাণ ছটফট করে। গাছের তলার মোহিনী পড়ে আছে—পুরাণের গল্পে শোনা, সেই এক অপ্সরার ফেলে-দেওয়া মেয়ের মত। সে মেরেকে শকুনে পাখা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। কয়ো মোহিনীকে আগলার। কেইদাসী সারাবাত্তি উঠানে বেড়ায় ডাকিনীর মত বাট বয়ে।

বর্বর অক্র অনেকটা নাকি সেবে উঠেছে এই ছু মাসে। লাঠি ধরে ঘরের উঠানে বেড়াচ্ছে এবং গালাগাল দিচ্ছে কেলেদের। কেলে বলেছে, মা-জীর ছামনে আমি যাব না ছোট সরকার। তুমি চল, তুমি ছামনে দাঁড়াবে। আমি মোহিনীকে পটাস করে কচিলাউ-টেড়া করে কাঁধে ফেলে চলে আসব। ছামনে আমি যাব না। ও বাবা, কাপড়খানা টেনে খুলে ফেলে দেবে আর আমার খালখানা (চামড়া) চড় চড় করে ছড়া পাঁঠার মত টেনে ছাড়িরে নেবে। বাপ রে!

কথাটা নিথ্যা নয়। তার সাক্ষী জয়দেব-কেন্দুলী যাবার পথের পাশে হেলে-পড়া অলথগাছটা। কেলে ডোমের ঠাকুরদাদা জানত ডাকিনী-বিশ্বা। সে তার এক সাঙাতের সঙ্গে এক প্রিমার রাজে ঠ্যাঙা হাতে বসে ছিল। তথনও কুলীথা নবাব হয়ে বসে নি। ঠ্যাঙাড়ের কাল—ডাকাতি ব্যবসার খুব ফলাও অবস্থা। পথে রাহাজানি দিনের বেলাতেও চলত। কেলের ঠাকুর-দাদার ঘরে তথন তুটো পরিবার, একটা বক্ষিতা। শাহী জোয়ান আর

বিশ্বেতে তেমনি ভাকসাইটে গুণিন। পথে লোক ছিল না। তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। আখিন মাসের ধোয়া-মোর্ছা আকাশ বোক কলায় ঝলমলে চাঁদের আলোয় সে যেন ত্ধ-সাগরে বান ভেকেছে। হঠাৎ একটা সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল আর মনে হল যেন একটা প্রকাশ্ত পাথি পাথা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কেলের ঠাকুরদাদা হেসে বলেছিল, কী বল্ তো?

সাঙাত বলেছিল, তাই তো রে। কী পাথি বল দিনি?

—পাথি নয়। ডাকিনী। গাছে চড়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

সাঙাত বলেছিল, মিছে কথা। সব তোর ধাঁপা। ওই ডাকিনী-বিছে স্ব্রুতোর ধাপ্পাবাজি। কই, কথনও তো পেমান দিস নাই। পাথিকে বলে ডাকিনী।

মদের মুখে গালাগাল হয়ে গিয়েছিল। কেলের ঠাকুরদাদা বলেছিল, তবে দেশ্ শালা। চোথে দেখ্। বলেই হেঁকেছিল মস্তর। বিচিত্র কাণ্ড! বিরাট পাখিটা চলেছিল সোজা তীরের মত পূব থেকে পশ্চিমে। সেটা আকাশে পাক থেতে গুরু করেছিল। যেন ঘুরতে গুরু করল। এবং নামতে লাগল খীরে ধীরে। লাভাত অবাক। পাখিটা যত নামছে তত যেন সত্যিই গাছ হরে উঠছে। ডাল পালা কাণ্ড স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তারপর গাছটা ওই ভাবে হেলে মাটির উপর নামল। একটা ছু-ডালের অশখগাছ। তার ডালের উপর বসে এক উলিজনী এলোচুল রূপেসী মেয়ে। ছুই হাতে মুখ চেকে বললে, নামালে যদি তো লক্ষা রাখ গুণিন। দাণ্ড কাপড়, না হয় গামহাও দাণ্ড একখানা। দাণ্ড—দাণ্ড।

কেলের ঠাকুরদা তথন মেতেছে। দে হা-হা করে হেদে উঠেছিল।
আকাশে চন্দ স্থ্যি দাত তারা। তাদের ছামনে লক্ষ্যানাই, যত লক্ষ্যাটির
ওপর মাস্থবের ছামনে? নাম্, নাম্, গাছ থেকে নাম্। ম্থ থেকে হাত
থোল—চাদ বদনটা দেখি।

নামল মেরেটা, হাতও ধুললে, চোখে যেন জল। মূথে বললে, ওগো, আমি মেরেমান্তব।

সঙ্গের সাঙাত আর থাকতে পারে নি। নিজের গামছাখানা মাথা থেকে খুলে ছুঁড়ে দিরে বলেছিল, এই নাও।

কেলের ঠাকুরদাদা চিৎকার করে উঠেছিল, করনি কী? করনি কী? হাত বাড়িরে ছুঁড়ে-দেওয়া গামছাখানা ধরতেও চেটা করেছিল। কিছ তথন মেয়েটার হাতে গামছা পৌছে গেছে। সঙ্গে সজে জ্যোৎসার ঝলমলে আকাশখানার যেন বিনামেধে বিহাৎ চমকে চমকে উঠল বিহাৎ নর, ওই উলনিনী মেয়েটার থিলখিল হাসিতে।—হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-

ওপারের গড় জঙ্গলের শালবনের পাতায় পাতায় সে হাসি বাতাস তুললে।
নেয়েটা সেই গামছাথানায় দেহটা ঢেকে নিয়েই আবার টেনে খুলে মাথা
পার করে পিছনে ফেল্লে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা পাঠার ছাল-ছাড়ানোর
মত কেলের ঠাকুরদাদার চামড়া কে যেন টেনে ছাড়িয়ে ফেলে দিলে। একটা
ছাল-ছাড়িয়ে-নেওয়া কাঁচা মাংসের পিণ্ডের মত পড়ে গেল সে।

সাঙাতও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ডাকিনী যে গাছটা চালিয়ে এসেছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে আর-একটা গাছে উঠে সেটাকে উডিয়ে আবার আকাশ-পথে উড়ল। গাছটা রইল এখানে ডাকিনী-বিজ্ঞের জন্ধকা হয়ে।—ডাকিনীকে ঘাঁটিয়ো না।

কেলে সেই ভয়ে যায় নাই।

অক্র আক্ষালন করছে: আচ্ছা, আমার ভাল হোক। **অক্রৈ শ্র হায়।** মরণকে ডরতা নেহি। আওরতকো ছোড়তা নেহি।

কয়ো অক্রকে আটকাতে হয়তো পারবে না। কিছ কা-কা শব্দ করে সাবধান করে দিতে পারবে।

কয়ো মাধবানন্দের আশ্রম থেকে ফিরল।

অজয়ের ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল। কিসের যেন শব্ধ উঠছে! নাগারার! হাঁা, নাগারাই তো। হৃম্ হৃম্ হৃম্ হৃম্ ।

কী একটা আসছে! একটা গাছ!

প্র:, সাত-আট হাত উচু একটা মাস্থ। রণপার উপর চড়ে আসছে। বাপ রে বাপ! ডাকাত নয়, মাধবানন্দ গোস্বামীর চর অস্তচর। এ-পারে আশপাশের গ্রামে ইতিমধ্যেই কেশবানন্দের ব্যবস্থায় অনেক লোক আশ্রমের কাজে লেগেছে। কেন্দুলীর মহান্ত মহারাজের পাইক বরকন্দাজের মত ব্যবস্থা। পিছনে বনটার মুখে কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে কে যেন প্রশ্ন করলে, কে আসে ?

রণপার উপর থেকে লোকটা উত্তর দিলে, জর কংসারি ! বন থেকে আবার শব্দ হল, জয় মাধব ! রণপা সওয়ার বললে, জর কেশব !

তারপরেই বললে, আমি পরাণ পাইক। জরুরী খবর আছে। হাতম-পুরের হাতেম থাঁ ফৌজদার ফোত হইছে। হাফেজ থাঁ ফৌজদার হলছে। ঢোঁরা পড়ছে ইলেমবাজারে।

করো চমকে উঠল। মনে পড়ে গেল নবীন গোঁসাইরের কথা। গোঁসাই, তুমি সিন্ধপুরুষ। মুখে না-বললে কী হবে! তুমি এই মাত্র সেই মণিটি ফেরত দিয়ে বললে—এটি বোধ হয় হেতমপুরের হাফেজ খাঁয়ের বিবির। করো, এইটি নিরে সেখানে যাও।

এই তো বললে! এই তো! আবার বল তুমি সিদ্ধপুরুষ নও!

। নবম পরিচেছ্দ ।

মাধবানন্দ দেবতার সন্মুথে গিয়ে ধ্যানে বসলেন।

কৃষ্ণদাসী উন্মাদ হয়ে গেছে। সেই সরলা কিশোরী মেয়েটিকে ধরে নিম্নে যাবে বর্বর অক্রুর! কৃষ্ণদাসীর উপর সেদিন তাঁর অপরিসীম ঘূণা হয়েছিল। তার বেশভ্যা তার চোথের কোণে কালির ছারার মধ্যে লালসাকে প্রত্যক্ষকরেছিলেন তিনি। মনে পড়ে গিয়েছিল বাল্যকালের শ্বৃতি। সেদিন জ্ঞলসত্র নিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তাতে তিনি বিশ্বিত হয়েছিলেন। আজ্ঞ সমস্ত শুনে তাঁর অস্তরে তিনি বেদনা অস্তত্ব করছেন। সেই বেদনাকে বিশ্বৃত হবার জন্তই ধ্যানে বসবেন। ওই বেদনা অস্তত্ব করাণ্ড তাঁর উপলব্ধিমতে ঘূর্বলতা। ওকে প্রশ্বের দিলে সহস্র বা লক্ষ্ক-বাছ আলোকলতার মত জীবন-সাধনার বনম্পতিকে আচ্ছের করে ফেলবে।

নারীর মধ্যে আদিম মহাপ্রকৃতি প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করেন। যিনি পুরুষকে আয়ন্ত করে পরিশেষে গ্রাস করে নিশ্চিন্ত হন, তাঁর কামনা শুধু সৃষ্টির। মহাকালীর ধ্যানে আছে "বিপরীত রতাতৃরাং হব প্রসন্ন বদনাং শ্বেরানন শ্বরারুহাণ।" হাঁা, আদিম নারীপ্রকৃতির স্বরূপ এর থেকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আর হয় না। কিন্তু তার বৃক থেকেই প্রকাশিত হয় চৈতগ্রন্থর, মহা-অগ্রির মধ্য থেকে মহা-জ্যোতির মত। সেই জ্যোতির্ময়কে প্রকাশ করেও তার সান্ধনা নেই। সেই আবার ওই জ্যোতির্ময়কে আচ্ছন্ন করবার জন্ম মরীচিকার পিছনে হরিণীর মত ছোটে। যিনি চৈতগ্রকে প্রকাশিত করে চৈতগ্রের হাদয়ে হ্লাদিনী শক্তি হয়ে অধিষ্ঠিত হন, তিনিই বাইরে এসে রাধা হয়ে চৈতগ্রন্থর পুরুষোন্তমকে আচ্ছন্ন করেন। কিন্তু চৈতগ্রন্থর পুরুষোন্তম সে আচ্ছন্নতা কাটিয়ে চলে যান। রাধা শতবর্ষ বিরহে কাঁদে।

কৃষ্ণদাসীর। রাধা নয়, পুতনা। আর ওই মেরে মোহিনী ? না, কৃষ্ণদাসীদের গর্ভে রাধা জন্মার না। আজও সে স্বরূপ প্রকাশিত হয় নি,
বধন হবে তখন হবে ছলনাময়ী, লাশুময়ী। চৈতক্সকে আচ্ছর করেই
ওর জীবনলীলার সার্থকতা। করুণা করেও ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ো
না সয়্যাসী। ওই তামসী মায়ায় মহাভারতের মহায়জ্জের চরু বিষাক্ত
হয়ে গেছে।

- এ মোহ থেকে মুক্ত কর, হে প্রভু, আমাকে এ মোহ থেকে মুক্ত কর।
- গুরু মহারাজ! বাইরের দরজা থেকে ডাকলেন কেশবানন্দ।

উত্তর দিলেন না মাধবাননা কেশবাননা করেক মুহূর্ত অপেকা করে আবার গলার সাড়া দিয়ে নিজের অন্তিত্বের কথা জানিয়ে দিলেন।

নাধবানন্দ এবার ব্রালেন, সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জ্বপ রেথে প্রণাম করে বাইরে এলেন: কিছু বক্তব্য আছে বলে মনে হচ্ছে কেশবানন্দ।

- হাঁা, গুরু মহারাজ, হাতেমপুরের হাতেম থাঁ ফোত হল। হাফেছ থাঁ ফৌজদার হল।
 - ওপারে কি তারই ঢেঁড়া পড়ছে ?
 - —ই্যা।
- —এক রাজা বিগত হয়, অন্ত জন রাজা হয়ে বদে। ওতে আমাদের কী আছে বল ?
- আরও সংবাদ আছে গুরু মহারাজ। মুরশিদাবাদে নবাব স্থজাউদ্দিন বীরভূমের রাজকর আদায়ের জন্ম ফৌজ পাঠাচ্ছেন। রাজনগরের বাদিওক্ষমান থা করেক বংসর রাজকর বাকী ফেলেছেন। আমাদের আরও একটু সংগঠন প্রয়োজন গুরু মহারাজ।
 - —কী সংগঠন কেশবাননা? সংগঠন বলতে আমি তো বুঝি আত্মসংগঠন।
- —না মহারাজ, আত্মসংগঠনের জন্ত যথন আমরা সংঘের আশ্রয় নিরেছি তথন সংঘসংগঠন না হলে আত্মসংগঠন কখনও সম্পূর্ণ হবে না। আপনি আমা অপেকা বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ। কিন্তু আত্মজ্ঞান এবং সংসারজ্ঞানে কিছু প্রভেদ আছে। একটা আসে জন্মান্তরের পুণ্যে ভগবদ্-কুপায়, অক্টটা আসে শুধু অভিজ্ঞতায়। সেই হিসেবে সংসারজ্ঞান আমার

আছে বলেই বলছি সংঘ-সংগঠন প্রান্তের। আমি জানি, আপনি বাহুবলের শক্তিকে স্কচক্ষে দেখেন না।

—তাই তো কেশবাননা!

চিন্তিত মুখে কেশবানন্দ কথা করেকটি বলে সম্মুখে বিরাট বনস্পতি-শীর্ষের দিকে চেম্বে রইলেন। অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারই মধ্যে মসীকৃষ্ণ বর্ণে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে শালগাছটা। জীবনের প্রথম বিরাট শ্বরূপ ওই বনম্পতি। যত আলোর দিকে সহস্র শাখা বিস্তার করে নিজেকে প্রসারিত করছে উর্ধলোকে উঠছে, তত তার তলায় অন্ধকার ঘন হচ্ছে বিস্তুত হচ্ছে। জীবনের তামসীর বিনাশ নাই। কেশবানন্দ তাঁর ধ্যান-ধারণা সাধনা-তপশু। সত্ত্বেও কঠোর বাস্তববাদী। কেশবানন্দ ৰললেন, গুরু মহারাজ, এক মহর্ষি তাঁর পরমায়ু মাত্র কয়েক কোটি বর্ষ জেনে এবং অনস্ত কালের সঙ্গে তুলনার কয়েক কোটি বর্ধকে নিতাস্তই অকিঞ্চিৎকর উপলব্ধি করে কোন কুটির নির্মাণ না করে মাত্র একটি গাছের পাতা মাথার দিয়ে তপস্তায় বসেছিলেন। কিন্তু পাতাটির আয়ু নিশ্চর কয়েক কোটি বর্ষ ছিল না। স্থতরাং পাতাটিকে নিশ্চর বারংবার বদল করেছিলেন। আমাদের সংঘ সেই পাতাই না হয় হল; কিছু সেটি ষাতে ঝড়ে না ওড়ে, বর্ষায় না গলিত হয়, তার চেষ্টা তো করতেই হবে। ঝড় উঠছে গুরু মহারাজ। হিন্দুস্থানের আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ উঠছে। শুনছি, পারশ্রে মহা অহব তুল্য এক নাদিরশাহেব অভ্যুদর হরেছে। দে নাকি হিন্দুস্থানের দিকে অভিযানে অগ্রসর হবে। মুঘলের কাল গত হতে চলেছে গুরু মহারাজ। নাদিরশাহের আঘাতে দিলির দরবার একাস্ক ভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। দক্ষিণে মারাঠারা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভবানীর বরপুত্র রামদাস-শিগ্র শিবান্ধী মহারান্ধার গড়া শক্তি আৰু ভ্ৰষ্ট। এ সময়ে শুধু নিৰের ৰুগ্ন তপস্থা করতে চান—হিমালয়ে যান। यि धर्मरिक त्रका कतात्र श्राज्ञान मर्सन करतन, जा इरल मिक्स इरज इरत। দিকে দিকে সন্ত্রাসীরা সক্রিয় হয়ে উঠছে। আপনি রাজেন্দর গিরি-মহারাজের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেখানেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা। আপনার মধ্যে জ্ঞান এবং ডেজের সমাবেশ, সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আপনাকে

অন্তসরণ করেছি। নইলে আমি আসতাম না। আজও বসুন, যদি সংকল্পে আপনি তুর্বল হলে থাকেন বা তত্তজানে এ সংসারকে একটি বুজুদই মনে করে থাকেন, তবে আমি স্থান ত্যাগ করি।—একটু ন্তব্ধ থেকে আবার কেশবানন্দ বলেন, আজকের মত উদাসীন বলুন উদাসীন, তুর্বল বলুন তুর্বল—এ তো আমি কোনদিন দেখি নি। মার্জনা করবেন, মনে হচ্ছে আপনি বিচলিত।

মাধবানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, কেশবানন্দ, সত্য গোপন আমি করি না। তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি বিচলিত হরেছি আজ। ওই করে। আমাকে বলে গেল—আমার অভিশাপেই নাকি ইলামবাজারের সেই বৈষ্ণবী, যাকে আমরা বগীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম, যে আমাদের জলসত্র নিয়ে গোলমাল করেছিল, সে পাগল হয়ে গেছে। অস্কৃত লোকে তাই বলছে।

কেশবানন্দ বললেন, আমি জানি ক্লফদাসী পাগল হয়ে গেছে।
আপনার দয়াই তারা ভিক্ষা করতে এসেছিল। আমি পুঝায়পুঝারপে সংবাদ
নিয়ে দেখেছি। আপনাকে দেখে তার পাপপঙ্ক থেকে মুক্তিকামনাই
জেগেছিল। সেই কারণেই ছুটে এসেছিল। হতভাগিনীর জীবনে যা ঘটে
গেছে তার উপার তো আর নেই, উপার খুঁজতে এসেছিল ওই মেয়েটার
জয়া। য়েয়েটি সতাই বড় ভাল। ওর উপর লুর্ক দৃষ্টি ওই বর্বর অক্রের!
যদি বলেন—

চুপ করলেন কেশবানন্দ।

মাধবানন্দ বললেন, চুপ করলে কেন কেশবানন্দ ?

- যদি বলেন তো ওই মা এবং মেয়েকে এপারে আমাদের সীমানার মধ্যে এনে নিরাপদ আশ্রায়ে রেখে দিই।
- না। দৃঢ়ম্বরে মাধবানন্দ বলে উঠলেন, না। বিশ্বসংসারে পাপ এবং পুণ্য-প্রবৃত্তি ত্ইই একই শক্তির ত্ই বিরোধী রূপ। এ বিরোধের মধ্যে সদ্ধির মধ্যপথ নেই কেশবানন্দ। পাপকে মরতেই হবে। ভার পূর্ণ বিল্প্তির মধ্যেই চৈত্যুম্বরূপের মহাপ্রকাশ সম্পূর্ণ হবে। আমাকে ভূল ব্রেছে কেশবানন্দ। তাদের প্রতি আমার কোন করণা নেই। কিছু আমার কোধ

আমার অভিশাপ হয়ে থাকলে আমার পক্ষে বেদনা অভ্ভব না করে উপায় কীবল ? শেষে পিপীলিকা বধ করলাম!

বলতে বলতেই তৃটি বিন্দু জল তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল মৃছে বিষপ্প হেশে মাধবানন্দ আবার বললেন, সংসারে শুধু জায়ে-অক্যায়ে পাপে-পুণ্যেই বিরোধ নয় কেশবানন্দ, তায়ে-তায়েও সংঘর্ষ বাধে। তায়-বিচার আর করুণার সংঘর্ষে চোথে আমার জল এসেছে অনেকক্ষণ। সেই কারণেই এতক্ষণ প্রভুর সামনে বসে বলছিলাম—পথ বলে দাও।

কেশবানন্দ বললেন, ওদের কথা তা হলে থাক্ গুরু মহারাজ। আগুনে ঝাঁপ দিরে যে পতঙ্গ পুড্ছে সে পুড়ুক। অধিল সংসারে মৃহর্তে কোটি প্রোণের লয়। তার মধ্যেই থাক্ ওরা। এখন যা বলছিলাম। আমার বলা শেষ হয় নি। সংবাদ আরও আছে। বাংলা দেশেও শাস্তি আর থাকবে না। নবাব স্থজাউদ্দিন বিলাস এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় প্রায় নিক্রিয় হয়ে পড়েছেন। উজীর হাজি মহম্মদ এই স্থযোগে শক্তি সঞ্চয় করছে। পাটনায় হাজির ভাই আলিবর্দ্ধী ক্রমশ স্বাধীন চালে চলতে শুরু করেছে। স্থজাউদ্দিনের ছই ছেলে—তকীউদ্দিন রাজকার্যে রাজনীতিতে পারক্রম; সরফরাজ—বিচিত্রচরিত্র।

মাধবাননদ বললেন, জানি। হাজার-নারী-বেষ্টনীর মধ্যে দিন যাপন করে। তারা নাকি স্থী! কোন স্থীর মাথা ধরলে কোরাণ-মাথার ত্পহর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকে, তবুও অনেকে বলে সে সাধক।

ব্যক্তাশু করে মাধবানন্দ কথা শেষ করলেন।

- —তকীর সঙ্গে সর্ফরাজের বিরোধ বাধিরে হাজি আহম্মদ অবিচার করে তকীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। মারণ-যাগ করেছিল, তকীর মৃত্যুতে হাজি প্রান্ধ নিষ্কণ্টক। বাংলার আকাশেও ঘনঘটা উঠছে; দিগস্তে বিদ্যুদ্ধমক বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহারাজ। আমাদের শক্তি সংগ্রহের প্ররোজন আছে। এবং—
 - —থামলে কেন, বল ?
 - —আমি কিছুদিনের জন্ম ঘুরে আসব।
 - —ঘুরে আসবে ? কোথায় ?
 - —গোকুল পর্যন্ত।

- গিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাবে ?
- —ইয়া মহারাজ।
- —তার নির্দেশ ?

হেসে কেশবানন্দ বললেন, নির্দেশ একমাত্র আপনার হতে পারে। পরামর্শ-উপদেশের জন্ম যাচ্ছি। কোনও চিস্তা আপনি করবেন না। আমি অন্ত সকলকে, বিশেষ করে—

—তোমরা কি সকলে একই অভিপ্রান্তে আমার শিক্সত্ব গ্রহণ করেছিলে কেশবানন্দ ?

क्यानम हुश करत ब्रह्मान।

— আমি ব্রুতে পারি নি, তুমি ·আমার অসুমানের চেয়ে অনেক বেশী চতুর কেশবানন্দ।

একটু শুদ্ধ থেকে আবার বললেন, কিন্তু ও-খেলার দেশ জাগবে না কেশবানন্দ, দেশের ধুলো উড়বে। হয়তো প্রচণ্ড ধুলোর বিরাট আবর্ত। মনে হবে মাটি বৃঝি জেগে উঠে মাথা তুলে আকাশ ছুঁতে চলেছে, কিন্তু ক্যেকদিন পরেই নেমে আসতে হবে আবার সেইখানে।

কেশবানন্দ তবু কোনও উত্তর দিলেন না।

— যাক ওসব কথা। কিন্তু গুরু যেখানে শিশ্বদের সাধনার মার্গ সম্পর্কে বিশাস করাতে পারে না, সেখানে সে গুরু হিসাবে ব্যর্থ। আমি ব্যর্থ হয়েছি কেশবাননা। তোমরাই আমাকে মুক্তি দাও।

কেশবানন্দ এবার বললেন, আপনার শাস্ত্রবিচার-উপলব্ধিতে আমি সম্পূর্ণ বিশাসী গুরু মহারাজ। আমি মৃশ্ব হয়েই আপনার শিশুত্ব গ্রহণ করেছি। হরতো আপনিই নৃতন উপলব্ধিতে উপনীত হরেছেন। আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারছি না। আপনি যেদিন শিশু গ্রহণ করে মঠ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেই দিনই তো নিজের মৃক্তি ছাড়া আরও মাম্লুযের মৃক্তি চেয়েছিলেন। বাংলা দেশে এই বৈষ্ণুব ধর্মের বিক্বৃত পরকীরা-সাধনের গতিরোধ করতেই তো এখানে এসে আশ্রম তৈরি করতে আরম্ভ করেছেন। এখন রাজনৈতিক হুর্ঘোণ যদি ঘনিরে আসে, আসে কেন—আসছে গুরু মহারাজ, তা হলে যে জীবনের সর্বত্র তার আঘাত এসে লাগবে। আত্মরকা

প্রথম ধর্ম। অরাজকতা বিশৃষ্থলার মধ্যে রাজ্ঞা যে হবে—দে যত দিনের জন্মই হোক, লোক শোষণ করতে শুরু করবে। দস্যতার প্রাত্ত্র হবে। ত্ঃসাহসীরা দস্যতার সাহায্য নিয়ে রাজ্ঞা হতে চাইবে। ব্যাভিচারীর উৎপাত হবে। এখানে অভ্যুদর হবে ওই বর্ধর অক্রুর দাস-সরকারের।

অরাজকতার মধ্যে অত্যাচারীর অভ্যুদয় হয়—অত্যাচারের মধ্যে তাঁর অভ্যুদয় ঘটে মাস্থরের বুকে কেশবানন্দ। আমি তো তাই চেয়েছিলাম মাস্থরক জাগাতে। মাস্থরক চালাতে নয়। তুমি বছকাল রাজকর্ম করেছ। তুমি তীক্ষবৃদ্ধি, অতি সংযতবাক্, কিন্তু তার মধ্যে থেকেও তোমার গোপন উদ্দেশ্য অন্ধকারে স্থাপদ-দৃষ্টির অগ্নিচ্ছটার মত চকিতপ্রকাশে দেখা দিছে। রাজেন্দর গিরি মহারাজের কাছে যাবে বলছ। আমিও তার সঙ্গে আলাপ করেছি। বল তো তিনি সন্ধাসধর্মে কি আজও স্থির আছেন? অথবা ভ্রই হয়েছেন? অর্থ দিয়ে অযোধ্যার নবাব ডাকছে। তিনি তার হয়ে য়্ম্ম করতে ছুটছেন, তার অর্থে ক অর্থ দিয়ে ডাকছে দিলির উজির—তিনি নবাবকে ছেড়ে ছুটছেন তার হয়ে লছাই করতে। সাবধান কেশবানন্দ, সাবধান। সন্ধ্যাসীর হাতে রাজদণ্ড এলে সন্ধ্যাদের অপমৃত্যু এবং গৃহীর অকল্যাণ। ভেবে দেখাে কেশবানন্দ, তারপর ঝাঁপ দিয়ে। ওতে ঝাঁপ দিলে আর ফেরা যায়না। কয়েকদিন চিন্তা করে আমাকে উত্তর দিয়ো, গোকুলে যাবার দিন স্থির কোরো।

বলে আর দাঁড়ালেন না। কথা বাড়াতে চাইলেন না বোধ করি। আবার ঘরের মধ্যে চুকলেন।—হে যাদবোত্তম, হে পুরুষোত্তম, হে কংসারি, পথ দেখাও। স্থির রাগো আমাকে।

কেশবানন্দ কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন। ভামরূপার গড় জঙ্গলে রাত্রি নেমেছে। আষাঢ়ের শুক্লা-তৃতীয়ার চাঁদ অনেকক্ষণ অন্ত গেছে। তার উপর আকাশে মেঘ। আদ্ধানর যেন স্চাভেত্য। অরণ্যমর শুধুলক্ষ কোটি পতঙ্গের একটানা আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে চলেছে, এ ধ্বনিবৈচিত্র্য না-শুনলে বুঝা যায় না। জলপ্রপাতের শব্দ বেমন অবিরাম—একহরে বাঁধা, এ ধ্বনিও তেমনি। তবে এতে একটি সঙ্গীতের রেশ আছে। এ ধ্বনি যে জড়প্রকৃতির ধ্বনি নর, জীবনপ্রকৃতির ধ্বনি। এ ধ্বনি তো শুধু বস্তুর সংঘাতে উৎপন্ন নর, এ ধ্বনির মধ্যে জীবনের অভিপ্রায়ের প্রকাশ আছে। কিন্তু কেশবানন্দের চিন্ত এই দিকে আরুষ্ট হরার নয়। তাঁর চিন্ত আপন লক্ষ্যে, আপন সংকল্পে অধিষ্ঠিত।
*তিনি ডাকলেন, খ্যামানন্দ!

অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন শ্রামানন্দ।—আমি আপনার অপেকাতেই এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি।

কেশবানন্দ বললেন, শুনলে সব ?

- । আপনি কি—
- —না। আমার সংকল্পে আমি স্থির আছি। এই বিধর্মীর রাজত্ব ধবংসের এত বড় হুযোগ গেলে আর আসবে না। যারা আমার সর্বনাশ করেছে তাদের সর্বনাশ আমি করব। ঘর গেছে, সংসার গেছে—আমার সব গেছে এদের হাতে। সন্ন্যাস নিতে গিরেছিলাম সাময়িক বৈরাগ্যের বশে, সন্ন্যাসে শাস্তি পাই নি। প্রতিহিংসার কামনা আমার বুকে জ্বলছে। তারই তাড়নায় এই সংকল্প নিয়ে ফিরে মঠে মঠে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু মনের মত স্থান পাই নি। হঠাৎ এঁকে দেখে—। থাক সে সব কথা শ্রামানন্দ, ভূল আমার হয়েছে। কিন্তু পরিশ্রম পণ্ড হয় নি। প্রয়োজন হলে সব আরোজন নিয়ে একদিনে চলে যাব এখান থেকে। কিন্তু মুরশিদাবাদের লোক এখনও এল না কেন ? আসা তো উচিত ছিল। স্ক্লাউদ্দীনের বীরভূম-অভিযানের সংকল্পের কথা সে তো আজ সাত দিন পূর্বের সংবাদ। এর পরের লোক এখনও এল না কেন ?

কিছুক্ষণ চিস্তামগ্ন থেকে বললেন, কাল তুমি কাউকে ইলামবাজারে পাঠিয়ে ওই কৌয়া বৈরেগী বলে উস্থ লোকটাকে এখানে স্থানবার ব্যবস্থা করতে পার ?

- —তাকে নিয়ে কী হবে ?
- —প্রয়োজন আছে। আমরা মুরশিদাবাদে মোক্তার রেখেছি। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্ম চর রেখেছি। কিন্তু ঘরের দোরে—নদীর ওপারে কোন সংগঠন করতে পারি নি। এ লোকটাকে একটু চতুর করে তুলতে পারনে

এর চেয়ে ভাল শুপ্তচর আর হবে না। আমাদের প্রাচীনকালে ভিক্ক শ্রমণ নটী বাজিকরের ছদ্মবেশে শুপ্তচরেরা সংবাদ সংগ্রহ করত। এ লোকটা স্ভাবে ভিক্ক, এবং লক্ষ্য করেছি সংবাদ-সংগ্রহেও এর একটা আশ্চর্য রকম নিপুণতা আছে এবং আশ্চর্য রকমে লোকটা চুপ করে থাকতে পারে। কোন কিছু শুনেই ওর মুখভাবের কোন পরিংর্তন হয় না। লোকটাকে কাল একবার হাতেমপুরে পাঠাব আমি। ভোরবেলা কাউকে পাঠিয়ে দেবে। অবশ্রই ব্রুতে পারছ আমাদের আশ্রমের কোন সেবককে নয়, কারণ ওই বর্বর অক্রুরের অম্বচরের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে। গ্রামের কাউকে পাঠিয়ে দেবে।

একটা নিশাচর পাথি প্রহর ঘোষণা করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও আনেক পাথি সাড়া দিলে। অজয়ের তটপ্রাস্ত থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। নিঃশন্ধ বনভূমির মধ্যেও যেন একটা চাঞ্চল্য বয়ে গেল।

কেশবানন্দ বললেন, রাত্রি দিপ্রহর হয়ে গেছে। আজকের মত বিশ্রাম কর।

উঠানে নামলেন তিনি। মৃত্ অথচ গন্তীর কঠে আবেগময় শ্লোক আবৃত্তি করছেন মাধবানন্দ। কেশবানন্দ হাসলেন। পরক্ষণেই চোগ জ্বলে উঠল তাঁর। মন প্রকৃতিধর্মে আকাশবিহারী। কিন্তু মন যথন ভূলে যায় যে, তার মনকে বহন করছে যে বস্তুমর দেহ, সে দেহ দাঁড়িয়ে আছে মাটির উপর, তথনই মন মাটির কথা ভূলে গিয়ে আকাশ-বিহারে ওড়ে—সে ওড়ার নিংশেষিত করে নিজেকে। তারপর ক্লাস্ত নিংশেষিতশক্তি পাথা তৃটি আপনি একসময় ভগ্নপক্ষের মত নিজ্জিয় হয়ে পড়ে, আছাড় থেরে এসে পড়ে সে সেই মাটির উপর; মহাপ্রকৃতি ব্যক্ষ হাসি হাসেন—ভগ্নপক্ষ পাথির দেহের মধ্যে তার আকাশবিহারী মন অসহায় ভাবে কাঁদে।

তাকিন্ধে রইলেন স্বাকাশের দিকে। ওটা কী?

মেঘাচ্ছন্ন আন্ধ্রকার রাত্রের বনভূমির মাথায় একটা উভাত শূলের মত ত্তি কী?

পরক্ষণেই একটা রাজিচর পাথি কর্কশ কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করে পাখা

ঝাপটে এসে শূলটার উপর বসে ডাকতে লাগল—ক্যা—চ। ক্যাচ—ক্যা—চ। ওঃ! ওটা ইছাই ঘোষের দেউলের চূড়াটা! গভীর চিস্তামগ্নতার মধ্যে এই মন্দিরপ্রান্ধণে দাঁড়িয়ে তিনি মন্দিরটিকেই ভূলে গিয়েছিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় কয়োকে নিয়ে লোক ফিরল। ভোরকো গিয়েও লোকটি কয়োকে পায় নি। তার আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল তার অভ্যাসমত। অন্ধকার থাকতেই কাকে বাসা ছাড়ে, কয়োও তাদের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বের হয়। ঘর তার নেই। কয়ো বলে—আমি কয়ো, বাসা বাঁধি না। ভালে রাত কটাই গো। অর্থাৎ পরের ঘরের দাওয়ায় কিংবা ছাঁচতলায় শুয়ে পড়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়। ইলামবাজারে মা-জীর আথড়ার আনাচে-কানাচেই কাটে। মা-জীর এই রোগ বা সিদ্ধাই যাই হোক। তারপর থেকে সে আথড়ার ভিতরেই থাকে। থাকে মোহিনীর জন্মে। সন্ধ্যা হয়ে আসে আর মোহিনীর মৃথ শুকিয়ে যায়। সামনে চার-প্রহর রাত্রি। মোহিনী বলে, কেমন করে কাটবে কয়ো?

করো বলে, কাটবে, ঘুমিয়ে গেলে। তুই থেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়।
সকালবেলা কা-কা করে তোকে ডেকে তবে আমি বেরুব। আমি রইলাম।
আরু না যদি ঘুমোস তবে চার-পহর রাত মনে হবে জীবনে আর পোয়াবে
না। তোর কোনও ভর নাই।

- —রাতে যদি ছোট সরকারের দানোরা আসে?
- —আসবে না। তাদের পরাণের ডর আছে। লোকে জানে মা-জী ডাকিনী সিদ্ধাই পেয়েছে। রাত্রে মা-জীর বাট বয়। বাট বওয়া দেখলে তংক্ষণাৎ মিত্যু।

এবার তার হাত হটে। চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মোহিনী বলে, স্মামি যদি দেখে ফেলি করে। ?

- ঘুম্বি যখন, তথন দেখবি কী করে? আমি তোর মাথার হাত বুলিয়ে।
 ঠিক ঘুম পাড়িরে দোব।
 - -- যদি ঘুম ভেঙে বায় ?

- —উঠবি না, চোথ খুলবি না, কিটিমিটি করে চোথ বুজে পড়ে থাকবি!
- ওবে, তা যে পারি নারে, মা কী করছে না দেখে যে খির থাকতে পারি নারে। আমি যে সব ভূলে যাই।
 - —তা হলে তু দেখেছিদ ?
 - ---হাা।
- —তবে আবার কী? দেখেও তো তুমরিস নাই? তবে তোর ভয় কী?
 একটু চূপ করে থেকে এবার কয়ো তাকে বৃঝিয়ে বলে, এ মা-জীর সিদ্ধাই লয়
 মোহিনী; এ তোর মায়ের ব্যাধি। মায়ের তোর মাথা খারাপ হয়েছে।
 মা-জী ক্ষেপেছে। মোহিনী, এ তোর মায়ের—ওই সিদ্ধপুরুষ নবীন সয়্যাসীর
 কাছে অপরাধের ফল।

মোহিনীর চোথের সামনে পুরনো ঘটনাগুলি ভেসে ওঠে। সে হতাশার বেদনায় আকুল হয়ে শৃগুদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘটনার পর ঘটনা তার চোথের সামনে ছবির পর ছবির মত জ্কেসে যায়। সে সঠিক ব্রুতে পারে না অপরাধটা কোথায়? কিন্তু অপরাধ যে হয়েছে তাতে তার সন্দেহ থাকে না।

र्ह्मा दन तत्न, करता, व्यामारक जूहे निरम हन्।

- , —কোথা ?
- ওই নবীন সন্ন্যাসীর দরবারে। আমি তাঁর পা ত্টো চেপে ধরে মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলব—ঠাকুর, দয়া কর, কমা কর।

শিউরে উঠে কয়ো বলে, খবরদার মোহিনী। মা তোর ক্ষেপেছে, তুই হয়তো মরেই যাবি।

- —কেনে কয়ো?
- ওরে, আগুন—নবীন সন্ন্যাসী জলস্ত আগুন, ওর দিকে হাত বাড়ালে হাত পুড়ে যায়। তোদের ছুঁতে নাই, সামনে যেতে নাই, কখনও যাস নে। তোর মায়ের অপরাধ তো সেইখানে।

অবাক হয়ে যায় মোহিনী। অপরাধ সেইথানে! সে ব্রুতে পারেনা।

—কেনে করো? তাতে কী অপরাধ? কই, কোন দেবতা তো তাতে

রাগ করেন না রে। দেবতা দ্রের কথা, সব দেবতার সার যিনি, যিনি ভগবান গোবিন্দ, মদনমোহন শ্রাম তিনি যে ভজাধীন রে! বৃন্দাবনে—রাধার—

— চুপ কর্ মোহিনী। ওসব ভূলে যা। নবীন সন্ন্যাসীর যত রাগ রাধার উপর। ওর সাধন-ভজন সব হল, যেখানে যত রাধা আছে সব বেসজ্জন দেবে। থবরদার, ওর পা ছুঁতে যাস না। ছামনে যাস না। তোর মা পাগল হয়ে গেল, তু হয়তো পাথর হয়ে যাবি।

শিউরে উঠেছিল মোহিনী। ভর আতত্কে বোবার মত শুধু দৃষ্টি বিকারিত করে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু সে দৃষ্টির সন্মুথে পৃথিবীর কোনও কিছুই ছিল না। ছিল অন্ধকার, একটা কালো পর্দা যেন চোথের সামনে সমস্ত কিছুকে ঢেকে টেনে দিয়েছে কেউ।

সেদিন অর্থাৎ রথের দিনই রাত্রিবেলায় এই কথাগুলি হয়েছিল। রাত্রে মোহিনীও ঘুমোও নি—কয়োও না। মোহিনী ভেবেছিল নবীন সয়াসীর কথা।—এমন মাস্থ্য এমন পাষাণ কেন? পাষাণ নয়, এমন আগুনের মত জলে কেন? মাস্থ্য যদি আগুনের মত জলে, তবে অপর মাস্থ্য তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কেমন করে? শাম তো শুনেছে—নবজলধর। সে জল দেয়, ছায়া দেয়। পাপ়ী তাপী সবারই ত্য়া নিবারণ হয়—তাপিত অঙ্গনীতল হয়। শাম নবজলধর বলেই তো তার নামে শুয়তক ম্য়রে—মরাগাছ বেচে ওঠে, পাতা গজায়, ফুল ফোটে। শাম যদি আগুন হত তবে সব যে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। হায় নবীন গোঁসাই, তুমি এমন আগুনের মত জলম্ব কেন?

কয়ো সারারাত ঘুমোয় নি—মোহিনী এবং মা-জীর জন্ম তুর্ভাবনায়।

মা-জীর জত্যে তুর্ভাবনা শেষ হবে কবে এবং কী ভাবে? ক্লফদাসী তথন অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় আথড়ার উঠানমন্ত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার হা-হা করে কেঁদে আছড়ে পড়ছিল। আবার কিছুক্ষণ পর উঠে ঠাকুর-ঘরের মধ্যে ঢুকে বিগ্রহের পা ছটি ধরে পড়ছিল। আবার বেরিয়ে এসে পরিক্রমা শুরু করছিল; অবিশ্রাস্ত পরিক্রমা। এ ক্লফদাসীর নিত্যকর্ম। এর জন্ম অবশ্র ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু ক্লফদাসী যদি কোনদিন বিগ্রন্থ টেনে এনে আছড়ে ফেলে? তারও একটি শহা ক্ষোর আছে।

দেই আশহাই তার সব চেরে বড় আশহা। মধ্যে মধ্যে মা-জীর চোথের দৃষ্টির মধ্যে একটা যেন কী দেখতে পায়। তার ভর হর। তার ধারণা এই দৃষ্টিতে মা-জী যথন তাকায়, তখন তার মনের মধ্যে খুন থেলা করে। মনে হর, হয় মা-জী মারণ-ধাগ করে নবীন সন্মাসীকে মেরে ফেলবার কথা ভাবছে, নয় ভাবছে বর্বর অক্রেরকে 'বাণ' মেরে শেষ করবার কথা, নয় ভাবছে মোহিনীকে মেরে ফেলবার কথা। মোহিনীকে মারতে যাগ করতে হবে না, 'বাণ' মারতে হবে না, গলা টিপে ধরলেই হবে। মধ্যে মধ্যে আখড়ার মধ্যে ছাগলের বাচ্চা ঢুকে পড়ে চিৎকার করে, মা-জী তাড়া করে ছুটে যায়, ধরতে পারলে গলা টিপে ধরে আখড়ার দরজা দিয়ে বের করে পথে আছড়ে ফেলে দেয়। কখনও কখনও আছাড় মেরে ফেলে দেওরার পর নিজের গলাটা টিপে ধরে। কোনদিন মোহিনীকে গলা টিপে মেরে ফেলে যদি নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরে!

মা-জী অবশ্য মরলেই ভাল। থালাস। সেও থালাস পাবে, সংসারও পাবে। কিছু মোহিনীকে তো মারতে দিতে সে পারবে না।

গতরাত্রে ঘরের ছাঁচতলায় বসে চুলছিল কয়ে। হঠাং ঘুম ভেঙে
গিয়েছিল তার একটা শব্দে। হঠাং সশব্দে যেন আথড়ার বাইরের দরজাটা
খুলে গিয়েছিল। চমকে উঠেছিল কয়ে। কে? কে? আথড়ার খোলা
দরজাটার ওপারে কে যেন বেরিয়ে গেল! কে? কয়ে। ধড়মড় করে উঠে
চারিদিক দেখেছিল। আঁগারের শুক্লা-দিতীয়ার অন্ধকার রাত্রি। আকাশে
মেঘ। তব্ও অন্ধকারে অভ্যন্ত চোখের সামনে আথড়ার উঠানটা প্রার ম্পষ্ট
হয়েই ভেসে উঠেছিল। কই, মা-জী কই? ছুটে গিয়েছিল দেবতার ঘরের
দিকে। সেখানেও মা-জীকে পায় নি। এবার সে ছুটে খোলা হয়ার অতিক্রম
করে পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল।

চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল—মা-জী! ঠিক সেই মুহুর্ভেই কৃষ্ণদাসীর থিল-থিল হাসির শব্দ শুনে ডাকা আর হয় নি, ছুটে এগিরে গিয়ে শুন্তিত হয়ে গিরেছিল। সে এক ভয়ন্বর দৃশ্ম! ভয়ন্বরই বটে! কৃষ্ণদাসী কাপড় ছেড়ে ফেলে দিয়ে উলন্ধিনী হরে দাঁড়িরে হাসছে—হি-হি-হি! হি-হি-হি—হি-হি-হি! আর মধ্যে মধ্যে বলছে—মর্ মর্, মৃথ দিয়ে রক্ত তুলে

মর্। ঝলকে ঝলকে বক্ত উঠে মর্। গল্ গল্ করে বেরুক বক্ত। হি-হি-হি-হি-হি! আর তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক থর থর করে কাঁপছে। তাকে চিনতে কয়োর দেরি হল না। সে অক্রুরের অম্বচর। কেলের শাগরেদ। একেবারে কাঁচা জোরান। কেলের চেয়েও হু:সাহসী। কেলে মা-জীর ডাকিনী-মন্তের ভয়ে আথড়ায় উকি মারতে আসে না। এই হু:সাহসী কাঁচা জোরানটা কেলের উপরে নিজের আসন করে নেবার হুরাকাজ্জার বোধ করি রাত্রে এসে উকি মেরেছিল। মা-জী বুঝতে পেরে বেরিয়ে এসেছে। অথবা হয়তো আকম্মিক ভাবেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। মূহুর্তে কয়ে। মা-জীর পরিত্যক্ত কাপড়খানা কুড়িয়ে মা-জীর দেহের উপর কোন মতে জড়িয়ে দিয়ে মা-জীর সামনে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল—মা-জী! মা-জী! মা-জী!

সেই মুহুর্তে পিছন থেকে অন্ধকার চিবে আর-একটি আর্ত করুণ কণ্ঠস্বরের ডাক ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—মা-গো! মা—

মা-জী চেতনা হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

পিছনের লোকটা এই অবসরে ছুটে পালিয়েছিল।

মোহিনীকে নিয়ে কোন রকমে টেনে হিঁচডে মা-জীকে আথড়ায় এনেছিল, জ্ঞানও হয়েছে। মা-জী কিন্তু যেন তন্ত্ৰাচ্ছয়ের মত পড়ে আছে। সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কয়ো মা-জীর এ অবস্থার জন্ম চিস্তিত হয় নি। কইমাছের পরানের মত শক্ত মা-জীর পরান, ও সহজে যাবার নয়, যাবে না। গেলেও থালাস পাবে। কিন্তু চিস্তিত হয়েছে মোহিনীর জন্মে। বর্বর অক্রুরের ওই কাঁচা জোরান প্রেত অম্বচরটা তো পালিয়েছে, সে যথন ওই মৃতি দেখেও মরে নি—যথন সামলে নিয়েছুটে পালিয়ে যেতে পেরেছে তথন তো মরবে না। তার মানে, সর্বনাশ। প্রেতের যথন ভয় তেঙেছে তথন তো আর মোহিনীর পরিত্রাণ নেই। এই বর্বরগুলো যথন ভয় করে তথন সে ভয় মারাত্মক, কিন্তু ভায়েল এরা হয়ে ওঠে আরও মারাত্মক। তাই ভোরবেলা, কাককোকিল বাসা ছাড়বার আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। ফিরেছে অপরাত্মে। ফেরার পর আশ্রমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কেশবানন্দ তার জন্ম চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়ো অবাক হয়ে গেল। যেন থানিকটা সন্দেহ হল তার। চতুর কেশবানন্দের তা ব্ঝতে ভুল হল না। এ সন্দেহ যে কয়োর হতে পারে—এ অহমান আগে থেকেই তাঁর ছিল। তব্ও এই ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি এই ভেবে যে, সন্দেহ ঘুচিরে দিতে পারলে এর ফলাফল অব্যর্থ। কেশবানন্দ করোর সন্দিয়্ম দৃষ্টির সন্দে নিজের দৃষ্টি স্থির রেথে হেসে বললেন, গুরু মহারাজের এই আদেশ।

তারপর বললেন, তাঁর ধারণা দামোদরের ক্ষার কিছুটা তোমার উদরে বাসা গেড়েছে। মাস্থের ক্ষা কিছুটা পেলেই মেটে। দামোদরের ক্ষা পেট পুরে থেক্বেও মেটে না। তাই বললেন, ওকে কাল ক্ষা মিটিক্বে খাওয়াও তো। ব'স তুমি।

কথাগুলি কয়োর ভালই লাগল। বেশ ভাল ভাল কথা। আর অকাট্য। তার ক্ষিদে এবং পেটের ফাঁদে আর দামোদর নদের ক্ষিদে আর পেটের ফাঁদের সঙ্গে সভ্যি মিল আছে। এ কথা, এ সভ্যা সিদ্ধপুরুষ বলেই গোসাঁই বুঝেছে। কিন্তু তবু সে চুপ করেই দাঁড়িরে রইল। মাথা চুলকতে লাগল। হে ভগবান, এ কী বিপদে ফেললে!

কেশবানন্দ বললেন, ব'স, ব'স। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? হাত জোড় করে কয়ো বললে, আমাকে পরীকা করছ গোসাঁই ?

- —না না, পরীক্ষা কিসের ? ব'স তুমি। এর মধ্যে কোন পরীক্ষা নেই।
- —তবে গোসাঁই, খেয়ে যে কয়োর কখনও পেট ফাঁপে না—তার পেট নাগরার মত চং চং করে বাজনা দেয় কেনে? গলার গলার অফল কেনে? কী গরম-মসলার গরমে বুক গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে! পরানটা শুধু জল জল করে সারা হল।
 - —গরম-মদলা ? গরম-মদলা দেওয়া খাবার কোথায় থেলি ?
 - --- হাতেমপুরে। ফৌজনার-বাড়িতে। সেথানে গিয়েছিলাম আজ।
 - —হাতেমপুরে ? ফৌজদার-বাড়িতে ?
- —আজ্ঞে হাঁা, দের তুই তিন হাল্প আর ম্যাও; সেও সের ট্যাক হবে। পেট ফেঁপে উঠেছে। আইটাই করছে।

- --- जूरे मूननमान-चरतत উচ্ছिष्ट थ्या थिन ?
- —উচ্ছিষ্ট লয় গো। আদর করে ব্যাগম সাহেব পাতা পেড়ে থাওরালে।
 তার হারানো নীল হীরেটা আমি নিরে গিরেছিলাম তো! ফোজদার তো
 দেখে 'বিদ্মিল্লা ইরে আলা' বলে পেরার নাপিয়ে উঠল। বলে—তোর
 মাফিক সাচ্চা আদমী নেহি দেখতে পাতা হার। বলে—কী বসকিস্ লিবি?
 টাকা লে—মোহর লে—জমি লে। আমি বলি—না। বসকিস্-টসকিস্
 আমি চাই না। আপনি একটা উপক্লার করেন। আপনি ফোজদার, এ
 মূলুকের দণ্ডমূণ্ড্র মালিক। এক বদমাসের অত্যেচার থেকে একটি অনাথা
 বালিকাকে রক্ষে করেন। সেই মোহিনী বলে মেরেটা গো। এবার আর
 তার অকুরের হাত থেকে নিছিতি নাই। মা-জীর ডাকিনী-মন্তর সিদ্ধাই এসব কথার কথা, বাজে কথা, তা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। নবীন গোসাই
 সিদ্ধপুরুষ, উনিই আমাকে কাল বলেছিল—তু যা কয়ো, ফোজদার হাফেজ
 খাঁর কাছে যা, কাষ্যসিদ্ধি হবে। এই নীল হীরেটা তুই কুড়িরে পেয়ে আমাকে
 রাখতে দিয়েছিস, এটা তাদেরই, এটা নিয়ে যা; দেখাবি; দেখালেই কায্যসিদ্ধি হবে। তা হয়ে যাবে। ঠিক হবে। তেক গটি জল থাব।

কয়োর বুক আবার শুকিয়ে উঠেছে।

কেশবানন্দ ভামানন্দকে বললেন, খানিকটা হজমী দাও জলের সঙ্গে; আকণ্ঠ পুরে পেটুকটা হালুরা আর মেওয়া ফল খেয়েছে।

হাল্লু আর ম্যাও যে হালুরা আর মেওয়া, এ ব্রতে কেশবানন্দের কট হয় নি।

কয়ো বললে, করব কী বলেন ? ফোজদার হীরেটা নিয়ে ভেতরে গিয়ে ছকুম করলে—নিয়ে আয় ব্যাটা বোরেগী ভিথেরীকে। ব্যাগম দেখবে তাকে, আর নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াবে। আর তারই কাছে বলতে হবে ওই মোহিনীর কথা। মেয়েছেলের কথা যে! আর লবাবী ফোজদারী অন্দর যে! যা করবার ব্যাগম করবে। তা—

ভামানন্দ এক ঘটি জল আর একটি হজমী বটিকা নিয়ে এসে দাঁড়াল। করো ব্যগ্র ভাবে অঞ্জলি পাতলে: দাও।

—আগে এই বডিটা গলায় ফেলে নে।

করো একটা দীর্ঘনিশাস ফেলে বললে, পরানটা আইটাই করছে আর তেষ্টা পাচ্ছে—নইলে ঘি-গরমমসলার খুশবুইটা বড় ভাল উঠছে গোসাঁই। না-হলে তো এতক্ষণ কোন্কালে কয়ো গলায় আঙুল দিয়ে সব উগরে দিয়ে থালাস হত। হজম হলে তো খুশবুইটাও আর উঠবে না।

করোর দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠল। পরক্ষণেই বললে, না, দাও। এগুলো থেতে হবে তো। দাও।

বড়ি এবং জল খেয়ে গোটা ছই বড় ঢেকুর তুলে বললে, বুঝেছেন গোসাঁই, এ ফোজদার আর সব আমীর কি খাখ জমিদারদের মত নয় গো। ওই এক ব্যাগম নিরেই ঘর সংসার। ব্যাগমের পেতাপ খ্ব। ছজ্জনার মধ্যে খ্ব ভালবাসা। বললে—আমিনা পেরারী, এই এর কাছেই শোন সেমেরের কথা। শুনে যা করবার কর।

কেশবানন্দ চমকে উঠলেন। ভুক ছটি কুঁচকে উঠল তাঁর। বললেন, কী ? কী বলে ডাকলেন ফৌজদার ? আমিনা ?

—ই্যা। আমিনা পেয়ারী।

আমিনা! আমিনা! মথুরার ঘাটে বাদশাহ-বংশের এক ব্যভিচারী সস্তানের কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কেশবানন্দের। আমিনা! সে হারানো মেয়ের নামও আমিনা। ওসমান নামক এক ওমরাহপুত্তের সঙ্গে পালিয়েছে।

কয়ে। বললে, তা ব্যাগমও লোক ভাল। আমাকে হাল্ল্-ম্যাও থেতে
দিয়ে বললে—তুখা, হামলোক সমঝ করে দেখি। খুব খুবস্থরত লেডকী?
আমি বললাম—ঝুট বলব না; খুবস্থরত বটে ব্যাগম সাহেব। তবে সে
কি আপনকাদের মতন? এমন রঙ কোথা পাবে? রূপের ত্যাক্ত কোথা
পাবে? এই ছাশের লেডকী তো, সছা পাক-ধরা ধানের মতন, মানে
গোরো রঙ হলেও সবুজ সবুজ আভা, এই আর কী! আর বড়া ঠাগু।
তেমনি নরম। কথা বলতে বলতে কয়ে। পর পর গোটা চারেক বড় বড়
উনগার তুললে—হেউ—হে—উ হে—উ—হেউ।

কেশবানন্দ বললেন, তারপর?

कर्या शांख वाष्ट्रिय भारमम धूरना निरम वनरन, आः, वांहारन बांबा

গোসাঁই। আঃ! সব ইেটিয়ে গেল চার ঢেকুরে। আঃ, আর হুটো ঢেকুর উঠলে তো পেটের নাড়িভূঁড়ি হজম হয়ে যাবে গোসাঁই।

- —থাবার তো প্রস্তুত রয়েছে রে; ভোজনে বসে যা। থা আর বল, তারপর কী হল ? অক্রুরের হাত থেকে রক্ষা করবে কথা দিলে ? অক্রের সঙ্গে তো হাতেম থারের খুব দহরম মহরম ছিল রে! না, ফৌজদারের অন্দরে ঢোকবার ব্যবস্থা করে এলি ?
- —কথা শেষ হল না গোসাঁই। ফোজদার চলে গিরেছিল তো, আবার হস্কদন্ত হয়ে চলে এল। কী সব বললে ব্যাগমকে, ব্যাগমও ধুব তরস্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন। লোকজনে বললে—থেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যা রে বোরেগী। জলদি ভাগ্, লগরী (রাজনগর) থেকে ঘোড়স'র এসেছে। ভাগ্—ভাগ্। এখন উসব শুনবার সময় নাই।

কেশবানন্দ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্থামানন্দের দিকে তাকালেন। স্থামানন্দ সে দৃষ্টির অর্থ অন্তমান করলেন। নবাবী ফৌজ মুরশিদাবাদ থেকে রওনা হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রাস্ক হওরার ঘোষণা দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল। শিবারা ধ্বনি তুলে বনময় ডেকে উঠল; বাহুড়েরা শাধা মেলে উড়ল; গাছের কোটরে—ডালে ডালে পাঁাচারা ডাকতে শুরু করলে। এই ধ্বনির প্রতিক্রিয়ায় সচকিত হয়ে অহরহ জাগ্রত পতক্রেরা চঞ্চল হয়ে উঠল; তাদের ধ্বনি বারেকের জন্ম উচ্চ হয়ে উঠল। করেণ্ডি সচকিত হয়ে উঠল। করেণ্ডি

- —কী হল ? চমকে উঠলি যে ? প্রহর রাত হল, দেই জন্ম শিয়াল ডাকছে।
- —হাঁ। গোসাঁই, আমার যে বড্ড দেরি হরে গেল গো! মোহিনী যে একা আছে। মা-জী যে থেকেও না-থাকা। আমি যাই গোসাঁই—
 - —থেয়ে নে, কতক্ষণ লাগবে ?
- —আমি থেতে থেতে যাব। সে তার মরলা গামছাখানা বিছিয়ে পাতার্ম্ব খাবার তার উপর চাপিরে বেঁধে নিরে ঢিপ করে একটি প্রণাম করে বললে, আমি চললাম গোসাই।

কেশবানন্দ বললেন, কাল একবার আসবি। প্রয়োজন আছে।

কয়ো চলে গেল। কেশবাননদ খুশী মনেই এগিরে চললেন। যে সংবাদ চাচ্ছিলেন তা পেরেছেন। আশ্চর্যভাবে কয়ো জেনেছে এবং দিয়ে গেল। কয়োকে একটু তালিম দিতে পারলে ওর ছারা অসাধ্যসাধন করা যাবে।

- —কে? কে ওখানে **দা**ড়িয়ে গ
- —আমি কেশবানন।
- —গুরু মহারাজ ? এমন করে— ? প্রশ্ন করতে গিরেও করতে পারলেন না কেশবানন্দ।

মাধবানন্দ বললেন, ভাবছি কেশবানন্দ। কালের পদধ্বনি শোনবার, সেই ধ্বনিতরক অন্তভব করবার শক্তি বোধ হয় জীব-জগতের জন্মগত। নইলে পাঁচা শেরাল এরা ঠিক প্রহরে প্রহরে কী করে ডেকে ওঠে? আমরা মান্ত্র। ওদের থেকে অনেক জন্ম এগিয়ে আছি। আমাদের পক্ষেবর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিশ্বতের কোন এক প্রহরের ক্রান্তি-মূহুর্ত অন্তভব করা তো অসম্ভব নয় কেশবানন্দ। আমি যেন অন্তভব করছি, চোথের উপর কতকগুলো ঘটনা যেন অকস্মাৎ ঘটে গেল আমার। ঠিক ধরতে পারছি না, কিন্তু—

কেশবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে মাধবানন্দের মুথের দিকে তাকিরে রইলেন, তারপর বললেন, আপনার শরীর বোধ করি হুছ নর গুরু মহারাজ, চলুন, বিশ্রাম করবেন চলুন।

—বিশ্রাম! বিশ্রাম নিতে পারছি না কেশবানন্দ। একটা কী যেন আমাকে অস্থির করে রেথেছে অহরহ। নিশ্রাকে, বিশ্রামকে শাসন করে দূরে রেথেছে।

ধীর পদক্ষেপে তিনি ফিরলেন গোবিন্দের ঘরের দিকে।

। मनम श्रीबटाइन ।

भाषवानम शास्त वरमहिलन।

তাঁর ধ্যানের মধ্যে তিনি ভগবানের 'কংসারি'-রূপটি মনের মধ্যে রূপারিত করে প্রার্থনা করেন—"এই রূপে তুমি প্রকট হও সর্বলোকের অস্তরে। শাপকে তুমি নাশ কর। ব্রজনীলার ধূলার থেলা সাক্ষ করে রথে আরোহণ কর; দেহধারী মানব-মানবীর স্বেহ-মমতা-রাগ-অম্বরাগময় পার্থিব চেতনাকে অতিক্রম করে পূর্ণ চৈতত্তে জাগ্রত হও। পাঞ্চজ্ঞ শঙ্খে নির্ঘোষ তুলে সকল মান্ত্রের জীবনরথের অশ্বরজ্জ্ ধরে মোহাভিভ্ত নর-চৈতত্তকে প্রবৃদ্ধ করে বল—

পরিত্রাণার সাধুনাং বিনাশায়চ হৃদ্ধৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও; কিন্তু অহরহ মানব-অন্তরে তুমি ররেছ। জীবনশয়েধিতে চৈতন্তের শতদলকে সেই অনাদি কাল থেকে দলের পর দলে
বিকশিত করছ। আজ এই এ-দেশের লৌকিক কাল গণনার ১১९৬ সাল—
হিজরী ১১৫১—শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ১৭৩৯ গ্রীষ্টান্দে দাঁড়িরে পিছনের গণনার
অতীত—বহু সহস্র বহু লক্ষ বৎসর অতীত কালের দিকে তাকিরে তো
দেখতে পাচ্ছি, প্রভু, সে চৈতন্তের শতদল ক্রমপ্রকাশে ক্রমবিকাশে
দিনে দিনে ফুটেই চলেছে—ফুটেই চলেছে—ফুটেই চলেছে। এই আমার
জীবনে—আমি সেই তো ক্রমিকীট হতে চৌরাশী কোটি দেহান্তরের পর
মাহ্যবের দেহে মনে উপনীত হরেছি; কত জন্মান্তরের পর এই জন্মে
ভোমাকে উপলব্ধি করছি—এ তো মিধ্যা নয়। চৈতন্তে তুমি পূর্ণ হয়ে
জাগ্রত হও প্রভু।

নিতাই তাঁর এই প্রার্থনা। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে একটি বেদনার সুর তাঁর এই প্রার্থনা-সঙ্গীতের সঙ্গে তানপুরার ধ্বনির মত বাজতে থাকে। আজ হঠাৎ তাঁর চোগের সমুথে তিনি এক বিচিত্র দৃষ্য দেখলেন। দেখলেন, দলে দলে অখারোহী আসছে। অখকুরে ধুলা উড়ে দিগস্ত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন এ-দেশের পটুয়ারা পটে ছবির পর ছবি দেখায় তেমনিভাবে দুভোর পর দৃভা। দেশ জলছে। গ্রাম লুঠ হচ্ছে। মহামারী, তুভিক্ষ। আবার অখারোহী। যুদ্ধ। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। এবই মধ্যে-ছি-ছি-ছि! मत्था मत्था এकि किल्गातीत मूथ! आन्ध्य, माति माति माति মুথ। ওই একথানি মুথ। নানান বিচিত্র বেশে ভ্যায় রূপে—ওই এক মুখ সহস্র হয়ে ভেসে উঠছে। কথনও ঢলচল বিহবল দৃষ্টি—মৃথে স্থাপিনর-মৃহর্তের আকাশের অল্পরাঙা পেলবতা, কথনও উদাস দৃষ্টি—মৃথে আকাশের নীলের প্রসন্ন কোমলতা, কথনও সকরুণ সম্ভল দৃষ্টি—মুখে সান্নাহ্নের মলিনতা, কথনও বিলাসিনী বেশ, উদাসিনী বেশ, কথনও ভিথারিণী বেশ। কিছু সর্বক্রপে সর্বভাবেই সে কিশোরী। জীবন-জগতের সর্বস্থান সর্বকাল ব্যাপ্ত করে রয়েছে যেন। কাতরভাবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর জীবনের প্রথম মাধুরী অনস্তমূল অনস্তকাণ্ড দুর্বাদলের মত নিজেকে বিস্তার করে রেখেছে। মাটির মৃত্যু ঘটে। পাথর না হলে যেমন দুর্বাদলের আচ্ছন্নতা থেকে নিস্তার নাই, জীব-জীবনেরও মৃত্যু ভিন্ন যেন ওই রূপের প্রভাব-ম্পর্শ থেকে নিষ্কৃতি নাই। প্রার্থনা করেছিলেন—"হে কেশব, হে কংসারি, হে গোবিন্দ! আমাকে তুমি ওই রূপ আর দেখিরো না। ওকে আবরিত করে তুমি প্রকট হও।"

ধ্যানের আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন মাধবাননা। বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্ত বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্থাই হরে তেবেছিলেন—এটা কী হল ? এসব কী দেখলেন তিনি ? ১১৪৬ সালের এই আঘাঢ় মাসের রাজের প্রথম প্রহরে ধ্যানাসনে বসে তিনি কি ভবিছাং দেখলেন ? দেখা কি সম্ভব ? আর ওই মুথ ? ওরই বা অর্থ কা ? হঠাৎ মনে হল, সবই অর্থহীন। তাঁর চিস্তা-উত্তপ্ত মন্তিছের ও অক্তভৃতির বিভ্রম। একাস্কভাবে মিধ্যা কল্পনা। নিজেকেই নিজে ছলনা করেছেন তিনি। কিছু এই মুহুর্ভটিতেই প্রহর ঘোষণা

করে ভেকে উঠল শেয়াল-পাাচা; কীটপতক্ষবনি-তরক্ষের মধ্যেও যেন একটি চকিত ছেদ্ধ পড়ল। যতক্ষণ এই ঘোষণা চলল, মাধবানন্দ একাগ্র এবং উন্মুখ হয়ে শুনলেন এই ঘোষণা। তিনি যেন, যেন নয়—নিশ্চিতভাবে, তাার মনের প্রশ্নের উত্তর শুনছিলেন।

এই শিবারা এই পেচকেরা এই কীটপতকেরা তো মন্ত ছিল—আহারে বিহারে বিশ্রামে। হঠাৎ ডেকে উঠল কী করে? এই কালগণনা কী ভাবে চলছিল তাদের মধ্যে? তারা তো মাফুষের চেরে অনেক পশ্চাতে রয়েছে। তাদের চেতনা বৃদ্ধি চৈতক্ত—সবই তো মাফুষের থেকে অনেক গুণে ক্ষীণ, অপরিপুষ্ট। তবু তাতেই তারা যদি বর্তমানে এই ভাবে প্রহরকান্তিকে ব্যতে পারে, তবে মাফুষই বা ভবিক্ততের ক্রান্তিকালকে অফুভব করতে পারবে না কেন? জন্তবা অতীতকে ভূলে যায়, মাফুষ অতীতকে মনে রাথে, বর্তমানে দাঁড়িয়ে তাকে শ্বরণ করে—সমরে সমরে তো অতীত কালের ঘটনা প্রত্যক্ষের মত চোথের সামনে ঘটে যার; তবে ভবিক্তংই বা দেখা অসন্তব কিনে?

তিনি কি তবে ভবিষ্যংকে দেখলেন ?

কথাটা কেশবানন্দকে বলতে গিয়েও বললেন না। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কূটনীতির বিচারে ও হিসাবে পারদর্শী এই পশ্চিম-দেশীয় স্থচতুর লালা-বংশের সস্তানটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর থানিকটা মিল বয়েছে। কেশবানন্দ এতেই উৎসাহিত হয়ে তাব সর্বনাশা চাতুরীর থেলাকে অভ্রাপ্ত বিধি এবং বিধান বলে প্রয়োগ করতে উন্থত হবে। দাবাথেলার থেলুড়ে সে, জীবনথেলার বিধাতা নয়—এটা যে ভুলে যাবে; নিজের কাছে নিজে প্রতারিত হয়েই এ থেলা শেষ করবে সে।

"যা দেবী ভ্রান্তিরূপেণ সর্বভূতেরু সংক্ষিতা। নমস্তব্যে নমস্তব্যে নমস্তব্যে নমোনমঃ॥"

মন্দিরে প্রবেশ করে আসনে বসে আবার যেন অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। এবং সে অস্থিরতা এমন যে আসন ছেড়ে উদ্লাস্থের মত বের হয়ে এলেন মন্দির থেকে। আশ্রম-প্রাঙ্গণ তথন জনশৃষ্টা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি আশ্রম থেকেও বেরিয়ে পড়লেন। দাঁড়ালেন বনের মধ্যে।

আপনার চিত্তের সে এক বেদনার্ভ অসহার উপলব্ধি বা অন্তভৃতি যাই হোক, তার আবেগেই তিনি বেরিয়ে এলেন আশ্রম থেকে। শুধু তাই নর, অজ্ঞাত আকর্ষণও যেন তাঁকে টানছে, অনিবার্য নেগে আকর্ষণ করছে তাঁকে। চললেন তিনি জয়দেব-কেন্দুলীর দিকে। জয়দেবের সাধনা যদি মাত্র লোকরটনা না হয়, যদি সত্য সত্যই কবির সংশয় নিরসনের জয়্ম শ্রামস্থলর জয়দেবের রূপ ধরে এসে নিজের হাতে কলম ধরে 'দেহি পদ্দরম্দারম্' শংক্তি লিখে গিয়ে থাকেন তবে সেই সাধনগীঠে গিয়ে আছাড় থেয়ে পড়লে কি কোন নির্দেশ তিনি পাবেন না ? যদি সত্য হয়, অবশ্রুই পাবেন, মিথ্যা লোকরটনা হলে পাবেন না ।

রক্তনালা পার হয়ে তিনি এসে অঙ্গরের বক্তাবোধী বাঁধের উপর উঠলেন।
পিছনে শ্রামরূপার গড় জঙ্গলে জীবনের আদিম রূপের থেলা বল খেলা,
লীলা বল লীলা—চলছে। একটা চিতানাঘের গর্জন এবং একটা হরিণের
আর্তিয়র একসঙ্গে মিলিত হয়ে নৈশ স্তর্জাকে সচকিত করে তুলেছে।
মৃহুর্তের জন্ম মাধ্বানন্দ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর পায়ের কাছে হাত তুই
দূরে ও তুটো কী ?

ওঃ! মৈথুনালিক্সনবদ্ধ বিনশদেহ প্রায় হতচেতন ত্টো সরীফপ, মহাবিষধর ত্টো গোখুরা সাপ। বাঘ এবং হরিণের গর্জন ও আর্তনাদ, তাঁর নিকটসাল্লিধ্য কিছুতেই তাদের সচেতন করে তুলতে পারে নি। চেতনা
পর্যন্ত এক বিবশতার সমুদ্রের কোন্ অতল গহরের হারিয়ে গেছে। একটু
বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। পরক্ষণেই অতি সন্তর্পণে কয়েক পা
পিছিয়ে এসে পাশ কাটিয়ে পথ ধরে অজয়ের তটভ্নে নেমে পড়লেন।

দেহের মধ্যে যে মহামোহমরী বাস করেন, তাঁকে তিনি আৰু নৃতন করে প্রত্যক্ষ করলেন।

আষাঢ় মাসের অন্ধকার বাত্তি; তার উপর আকাশে মেঘ। সেই
আন্ধকারের মধ্যেই মাধ্বানন্দ মনের এক অসম্বরণীয় আবেগের প্রেরণায়
বা তাড়নায় চলেছেন। অজ্ঞরের চরভূমি, চরভূমির বালুরাশির উপর প্রথম
আষাঢ়ে তুণোল্গম হয়েছে, কুশ এবং কাশগুল্মে অঙ্কুর দেখা দিরেছে। খড়ম
পারে এতে চলবার পক্ষে কিছু স্ববিধা হয়েছে। মাধ্বানন্দ পশ্চিম মুখে

ভলেছিলেন। ওপারে ইলামবাজার-জম্বাজারের গলার রেশ চলেছে অনেক দ্র পর্যন্ত। প্রায় গ্রামে গ্রামেই ঘাটের মাথার ছোট ছোট বাজার; এই রাত্রেও ছ-চারটে আলো জলছে দেখা যাছে। গ্রাম্য কুকুরেরা চিৎকার করছে এপারের বনের দিকে লক্ষ্য করে। বোধ করি এপারের স্থামরূপার গড় জঙ্গলের আরণ্ডলীবনের অবাধ উন্মন্ত লীলাকে শাসাছে। গোটা চরভূমির গুল্ম এবং তৃণান্তরণের ভিতর থেকে বিচিত্র ঐকতান উঠছে। স্থ্ এখন উত্তরায়ণে, স্প্টি-জীবনস্রোতে এখন ব্যার সমর, অম্বাচীতে পৃথিবী ঋতুমতী হন, সঙ্গে সরৌস্থা-কীট-পতঙ্গ-জীব-জন্তর মধ্যেও তন্ধভোগ-বাসনা উত্তপ্ত উগ্র হয়ে ওঠে। ওই সেই মোহমন্ত্রীর নৃত্যলীলা। উলঙ্গিনী হয়ে নাচছে সে।

অন্তরের জলে পা দিয়েই আবার থমকে দাঁড়ালেন মাধবাননা। ও:! জলতলেও চলেছে ওই মোহময়ীর উলঙ্গ নৃত্য। এই তো নৃতন বর্ষণ নামবে, নদীর বুক ভরবে, বল্লা আসবে, সেই বল্লার ভেসে আসবে মাছের ডিম, মাছের পোনা। ব্যাঙাচিতে ব্যাঙাচিতে ভরে যাবে পুকুর ডোবা।

জগৎ-ব্যাপ্ত চৈতত্ত্বের তপস্থাভক্ষের জন্ম সে মোহিনীরও যেন এ এক ত্শ্চর তপস্থা। কী তার রূপ? সে কেমন? অন্ধকারের মধ্যেও গাঢ়তম আন্ধকারের মত কি?

পারের উপর দিয়ে নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে, পায়ের তলায় বালি থসে খসে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের একটি কাতর চিৎকারে তাঁর চেতনা ফিরে এল। চিস্তামগ্রতার ঘোর কেটে গেল। কে চিৎকার করছে? এমন মর্মান্তিক কাতর চিৎকার! নারীকণ্ঠে? কি মর্মান্তিক বেদনা!

ওঃ, তিনি অনেকটা পশ্চিমে এগিয়ে এসে কেন্দুলীর শ্বাশানঘাটের সামনে এসে পড়েছেন। মন্দিরের ঘাট, ওই যে—অনেকটা পূর্বদিকে; হাঁা, ওই যে জয়দেব প্রভূব সিদ্ধাসন! ওই তো ঘাটের উপর! মনের আবেগে চিস্তান্মগ্রতার মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি। ওই সামনে শ্বশানঘাটের বিশাল বটগাছটা দেখা যাছে। ওরই পাশে ওই তো পৌষ-সংক্রান্ধিতে বাউলদের সন্ধ্যতীর্থ!

স্থাবার সেই নারীকণ্ঠে স্থার্ডবিলাপধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বর থেকে ব্ঝতে পারা যাচ্ছে, এ স্থার্ডনাদ কোন স্থা-বিপন্নার নয়—এ স্থার্ডনাদ মর্মাস্তিক বিলাপ, বোধ করি কোন স্বভাগিনী তার স্বস্তরের ধনকে হারিরে বিলাপ করছে। কিন্তু কই ? কোন চিতা তো জ্বলছে না! মাছ্যজনের সাড়াও তো পাওয়া যায় না! তা হলে হয়তো কোন পাগলিনী। গভীর রাত্রে শ্বশানে এসে কাঁদছে।

মাধবানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরলেন। মন্দিরের ঘাটের সামনে গিরে অজয় পার হবেন। কিন্তু সামাগ্র কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরলেন। ওই মর্মাস্তিক বিলাপধ্বনি যেন তাঁকে আকর্ষণ করছে। যে আকর্ষণে তিনি চলে এসেছেন এতটা, সেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যেন ওইখানেই বলে মনে হচ্ছে।

ফিরে এসে ওপারের শ্মশানঘাটের সামনের ঘাটে নেমে পড়লেন তিনি।
এপার থেকে যারা ওপারের কেন্দুলীর শ্মশানঘাটে শবদাহ করতে নিয়ে যার,
তাদের পায়ে পায়ে একটি ঘাট তৈরী হয়েছে এখানে। পায়ের খড়ম জোড়াটা
ঘাটের মাথার খুলে রেথে জলে নেমে পড়লেন। জল এখন অজয়ে বেশী নয়,
অধিকাংশ স্থলেই এক-হাঁটু এক-কোমর, ত্-এক জায়গায় খানিকটা এক-বৃক
বা এক-গলার বেশী নয়। এই স্রোভটুকু ধরেই এ সময়ে নৌকা চলাচল করে।

স্রোত শেষ হয়েই বিস্তীর্ণ বালুচর।

বালুচর পার হয়ে তবে কেন্দুবিবের তটভূমি।

বর্ধার সময় ছাড়া অন্ত সময়ে এই বাল্চরের উপরেই শ্মশানের কাজ চলে। ওই বাল্চর থেকেই উঠছে ওই বিলাপধ্বনি। যত এগিয়ে এলেন এপারের দিকে ততাই ব্রুতে পারলেন, এ বিলাপ ছেদহীন, বিরামহীন, মৃত্সরে গুনগুনিয়ে কেউ কেঁদেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে। ওপার থেকে গুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না, মধ্যে মধ্যে উচ্চ আর্তনাদে কেঁদে উঠছিল যথন, তথনই সে ধ্বনি ওপার পর্যন্ত গিয়ে কানে পৌছচ্ছিল। জলজ্যেত পার হয়ে বাল্চরের উঠে মাধ্বানন্দ গুরু হয়ে দাঁড়ালেন।

কই ? কোথায় সে, যে এমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে ? গাঁঢ়
অন্ধকারে সব আচ্ছন্ন। আকাশে পাতলা মেঘের আন্তরণ পড়ে নক্ষত্রালোকের
পথও রুদ্ধ করে রেখেছে, এই পাতলা মেঘে বারেকের জন্ম কীণ বিহাচচমকও
চমকায় না যে, তার সাহায্যেও চকিত দেখার সাহায্য হয়! কিন্ধ চোখেরও
একটা অন্ধকারভেদী শক্তি আছে। কিছুক্রণ অন্ধকারে চলনেই কিছু-

কিছুটা দেখা যায়। যত দীর্ঘকণ অন্ধকারে থাকে মাহুষ, ততই এই দৃষ্টিশক্তির পরিধি বাড়ে। কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছেন মাধবানন্দ। ওই তো কালো কালো চিতার দাগ। ওই তো পোড়া কাঠ এখানে একটা ওখানে একটা—ওই আর-একটা—ওই একটা পড়ে আছে। কিন্তু যে কাঁদছে দে কই ? তবে কি মিরালম্ব বায়ুভুক কোন অশরীরিণী শ্মশানের বায়ুভুরে ভেসে বেড়াচ্ছে আর কাঁদছে ? বিগত জন্মের অপরিপূর্ণ বাসনার টানে মাটিকে আঁকড়ে ধরে ফিরে পেতে চাচ্ছে তার বাসনামন্ত্রী দেহকে, কিন্তু পাচ্ছে না ? আবার মূহুর্তে মাধবানন্দের মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই মোহমন্ত্রীর কল্পনা। বাসনামন্ত্রী দেহের বস্তুভোগের বিবিধ স্তরের বেদী থাকে থাকে সাজানো—আহারবাসনা, বসন-বাসনা, ভৃষণ-বাসনা, স্বাদ-গন্ধ-শন্ধ-শ্বন্ধের বেদী, তার উপর আসীনা ওই মোহমন্ত্রী; সে বলে "প্রতি অঙ্ক লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্ক মোর", 'ক্রপ লাগি আঁথি থুরে"—রূপ দেখে সে আকুল হয়ে কাঁদে।

চমকে উঠলেন মাধবানন। কে ? কে ? ও কে ?

আন্ধকারের মধ্যে সহসা একটি ভূতলশায়িনী মূর্তি উঠে বসল। ভূতলশান্ধিনী—হাঁা, তাই বটে; একটি নারীমূতি, মাথার আলুলান্ধিত চুলের রাশি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি, নারীমূতিই বটে! চিৎকার করে উঠল আর্তিশ্বরে: আ:—হা-হা-হা রে! আ:!

সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মাধবানদের। একটা ভয়ার্ত শিহরণে তাঁর সর্বশরীর শিউরে উঠল। মাধবানদি ভীফ নন। তিনি সারা উত্তরাপথ ঘুরেছেন তাঁর জীবন-প্রশ্নের উত্তরের জন্ত। অরণ্যে, পাহাড়ে, শ্মশানে, বিপ্রবাক্রাম্ভ নগরীর হিংসাজর্জরতার মধ্যে দিন রাত্রি যাপন করে এসেছেন। তবু এই অক্ষকার রাত্রে এই মহাশ্মশানের মধ্যে বখন এক মোহময়ীর কল্পনায় তাঁর মন বিভ্রাম্ভ, সেই মৃহুর্তে ওই আলুসায়িতকুম্ভলা এক নারীকে ঠিক যেন মাটির বুক ভেদ করে উঠতে দেখে তিনি শিউরে উঠলেন।—এই কি সেই ?

স্থির নিম্পালক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে পাথরের মৃতির মতই তিনি দাঁড়িরে রইলেন। উন্নাদিনী নিশ্চয়। অথবা এ মৃতিমতী সেই। উঠে বলে সে বিলাপ করছে। বিলাপ, না, গান ? এ তো গান! কী, কী গাইছে?

শোনবার জন্ম সমন্ত অস্তরকে তিনি একাগ্র করে তুললেন। এবার শুনতে পেলেন—

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা। হরি-বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা॥" প্রক্ষণেই সে চিৎকার করে উঠল, আ: আ: আ:।

চিৎকার করে সে এবার উঠে দাঁড়াল। সভরে শিউরে উঠলেন মাধবানন। পূর্ণপরিণতযৌবনা, গৌরাঙ্গী, রুক্ষ আলুলায়িতকেশ। সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গিনী এক নারী।

এ তবে—এ তবে—? পরক্ষণেই তিনি আবার চমকে উঠলেন। এ যে, এ যে—এ যে সেই পাপিনী—সেই বৈষ্ণবী! কয়ো আজই তাঁকে বলেছে, সে উন্নাদ হরে গেছে। তাঁবই অভিশাপে।

মাধবানন্দ পাথর হয়ে গেলেন।

উন্নাদিনী চিংকার করে বললে, রাধা পাপ ? হে কবিরাজ গোস্বামী, তোমার ভ্রম ভেঙেছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ। নিজের হাতে পাদপূরণ করে লিখেছিলেন—দেহি পদপল্লবমূদারম্! আর আজ যে রাধাকে মোহময়ী ভেবে, পাপ ভেবে গোবিন্দের পাশ থেকে সরালে, নির্বাসন দিলে, তার ভ্রম কে ভাঙবে ? আমার এ অপমানের শোধ কে নেবে ? আমি অভিসম্পাত দিলাম—অমমি অভিসম্পাত দিলাম—তৃষ্ণার বুক-ফাটা যন্ত্রণার মধ্যে তুমি তৃষ্ণার জলকে চিনো। বুকের মধ্যে দেহের রোমকৃপে-কৃপে তোমার আগুন জ্বলরে, যেমন আমার জলছে। সেইদিন তুমি বুক ফাটিয়ে চিংকার করবে 'রাধা' 'রাধা' বলে; তোমার রোমকৃপে-কৃপে চিংকার উঠবে 'রাধা' 'রাধা' বলে। উপর দিয়ে উঠতে গিয়ে পাতালমূপে মাণা ঠুকে পড়বে তুমি।

বলতে বলতে সে আবার হা-হা-হা শব্দে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই সে দেই নিশীথ রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন বালুচর ধরে চলতে শুরু করল। স্থানীর্ঘ অন্ধন্ন চলতে গুরু করল। স্থানীর্ঘ অন্ধন্ন চলে গেছে পূর্বমুখে ইলামবাজার হরে গন্ধাসন্ধ অভিমুখে। ধুধু-করা বালুচরের রেশ কিছুদ্র পর্যন্ত দেখা যান্ন, তারপরই অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারই সন্দে উন্নাদিনী বৈষ্ণবীও মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে, শুধু তথনও শোনা যাচ্ছিল: অভিসম্পাত দিলাম-আমি অভিসম্পাত দিলাম।

কীণ থেকে কীণতর হয়ে সে শব্দও ক্রমে মিলিয়ে গেল। মাধবানন্দ যেন পাথর হয়ে গেছেন। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। পিছনে অজয়ের জলস্রোতের মৃত্ কুলকুল ছলছল শব্দ ধ্বনিত হয়ে চলছিল অবিরাম। মাধবানন্দের কানে যেন মনে হল মৃত্ জলকলধ্বনির মধ্যেও বাজছে সেই গান—

> "অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা। হরি-বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা॥"

আশ্চর্ষ ! তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে ওই সর্বনাশীর পিছনে ছুটে যান। একটি করুণ মমতায় তাঁর মন বেদনার্ভ হয়ে উঠেছে। ওই বেদনার আকর্ষণ তাঁকে টানছে। তিনি কঠিন হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কতক্ষণ পর কে জ্ঞানে! কার উৎকণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠের শব্দে তাঁর চেতনা শক্রিয় হয়ে উঠল। কে কাকে ডাকছে। বোধ করি খুঁজে বেড়াছে।

--- मा-की! मा-की! मा-की!

মাধবানদের চোথে পলক পড়ল। তিনি চঞ্চল হয়ে সামনে পাশে পিছনে মুথ ফিরিয়ে আহ্বানের দিক্নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। কোন্ দিক থেকে কে কাকে ডাকছে ?

—मा-की ला !

এবার মা-জী শক্ষাটির অর্থ তাঁর মন্তিক্ষে বোধগম্য হল। সঙ্গে মনে হল, এ কণ্ঠম্বর তো তাঁর পরিচিত। কে? কয়ো? হাঁা, কয়োই তো। মনে পড়ল যে উন্মাদিনীকে এই বাল্চরের শ্মশানে বিলাপ করতে দেখেছেন, সে ক্রফ্রদাসী। কয়ো তাকে খুঁজে বেড়াছেছে।

একটা গভীর দীর্ঘাস ফেললেন মাংবানন।

মনে মনে কংসারিকে প্রণাম করলেন। হে কংসারি, তুমি দাসকে বক্ষা করেছ। বৃন্ধাবনের সকল মোহকে পশ্চাতে রেখে মোহময়ী রাধাকে ফেলে তোমার যাত্রাপথে তুমি পিছন ফিরে তাকাও নি। রাধার চোখের জলে ব্রন্থভূমি-মুক্তিকা সিক্ত হরেছিল, তোমার অনিবার্ধ নিরমে স্থর্ধ তাকে শোষণ করে নিশ্চিক্ত করেছে, তার দীর্ঘনিশাসের উদ্ভাপকে বায়ু গ্রাস করেছে, ভার বিরহ্তাপতথ্য তন্থদেহকে বহি নিশ্চিক্ত করেছে; ভশ্বাবশেষকে গ্রাস করেছে ধরিত্রী। মাস্থবের শ্বতিতে বেদনায় শুধু সে বেঁচে আছে। জড়-জগতের নিয়মে তাকেও তুমি নিশ্চিষ্ক করে দাও। মানব-চৈতক্তের মোছ-বন্ধন মোচন কর।

চারিদিকের অন্ধকার শুদ্ধতা ভঙ্গ করে অক্সাৎ পাথিরা কলরব করে উঠল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। মাধবানন্দ আবার অজয়ের জলে নামলেন। এপারে এসে পরিত্যক্ত খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়ে পূর্বমূথে এগিয়ে চললেন নিজের আশ্রমের দিকে। ওই দেখা যাচ্ছে ইছাই ঘোষের দেউল।

আশ্রমে যথন এসে তিনি প্রবেশ করলেন, তথন মেঘাচ্ছন্ন পূর্বদিগন্ত, মেঘান্তরালবর্তী সভোদিত সূর্যের রক্তাভায় যেন রক্তাক্ত হল্পে উঠেছে।

সকালবেলা উদয়দিগস্থে এ রক্তান্তা, বৃষ্টি নামবার পূর্বলক্ষণ। বৃষ্টি নামবে। বর্ধা আসয়। হাা, এই সকালেই পাথিরা আহারসন্ধান ছেড়ে মুখে কুটো নিয়ে বাসার দিকে উড়ছে।

—গুরু মহারাজ।

কেশবানন্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন কংসারির গৃহের সামনে। বোধ করি ভোর-বেলা উঠে দেবগৃহে বা তাঁর নিজের কুঠরিতে না পেরে তাঁরই জ্বন্থে চিস্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাধবানন্দ বললেন, কেশবানন্দ!

তাঁর ম্থের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে কেশবানন্দ বললেন, প্রশ্ন করা আমার উচিত নয়, অধিকারও নাই। কিন্তু আপনার মুগ দেখে—

- কাল রাত্রে কেন্দ্বিশ্বের দেবতার কাছে কিছু নিবেদনের জন্ম গিরে-ছিলাম। কিন্তু আকাশ দেখেছ? বর্ষা আসন্ত্র। চালের আচ্ছাদন মেরামত অবিলম্বে সম্পূর্ণ কর।
- সে ব্যবস্থা অনেক আগেই করেছি। গুরু মহারাজ, আমাকে একটু বেশী বৈষয়িক বলে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করেন। আজ গুরুর কাছ থেকে প্রশংসা প্রত্যাশা করি।

মাধবানন এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন, নিশ্চয়ই। কিছু দেখো সেগুলি ইতিমধ্যেই আবার জীর্ণ হর নি তো! এ সব অঞ্চলে উইপোকার উপদ্রব বেশী।

কেশবানন্দ বললেন, ভার জন্মে বাখারি এবং কাঠে গুড়ের গাদের প্রলেপ

মাথিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। মিষ্টলোভী পিঁপড়ের ঝাঁক উইপোকা প্রান্ধ শেষ করে এনেছে। উইয়ের উপদ্রব হবে না। কিন্তু হুটো সংবাদ আছে। এই ভোরবেলা পেরেছি। ওপার থেকে করো এসেছিল। শুনলাম উন্নাদরোগগ্রস্তা রুফ্চলাসী কাল রাত্রে নিরুদেশ হয়েছে। সে এখানে তাকে খুঁজতে এসেছিল। আর সংবাদ পেরেছি, নবাব স্কুলাখা মারা গিয়েছেন। শুনছি, শেষ মুহুর্ত নিকট বুঝে বীরভূম-অভিযানের হুকুম প্রত্যাহার করে রাজনগরের নবাবের আরজিমত মিটমাট করে নিতে বলে গিয়েছেন। এক লক্ষ টাকা দিতে রাজনগরের নবাব স্বীকৃত হয়েছেন। বর্ধমানের মহারাজ তাঁর জামিন দাঁভিয়েছেন।

भाषवानम वनतन्त, कुक्षमात्रीत त्रःवाम निया এकवात ।

মৃহুর্তের জতে শুরু থেকে আবার বললেন, না। পাপ নিশ্চিফ হওয়াই ভাল। বলেই তিনি অগ্রসর হতে উন্নত হলেন। কেশবানন বললেন, বীরভূম অভিযান আপাতত স্থগিত হয়েছে বটে, কিন্তু সারা বলদেশ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ আসম্ম এবং নিশ্চিত হয়ে উঠল গুরু মহারাজ। নবাব হজাউদ্দিন মারা যাবার পর সরফরাজ থাঁ নবাব হবে। লোকটি বিচিত্রচরিত্র। শুনি ইতিমধ্যেই তার হারেমে উপপত্নীর সংখ্যা শত শত। কেউ কেউ বলে, এ সব নাকি তার এক বিচিত্র ধর্মসাধনার অঙ্গ। উজীর হাজী আহম্মদ এক দিকে গোঁড়া মুসলমান, অন্ত দিকে রাজ্যলোভী কুচক্রী। তার সঙ্গে সরফরাজের বিবাদ লাগল বলে। আমাদের পক্ষে হ্বর্থ-হ্যোগ গুরু মহারাজ। আমার প্রস্তাব আপনি বিবেচনা করে দেখুন।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ: কী প্রস্তাব ?

- —লোক সংগ্রহ করা, আমাদের দলকে পরিপুষ্ট করা। অন্তশস্ত সংগ্রহ করা।
 - —সন্মাসীর দলকে সশস্ত বাহিনীতে পরিণত করতে চাও কেশবানন্দ ?
- ইয়া গুরু মহারাজ। হিন্দুরাজাজ প্রতিষ্ঠার এ স্থযোগ গেলে আর আনাসবেনা।

মাধবানন্দ কেশবানন্দের মুথের দিকে তাকিরে বললেন, দেশের দিকে তাকিরে, ইষ্টদেবতার নাম নিয়ে, একটা স্বত্য উত্তর দেবে কেশবানন্দ ? — গুরুর সমূথে আমি মিথা৷ কথা বলি বলে কি গুরু মহারাজের মনে সন্দেহ হয় ?

—মনসা চিন্তরেৎ কর্ম বচসা প্রকাশয়েৎ—স্ত্রটি সত্য এবং মিথ্যার সীমারেথার উপর অতি স্থকৌশলে স্থাপিত করে গেছেন মহাপণ্ডিত কৌটিল্য। তুমি একদা রাজকর্মচারী ছিলে, রাজনীতিতে তুমি অভিজ্ঞ। তোমার মনের অজ্ঞাতসারে অভ্যাস ক্রিয়া করে যায়, এটাও মান্থযের একটা জীবনসত্য। তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। তুমি কৃক্ক হয়োনা।

একটু ন্তৰ থেকে কেশবানন্দ হেসে বললেন, প্ৰশ্ন কৰুন। সত্য বলব। অত্যন্ত সতৰ্ক সচেতনতার সন্দে বিচার করেই উত্তর দেব।

—বল তো কেশবানন, ম্সলমান-রাজত্বের উচ্ছেদ করে হিন্দুরাজত্ব চাও কেন? বিছেষের বশে ?

কেশবানন্দ স্থিরদৃষ্টিতে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তর বোধ করি সতর্ক বিচারের সঙ্গে স্থির করছিলেন।

মাধবানন্দ বললেন, রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কোন বিশেষ ধর্ম নর কেশবানন্দ। সেটি হল ন্যায়ধর্ম। যা ন্যায়সন্মত তাই ধর্ম। যা অন্তার তাই অধর্ম। এবং রাজা ন্যায়পরায়ণ হলেই রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য হয় না। রাজ্যের প্রজা যদি অন্তায় অধর্মে আসক্ত হর, তবে সেগানেও রাজার সক্ষে প্রজার বিরোধ বাধে। যেখানে অন্তার, সে এক পক্ষেই থাক্ আর ত্ব পক্ষেই থাক্, সেখানে অশাস্তি থাকবেই। এখন বল তো কেশবানন্দ, আজ দেশের এই অবস্থা, এই যে অন্তায়ের স্রোত বইছে, রাজ্য-অন্তঃপুর বিলাসভ্যন থেকে মান্যুয়ের পর্ণকৃটির পর্যন্ত, এর জন্ম দারী কি তথু মুসলমান আধিপত্যা, না, হিন্দুর জীবনের বিক্ততি এবং অধঃপতনও সমান ভাবে দায়ী?

কেশবানন্দের দৃষ্টি বিক্ষারিত হয়ে উঠেছিল। একটা অবরুদ্ধ ক্রোধে তাঁর সর্ব দেহ মন যেন জ্বর-জর্জরতার আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

মাধবানন্দ বলেই গোলেন কেশবানন্দের মানসিক অবস্থা তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন না তা নয়, কিন্তু সে দিকে তাঁর জক্ষেপ ছিল না। তিনি বললেন, শুধু মুসলমানকে দোষ দিয়ে। না বিশ্বেবশে, হিন্দুরও বিচার কর। বল তো, রাজা হিদাবে শুধু কি মুসলমানই অত্যাচারী? যেখানে যেখানে হিন্দু রাজা রয়েছে সেদিকে তাকাও তো। মুসলমান যে যে অত্যাচার করে সেই সেই অত্যাচারের জন্ম হিন্দু রাজারাও কি দায়ী নয়?

এবার কেশবানন্দ অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলে উঠলেন। বললেন, আপনি গুরু, তাই কথার উত্তর দিতে কুণ্ঠা বোধ করছিলাম। এখনও কুণ্ঠা রয়েছে। তাই আপনাকে নান্তিক, ধর্মবোধহীন বলতে বাধছে। এ কথার উত্তর মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষময় অস্ত্রাঘাতে খোদিত করে লিখে রেখেছে। তাকিয়ে দেখুন সোমনাথের দিকে, বৃন্দাবনে গোবিন্দ-মন্দিরের দিকে, কাশীধামে রেণীমাধ্বের ধ্বজার দিকে। এর পরও আর উত্তর চান ?

- —চাই, একটা জবাব চাই।
- —বলুন।
- —মুসলমান মন্দির ভেঙেছে, তারা মৃতিপূজাকে মিথ্যা মনে করে বলে।
 মৃতি যদি সতাই হয় কেশবানন্দ, তবে মৃতি ভেদ করে দেবতা আবিভূতি
 হয়ে সেই সত্য প্রকট হল না কেন ?

কেশবানন্দ শুম্ভিত হয়ে গেলেন।

মাধবানন্দ বললেন, আমার ধারণা কী জান? হিন্দুই তার অনাচারে আচারের নামে অধর্মকে আশ্রয় করে দেববিগ্রহ থেকে দেবত্বকে নির্বাসিত করেছে। মাটির প্রদীপে আগুন ধরালেই প্রদীপ জলে, আবার নিবিয়ে দিলেই নিবে যায়। জালেও মায়য়, নেবায়ও মায়য়। য়তক্ষণ সে হ্রায়কর্ম করে ততক্ষণ তার আলো না হলে চলে না, য়য়ন সে অহ্রায় করে তথন প্রথমেই সে আলোটা নিবিয়ে দেয়। অদ্ধকার—চারিদিক অদ্ধকার কেশবানন্দ; কাল রাত্রে আকাশে একটি তারাও দেখতে পাই নি। তারই মধ্যে দেখেছি বোধ করি এ দেশের সত্য অবস্থা। অদ্ধকারে অনেক হানাহানি অনেক রক্তপাত, অনেক রাজা বদল হয়েছে কেশবানন্দ। আর অদ্ধকারে নয়—আলো জ্বালো, জীবনে জীবনে আলো জ্বালো; আলোয় আলোয় হয়ে উঠুক, তারপর দেখবে সমাজে শান্তি আসবে, মন্দিরে দেবতা আসবেন, অধর্ম দ্রে যাবে; রাজা ধার্মিক হবে।

কেশবানন্দ এতক্ষণে যেন শুস্তিত ভাবটা কাটিয়ে আত্মস্থ হলেন। তাঁর মুথ আরক্ত হয়ে উঠেছে, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ কিন্তু চোথ তৃটি উজ্জল স্থির। মাধবানন্দ বললেন, শোন কেশবানন্দ, শেষ কথা বলি। অধামিক রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধার্মিক প্রজার অভ্যথান-বিদ্রোহ সে শুধু অধর্মকেই প্রবল করে তোলে, জীবনের হঃথকেই বাড়িয়ে তোলে। অধার্মিক রাজারও স্বেচ্ছাচারের অধিকার নাই, অধার্মিক প্রজারও অভ্যথানের অধিকার নাই কেশবানন্দ। অধিকার আছে শুধু অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের অভ্যথানের।

কেশবানন্দ এবার বললেন, নিশ্চর, সে-কথা আমি অস্বীকার করি না।
এ-কথা শুধু আপনি গুরু, আপনার বাক্য গুরুবাক্য বলেই মানি না,
সর্বাস্তঃকরণে মানি। আমাদের দেশের সব মান্ত্রই মানে। ধর্ম যেখানে
সত্য, সেখানে হিন্দু-মুসলমান বিচার কেউ করে না। সিদ্ধ সাধক যিনি,
তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমান হোন, তাঁর প্রতি মান্তবের সমান ভক্তি।
সেই কারণেই ধর্মছেবী বিধর্মী রাজশক্তির পতনের সমন্ন যথন আসন্ন তথন
তার উচ্ছেদ করলে, আমি মহাধর্ম বলে মনে করি। প্রজার অধংশতন,
তাদের মধ্যে ধর্মের বিকৃতি সত্য; স্বীকার করি। কিন্তু সে অধর্মের শৃষ্ট
থেকে টেনে তোলার যে পদ্বা আপনি নির্ধারণ করেছেন, তার সঙ্গে আমি
একমত নই। রাজশক্তি অন্তর্কন হলে, সে কাজ সহজে হবে। শক্তি যদি
সন্ন্যাগী-সম্প্রদায়ের হাতে আসে, তবে সে কর্ম হবে অতি সহজে।

—ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজ কত অংশ ছদ্মবেশী পাপী চোর ডাকাত থুনী ব্যাভিচারী, আর কত অংশ সত্যকারের সাধু ঈশ্বরসন্ধানী তুমি বলতে পার কেশবানন্দ? এমন কি, নানান মাঠের দিকে তাকিরে কথা বল। যারা শুধু ডাল-কটি থায়, যৌগিক পদ্বায় দেহচর্চা করে ত্রিশূল হাতে মদমন্তের মত বেড়ায়, তারাও কি সত্যকারের সন্ম্যাসী? আজ সার। ভারতবর্ষে নিরীহ তীর্থযাত্রীদের ধন-প্রাণ সাধুর বেশধারী পাষওদলের অত্যাচারে বিপন্ন। এদের নিয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপনের কল্পনা, আকাশকুত্বম কেশবানন্দ। কেশবানন্দ, এতবড় রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামী, তাঁর শক্তি অর্থের বিনিমরে তিনি আজ বিক্রি করছেন, ধর্মপক্ষ অধর্মপক্ষ বিচার পর্যন্ত করেন না। আজ যদি হিন্দুস্থানের রাজশক্তি সন্থানী-সম্প্রাদায়ের হাতে আসে, তবে ওই রাজেন্দ্র গিরি

গোস্বামীই তো প্রধান হবেন। অস্থমান করতে পার, কেমন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে ?

কেশবানন্দ আশ্রুষ ধীরতার সঙ্গে কথাগুলি শুনলেন, তারপর বললেন, শুসুন শুরু মহারাজ, আমি আপনাকে বলি। আপনি ধর্মনীতি জানেন, রাজনীতি জানেন না বা বোঝেন না। রাজেন্দ্র-গিরি গোসাইরা শক্তিমান হর্ধর্ব; ওরা লড়াই করে, লড়াই জিততে জানে। কিছ্ক ওরা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আজ দিল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাদশাহের আমল চলে গিয়েছে। উজিরের আমল এসেছে। মূরশিদাবাদের হাজী আহম্মদের দিকে তাকান। শুরু মহারাজ, শিশুকে শুরুর আদেশ মানতে হয়, শুরুকেও শিষ্যের পরামর্শ শুনতে হয়। আমার পরামর্শ শুসুন। অগ্রথায়, গুরুর অভিশাপ যেমন শিষ্যকে লাগে শিষ্যের অভিশাপও ঠিক তেমনি ভাবেই কিয়া করে গুরুর উপর। আজু আমরা প্রতিটি শিষ্য একমত। আমাদের অনুর্বোধ রাখুন, পরামর্শ শুনুন, না হলে—

তার চোথের দিকে তাকিয়ে শক্ষিত হলেন মাধবানন্দ। প্রচ্ছন্ন আগুন যেন দৃষ্টির উত্তাপে আভাস দিচ্ছে। কথা অসমাপ্ত রেখেই শুদ্ধ হয়েছিলেন কেশবানন্দ। মাধবানন্দ সেই কথাটি ধরেই প্রশ্ন করলেন, না হলে গুরুবধেও ভোমরা নিরস্ত হবে না ?

- —না, সে পাপ করব না। আপনাকে পদু করে খেলার পুতুলের মত সামনে ধরে রেখে আমরা কান্ধ করে যাব।
 - —আমাকে বন্দী করবে ?
- —বন্দী নয়। অহন্ত মতিভ্রাস্ত গৃহকর্তাকে যে যত্ন এবং সম্রমের সঙ্গে সর্বদাই চোথে চোথে রাখতে হয়, তাই রাখব। ভোরবেলা আপনি ফিরে এসে যখনই আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, তখন থেকেই সেই যত্নে সেই ভাবেই আপনি আছেন গুরু মহারাজ্ব।

এবার মাধবানন্দ শুম্ভিত হয়ে গেলেন। লক্ষ্য করলেন, ছটি তরুণ শিষ্ট ছই দিকে নিম্পৃহের মত সামনের দিকে তাকিরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভারা যে অতি সতর্ক তাতে সন্দেহ নেই।

কেশবানন্দ আবার বললেন, আপনি আগুন জেলেছেন। সে আগুন

বগন জলেছে তথন তার গতি নির্ধারিত হবে বায়ুর ঘারা, তার সমুখে বিস্তৃত দাহ্যবন্ধর পরিমাণের ঘারা। গুরুমহারাজ, আজ এ উত্তমকে ঠেকাবার শক্তি কারুর নাই। চারিদিকে আরোজন গুরু হয়েছে। এ আয়োজন মহাকালের অভিপ্রায়। বর্ষায় যেমন সকল বীজ অঙ্গ্রিত হয়ে সবলে মাটি ঠেলে ওঠে, তেমনি ভাবে এর অভ্যুদয় হচ্ছে। গুরুন, ওপারের স্থপুরে আনন্দ-চাদ গোস্বামী—সামান্ত একজন বৈষ্ণব গুরু, সেও গড় তৈরি করছে। আমাদের আজ আপনি নিবৃত্ত হতে বলছেন কিন্তু যেদিন রাধাকে নির্বাসিত করে গুরু কংসারিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, হাতের বাঁশি ফেলে দিয়ে চক্র এবং অসি হাতে দিয়ে তাঁকে ভজনা করতে বলেছিলেন, সেদিন এ-কথা ভাবেন নি কেন প

- কংসারিকেও পরিশেষে প্রভাসে যতুবংশ-ধ্বংস স্বচক্ষে দেখতে হয়েছিল কেশবানন্দ।
- উপায় নাই গুরু মহারাজ, দেগতে হয় দেখব; কিন্তু কংসারিকে যথন ভদনা করেছি তখন কুফুক্তেত্তের দিকে অগ্রসর আমাদের হতেই হবে।

॥ একাদশ পরিচেছদ ॥

কেশবানন্দ যে সংবাদ পেয়েছেন স্থপুরের আনন্দর্চাদ গোস্বামীর গড় তৈয়ারি সম্পর্কে, সে সংবাদ মিধ্যা নয়। সংবাদটা এখনও সকল লোকে জানে না। যারা গড়ের গড়নকাক্ষ দেখেছে তাদের মধ্যেই সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়েছে, যেন 'গড় গড়' মনে হচ্ছে।

व्यानमाठीम नय-वृक्षायन देखति कत्राष्ट्रितन। यमूना-श्रृतिन, बामग-यन, গিরি-গোবর্ধন, রাস-মঞ্চ, দোল-মঞ্চ, ঝুলন-মঞ্চ ইত্যাদি বুন্দাবনের অন্তুকরণে প্রীক্লফের লীলাভবনগুলি প্রকট করবার আয়োজন করেছেন অনেক দিন থেকেই। রাস-মঞ্চ, ঝুলন-মঞ্চ, দোল-মঞ্জুলি তৈরি হয়েছে প্রথমেই। এখন তৈরি হচ্ছে যমুনা-পুলিন এবং ঘাটগুলি; লম্বা নদীর আকারের ঝিল কাটা হচ্ছিল এবং চারিপাশে চারটি সিংহছার তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ লোকের একদিন চোখে পড়ল যে, ঝিল-কাটা মাটিগুলি থেকে যে পাড় তৈরী হয়েছে. সে পাড় আর গড়বন্দীর পগার অর্থাৎ মাটির তৈরী স্থদৃঢ় গড়বেষ্টনীতে কোন তফাত নেই। এবং সেই বেইনীর উপর এমন ঘন করে গাছের ভাল কেটে লাগানো হরেছে যে, আগামী হুটো বর্ধার জল পেয়ে ভালগুলি সজীব বুক্ষে পরিণত হরে হুর্ভেন্ত বৃক্ষবেষ্টনীতে পরিণত হবে। মানুষ দূরের কথা, সে বেষ্টনী পার হয়ে শেয়াল-কুকুরও ঢুকতে পারবে না। তীর দ্রের কথা, বন্দুকের গুলিও সে বেষ্টনী ভেদ করতে পারবে না। এবং চারপাশে যে চারটি ফটক তৈরি হচ্ছে তার চেহারাও ঠিক গড়ের ফটকের চেহারা নিচ্ছে। তবে এটা এখনও ঠিক, সর্বসাধারণের চোখে ঠেকবার মত গড়ন নেয় নি। যারা হাতেমপুর রাজনগর প্রভৃতি গড়ের চেহারা দেখেছে, তাদের মধ্যে যারা চতুর বৃদ্ধিমান, তারাই এটা ধরতে পেরেছে।

ত্-একজন এ নিয়ে একটু থোঁজখবরও করেছে। তাতে তারা যা গুনেছে, সে শুনে তারা বিশ্বিত না হয়ে পাবে নি। তারা শুনেছে য়ে, আপনা-আপনি অর্থাৎ যারা কাজকর্ম করছে হাতে-হাতিয়ারে, তাদের অজ্ঞাতসারেই এমনি চেহারা হয়ে যাছে। অর্থাৎ আঁকার্বাকা ঝিল কেটে নাটি ফেলে পাড় তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেল য়ে, ঠিক গড়বন্দীর পগার হয়ে গেছে। ফটক তৈরি করতে গিয়ে রাজ্মিস্ত্রীদের অজ্ঞাতসারেই গড়ের ফটক হয়ে যাছে।

আনন্দটাদ বলেছেন, ভামস্করের অভিপ্রায়ে হচ্চে। কী অভিপ্রায় এখনও বলেন নি।

আনন্দটাদের কথায় অবিশাস করবে কে? গোস্বামী এ অঞ্লে সিদ্ধপুরুষ বলে স্থপরিচিত। গৃহস্থ বৈষ্ণবদের সর্বপ্রধান গুরু, মাথার মণি। বিচিত্র মাহ্র। যুগলভাবের উপাসক, ভাবুকচুড়ামণি রসিকদের মহাজন অথচ নারী-সংস্পর্শহীন বন্ধচারী, অক্লডদার। বিপুল বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী, অথচ নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। বিষয় তাঁকে অর্জন করিতে হর না, বিষর তাঁর কাছে এসে প্রার আত্মসমর্পণ করে। এ অঞ্চলের গৃহস্থ গৈঞ্চবদের যারা সম্ভানহীন বা নিকট-উত্তরাধিকারীহীন, তাদের অস্তে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন আনন্দটাদ। তাদের পারলৌকিক ক্রিয়ারও দায় তাঁরই। তাঁর এ অধিকার বৈষ্ণব গৃহস্থ-সম্প্রদায়ই দিয়েছে। লোকের বিশ্বাস, আনন্দটাদ যাদের পারলৌকিক ক্রিয়া করেন, তাদের সংসার-জীবনের কর্ম যাই হোক না কেন, মোক্ষ তাদের অবধারিত। এমন অনেক ভক্ত আছে যারা নিংসস্তান হয়েই মৃত্যু কামনা করে, যাতে তার পারলৌকিক ক্রিয়ার দায় আनम्हों एतत्र छे पद शिरा पर्छ। এই ভাবেই আপনা থেকে निभून विषद् স্মানন্দটাদের হাতে এদেছে। সে-বিষয় স্মানন্দটাদ তাঁর উপাশু দেবতা শ্রামম্বন্দরকে সমর্পণ করেন, তাঁরই দেবক হিসাবে পরিচালনা করেন-নিজে নিবাসক সন্নাসী।

বাউল-বৈরাগীদের এই অধিকার ছিল ইলামবাজারের প্রেমদাস মহাস্থের। এখন তার উত্তরাধিকারিণী ক্লফানী মা-জীর।

এ নিয়ে প্রেমদাস মহাস্তের সঙ্গে আনন্দটাদের একটা নাকি আপোস-

মীমাংসা হরেছিল। সে অনেক দিনের কথা, পঁচিশ বছর পূর্বের কথা। অবশ্য সুবুই লোকের কথা। লোকপ্রবাদ।

তথন বৈষ্ণবভষ্কে সাধনকামী বছ লোক সিদ্ধ পুরুষ বাউল বৈরাগী প্রেমদাস বৈরাগীর কাছে যারা দীক্ষা নিত বা সাধন ভজন শিক্ষা নিত, তাদের উপর এবং এই বাউলদের উপর প্রাহ্মণ গুরু গোসাইরা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যারা দীক্ষা নিত তাদের পতিত করবার বিধানও তারা জারি করেছিল, কিন্তু জাতহীন কুলহীন বাউলদের কী করবে তারা? ওদিকে পরকীয়া-মতে বিশেষ তন্ত্রে সাধন-ভজনের স্রোত এমনি প্রবল যে, এ বিধান সন্ত্রেও গোপনে প্রেমদাসের গুরুগিরি প্রায় অবাধে চলত। ব্রাহ্মণেরা অনেক-কিছু নতুন মতের প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা অর্থাৎ গুরু-পেশাধারী ব্রাহ্মণেরা বাড়িতে প্রায় হাট বসিয়ে দেবতার সেবা বসিয়ে দিয়েছিলেন। একটি থড়ো আটচালা নাটমন্দিরের চারিদিকে কালী হুর্গা শিব রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করে ফুল বেলপাতা তুলসীপত্র আতপ চাল এবং গুড় দিয়ে যথাসাধ্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। নিজে শাক্ত শৈব বৈষ্ণব যে মন্ত্রের উপাসক হোক, যে-কোন মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তাদের ছিলই, এবার সে ব্যবস্থাকে ফলাও করে প্রায় বীজমন্ত্রের ব্যবসা খুলে দিল।

প্রেমদাস হেসে বলত, বামুন মশাররা থেয়া ঘাট ডাক নিয়েছেন গো।
কড়ি দিয়ে মস্কর নিলেই লায়ের জায়গা কেনা হয়ে যাবে। বছরে বছরে
পেনামী আর ছেরাদের সময় গুরুবরণ স্থশযো দিয়ো, তা হলেই ওপারে
নালনকাননে মৌরুসী পাটা কেনা হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে শাক্ত ব্রাহ্মণের। অট্টহাসি হাসতেন। বলতেন, পটোদের পট দেখেছিস? নরকের সাজা? ফ্রাড়ানেড়ীদের গ্রম তেলে ফেলে ভাজবে। সশব্দে বলতেন, চ্যাক—কলো কলো। ওপথে ওই গতি।

শুধু ব্যঙ্গ-রহস্টেই এমন বিষয়ের শেষ হয় না। মান্নষের অস্তরের তৃষ্ণা অক্টেজিম, সে স্থ্রায় মেটে না, সে শরবতেও মেটে না। সে জলধারার উৎসের জন্ম ব্যাক্ল। সেই ব্যাক্ল প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ-গুকরা শান্তের নজির ক্রেখিরে শিয়ের রাশিনক্ষত্র বিচার করে, চরিত্র এবং রুচি বিচার করে তদম্যায়ী বীজমত্ত্বে দীকা দিয়েছেন এবং ভরসা দিয়ে বিশাস করতে বলছেন, এই নির্মল জল। অধিকাংশ জলই অশ্বথমার পিটুলি গোলা জল। পান করে হৃদ্ধপানের স্বাদ পেয়েছে বলে বিশাসও করেছে। স্থপুরের ভট্টাচার্য-বংশ বিখাসত গুরুবংশ। এই বংশের ব্রজমোহন ভট্টাচার্য সিদ্ধ শক্তিসাধক। পাগল মার্ম্ময়। তিনি নিজে কাউকে দীক্ষা দেন না। কিছ্ক কেউ তাঁদের পাটে মন্ত্রদীক্ষা নিতে এলে তিনি বীজ বিচার করে দেন অলৌকিক উপায়ে। তিনি বলেন, যা, ওই বাড়ির পিছনে পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখ, জবার গাছ আছে। যা তুলে আন্। ঢেকে আনবি। যেন আলোনা লাগে। বুঝলি ?

সে ফুল তুলে নির্দেশমত ঢাকা দিরেই নিয়ে আসে। ক্যাপা ভটচাক্ত বলেন, খোল ব্যাটা, ঢাকা খোল, দেখি।

খুললে দেখা যার কারুর জবাফুল জবাফুলই আছে। সে শক্তিমত্তে দীক্ষা পার। কিন্তু কারুর জবাফুল মালতীফুল হয়ে যার। কারুর হয়ে যার ধুতুরা। যার ফুল মালতী হয় তাকে নিতে হয় বৈঞ্বমত্তে দীক্ষা। যার হাতে জবা হয় ধুতুরা—তার ইষ্ট হল শিব।

এ ছাড়া আরও আছে—কোষ্টি বিচারে ত্রিপাপ প্রভৃতি তৃঃসুমরে গ্রহশান্তি যাগের ব্যবস্থার নবগ্রহের শক্তি দেবতা দশমহাবিদ্যার নবমহাবিদ্যার
অর্চনা ছাড়া গ্রহ্মাগ হয় না। সে সব সমরে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ছাড়া গতি
থাকে না। এর ফলে বৈষ্ণব ধর্মের যতই প্রসার থাক্, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের
প্রভাব ছিল অব্যাহত। কাজেই তান্ত্রিকদের কাছে বৈষ্ণবদের খাটো হয়ে
থাকতে হত।

লোকে বলে, এই অঞ্চলে বৈরাগীদের ও বৈষ্ণব-গুরুদের সঙ্গে আহ্মণগুরুদের বিরোধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন আনন্দর্চাদ।

আনন্দটাদেরা পুরুষাসক্রমে স্থপুরের ভটচাক্স-বংশেরই শিশু। এবং তাঁরা শক্তিমন্ত্রের উপাসক ব্রাহ্মণবংশ। এই বংশের সস্তান আনন্দটাদ জন্ম থেকেই অসাধারণ। রূপে অসাধারণ, অপরূপ রূপবান। তেমনি স্থক্ঠ, তেমনি মেধা। প্রকৃতিতেও তেমনি অসাধারণ, এমন কি দেহপ্রকৃতিতেও। মাছ-ভাতের দেশ বাঙাল দেশের শাক্তবংশের ছেলে, সেই ছেলের জানাবধি অফটি আমিষে, এমন কি মাছের সংস্পর্শবৃষ্ট খাতা পেটে গোলে আনন্দটাদ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বাল্যকাল থেকেই ধর্মে আসক্তি আনন্দটাদের। ভালবাসতেন রাধারুফের যুগলমূতি।

উপনয়নের পর দীক্ষার জন্ম গিয়েছিলেন থোদ ব্রজমোহন ভট্টাচার্টের কাছে।

ক্ষ্যাপা ভটচাজ আনন্দটাদকে দেখে খুব খুনী হয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ওরে—ওরে—ওরে, তোর গলায় পৈতে ক্যানে রে! আঁয়? তুই তো দ্বাপরে ছিলি গোয়ালিনী, তুই তো রাধা রে। নতুন সাধন করতে এসেছিস এ জন্ম।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আনন্দটাদ।

ভটচাজ বলেছিলেন, তোর মনে নাই। তুই কুঞ্জবনে কালার সঙ্গে পীরিত করেছিলি, কুটিলে তোকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে বলে আয়ানকে एडरक निरम् थन। पृष्टे वननि-कौ इत्त कानांगां ? कानांगां वनत-ভয় কী? আমি কালী হচ্ছি, তুমি আমাকে পূজা কর। কালা হলেন কালী, মালতীমালা হল জ্বার মালা, খেতচন্দন হল বক্তচন্দন। দেখে শুনে আয়ান খুশী হল। রাধার মান বাঁচল। কিন্তু তার মাওল দিতে হবে তো। এ জন্মে তোকে কালীকে কালা করতে হবে রে। জবাফুলকে মালতীফুল করতে হবে। হ্যা, দীক্ষা তোকে আমি নিজে দোব। এই কালী-মছে। সাধনা করতে করতে একদিন সামনে দেখবি, কালী হলেন कानाठानः भक्तियोज राष्ट्र यात्य देवस्वययोजः। ज्य नार्टे त्व, ज्य नार्टे। शत्नव আনা হয়ে আছে, বাকী এক আনা—আপনি হবে রে, আপনি হবে। কালীর সামনে আসন করে বসলেই বুকের ভেতরটা থালুবালু করবে, টনটন করবে, চোখ থেকে জলের বান ডাকবে; সেই জলের অভিষেকে কালী হবেন কালা। মুগুমালা হবে বনমালা। জবার মালা হবে মালতীর মালা, অঙ্কের রক্তের मांग धूरम यारत। বোস্ রে বেটা, বোস্। দিয়ে দি কানে ফুঁ। জয় কালী— জর কালী-জয় কালী।

আনন্দটাদকে তিনি শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। আনন্দটাদ বলতে পারেন নি, না না। আমাকে বৈষ্ণব যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দাও। কঠিন মর্ম-যন্ত্রণা ভোগ করতে হরেছিল আনন্দর্চাদকে। মধ্যে মধ্যে চিংকার করে উঠতেন ঘুমের ঘোরে। সেই মর্মযন্ত্রণার অধীর হয়ে তিনি গিরেছিলেন বৈরাগী বাউল সাধক প্রেমদাস মহাস্তের কাছে। গিরে তিনি ভূল করেছিলেন। প্রেমদাসের সিদ্ধি ছিল যোগিনী-বিভার সিদ্ধি; শুদ্ধ ভগবংসাধনার সিদ্ধি থেকে সেই সিদ্ধি নীচের গুরের সিদ্ধি। অপ্তাদশ শতান্দীর প্রথম ভাগ তথন, তথন ডাকিনী যোগিনী পিশাচ প্রভৃতি নানান ধরনের সাধনা ও সিদ্ধির বিশ্বাস এবং অন্তিত্ব বিপুল এবং প্রবল। প্রেমদাস আনন্দর্চাদের মত এমন সর্বস্বলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে, বিশেষ করে তান্ত্রিক ভট্টাচার্যের শিশুকে, মন্ত্রভিক্ষার্থী হিসেবে পেয়ে আনন্দে উল্লাসে হ হাত তুলে নেচেছিল এবং আনন্দর্চাদকে যোগিনী-বিভা দিয়ে এক রাজের সাধনার সিদ্ধি পর্যন্ত পাইরে দিয়েছিল। বলেছিল, জয় গুরু! জয় গুরু! তোমার জ্যেই তো বসে আছি গো—পরমধন নিয়ে। দোব—আজই দোব। এই রাজেই দোব। গ্রামা শ্রাম হবে চোথের পলকে—ভাবনা কিসের ?

দিন দেখে নি, ক্ষণ দেখে নি, আনন্দটাদকে দীক্ষা দিতে বসে গিরেছিল। আমামূর্তি সত্যসত্যই নটবর বংশীধারী আমক্রণে প্রকট হয়েছিলেন আনন্দটাদের চোথের সম্মুথে। কিন্তু শুধু আম, পাশে রাধার প্রকাশ হয় নি।

আনন্টাদ বলেছিলেন, রাধা কই মহাস্ত ? রাধা ?

মহাস্ত বলেছিলেন, তাই তো ঠাকুর!

ভটচাজ বলতেন, প্রেমদাস ডাকিনী-সিদ্ধি প্রভাবে আমাম্ভিকে আম-বিগ্রহে রূপান্তরিত করেছিল। ডাকিনী-সিদ্ধির প্রভাবে অলৌকিক অনেক কিছু ঘটানো যায়, কিছু আসলে তা 'মায়া'র খেলা মাত্র; সত্য নয়।

শেষ পর্যস্ত প্রেমদাস নিজেই এ-সত্য স্বীকার করে বলেছিল, ঠাকুর, এর পর তোমাকে সাধন করে আসল সিদ্ধি পেতে হবে। আমি তোমাকে ডাকিনী-সিদ্ধি দিয়েছি। আর এর সঙ্গে যদি বামুনের জাত পৈতে সব ফেলে দিয়ে আমার মত হাড়া বৈরেগী বৈরেগিনী নিয়ে ভদ্ধন করতে পার—

আনন্দটাদ তা পারেন নি। মুহুর্তে খ্রাম আবার খ্রামা হরে উঠেছিল। তিনি স্ভরে আসন ছেড়ে উঠে বলেছিলেন, না। না।

প্রেমদাস বলেছিল, এ:, স্থাংটা মেষের ভূতো ছেলে ভটচাল বামুন মুড়ো

মেরে দিয়েছে। বামুনের সাধন মোক্ষম বাবা। এ একদিনের কাজ নক্ষঃ সময় লাগবে। তুমি ভেক নিয়ে বৈরেগী হয়ে এইখানে থাক—মস্কর-তন্তর দেব-দেবী বাদ দাও। মালাচন্দন করে বৈরেগিনী নিয়ে শুরু কর—

আনন্দ বলেছিলেন, না। তখন তাঁর সম্বিত ফিরেছে।

প্রেমদাস তথন বলেছিল, তা হলে ঠাকুর, আমার দোষ নাই। তোমার বিদেষ্ট। কিন্তু আমার কাছে যা হোক কিছু পেলে তো, তা তার দক্ষিণে তো আমার পাওনা বটে।

আনন্দ বলেছিলেন, বল, কী চাও?

প্রেমদাস বলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি গো, তুমি এ অঞ্চলের স্বচেরে বড় গুরু হবে বৈষ্ণব সমাজে। বল, আমাদের বাউলদের ওপর তুমি বিধেন দেবে না। বাক্যি দাও।

वानम रामहितन, मिनाम।

- —বল গোর্সাই, আমাদের বৈরেগী-বৈরেগিনীরা যা করবে তা নিয়ে দেশের মাঝে দশে যে রটনাই করুক, তুমি কিছু বলবে না। ঠাকুর, মনসার কথার সেই কথা গো—যা গেল দেখবে তা মুখে বলবে না কোন লোকে, স্থায়ে মাডে পাতালে কোনখানে, কারুর কাছে। দেবতা পাপ বলুক, মাছ্য পাপ বলুক, দৈত্যি পাপ বলুক, তুমি বলবে না।
 - --বলব না।
- —আমাদের পাওনায় আমাদের পথে আমাদের ঘাটে আমাদের হাটে তুমি হাত বাড়াবে না।
 - --বাড়াব না।
- —বাস্। তোমাকে যা দিয়েছি তা তোমার পারের কড়ি না হোক, ভবের হাটের মূলধন হবে বাবা।

সিদ্ধ তান্ত্রিক ব্রদ্ধ ভটচাজের কাছে এ সংবাদ অগোচর থাকে নি। সেই রাত্রেই তিনি ধ্যানযোগে জেনেছিলেন। পরের দিন প্রত্যুয়ে আনন্দর্চাদ ক্লাম্ভ দেহমন নিয়ে গ্রামে ফেরবার পথে ভটচাজ পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন, করলি কী? ওরে ব্যাটা, এ তুই কী করলি? যোগিনী-দিদ্ধি পেরে পূর্ণসিদ্ধির পথে কাঁটা দিলি? ছি ছি ছি ছি । তুই পনর আনা

নিরে জনেছিল। আমি তোকে দীকা দিয়ে পনর আনা তিন পরসা করে দিয়েছিলাম রে ব্যাটা। শোন্রে ব্যাটা। ওই বৈরেগী ব্যাটার যোগিনী-মন্ত্র নিয়েছিলাম রে ব্যাটা। শোন্রে ব্যাটা। ওই বৈরেগী ব্যাটার যোগিনী-মন্ত্র নিয়ে তুই জাত্রবিদ্যা পেরেছিস—যা কালীর কালা হাওয়া দেখেছিস সে হল তেজীবাজি। ওতে আমি যে তিন পরসা তোকে দিয়েছি তার এক পয়সা তুই হারিয়েছিল। এই ঘাটতি তু পয়সার এক পয়সা যদি বা তুই সাধনভজনে প্রণ করতে পারিস, এক পয়সা ঘাটতি তোর থেকেই শোবে এ জয়ে। শোন্, তোর ষোল আনার পথে ছটো 'রা'য়ের কাটা ছিল। এক রাধা আর এক রাজ্য। মেয়ে আর মাট। তা তোকেই 'রাধা' বলে মন্ত্র দেবার সমর মেয়ের বাধা আমি ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওদিকে তোর মন কিছুতেই যাবে না, ভূলবে না। কিন্তু 'য়াটি' 'রাজ্য' তোর পথের এমন কাটা হয়ে রইল যে, কাটা এজয়ে ঘুচবে না। যে জাত্মন্ত্র যেচে নিয়েছিস সেই মন্ত্রই মাটি এনে তোকে মালিক করে দেবে। শোন আরও বলি—

ভটচাজের কথা মিথ্যা হয় নি। আনন্দটাদের অলৌকিক শক্তির খ্যাতি কিছুদিনের মধ্যেই এমনভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, বৈষ্ণবমন্ত্র-অভিলাষী গৃহস্থ-সম্প্রদার দলে দলে তাঁর পায়ে এসে গড়িয়ে পড়ল। অলৌকিক শক্তির প্রকাশ আনন্দটাদ ইচ্ছে করে দেখাতেন না, কার্যকলাপে ঘটনা-সংস্থান এমনিই হয়ে উঠত যে প্রকাশে তিনি বাধ্য হতেন। তথন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম; মন্ত্রসিদ্ধির যুগ; সে যুগে আনন্দটাদের সিদ্ধবিত্যা নিজিয়া স্থা থাকবার নয়, থাকেও নাই।

প্রথম খুসটিকুরির সিদ্ধ পীর সৈয়দ হোসেন সাহেব তাঁকে উপঢৌকন দিতে মাংস নিয়ে এলে আনন্দটাদ সেই রক্তসিক্ত মাংসকে রক্তরাঙা গোলাপ- ফুলে পরিণত করে তাঁর আলৌকিক শক্তি প্রকাশে বাধ্য হন। এ ছাড়া তাঁর উপায় কী ছিল?

ভটচাজ তথনও বেঁচে, তিনি হা-হা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ওবে, দাপ যতই লুকিরে রাখ, ফোঁদ সে করবেই। সাপের ওঝা সাপ না ধরেও থাকতে পারে না, কামড়ও খার, মরেও ওতেই।

এর পরই ঘটে আর-একটি ঘটনা। যে ঘটনার আনন্দটাদের জীবনের পথ এবং গতি নির্দিষ্টরূপে নির্ধারিত হয়ে যায়। আনন্দটাদ গিরেছিলৈন

মকর-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে কদমথগুীর ঘাটে অজয়ের প্রবাহের ধারে গঙ্গাস্পানের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্ম। বহু জন-সমাগমের মধ্যে এসেছিলেন এক সম্ভানহীনা তরুণী বিধবা ধনী-গৃহিণী। সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের স্থন্দরী। এই গৃহিণীটির সমাজে থ্ব স্থনাম ছিল না। না-থাকারই কথা। বিবাহ হয়েছিল ৰুদ্ধ ধনীর সঙ্গে, বৃদ্ধের চতুর্থ পক্ষে। বৃদ্ধের বড় আকাজ্ফা ছিল একটি সম্ভানের। সম্ভান একটি হয়েছিল। তার পরই বৃদ্ধ গত হন। বিধবাই হন পুত্রের মাতা হিসাবে সম্পত্তির একচ্ছত্রাধিকারিণী। তার পরই এই তরুণ বয়সের প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং সম্পত্তির প্রভাবে শক্তির মত্ততার প্রায় ষেচ্ছাচারিণী হয়ে ওঠেন। ফল পেতেও দেরি হয় নি, পাঁচ বৎসরের স্থন্দর ছেলেটি মারা যায়। লোকে ভেবেছিল, এই আঘাতে তাঁর চৈতন্ত হবে; কিন্ত আশ্চর্যের কথা ফল হয়েছিল বিপরীত। বিধবাটি যেন বন্ধনহীন হয়ে স্বেচ্ছাচারে প্রমন্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এই ধরণের মেলায় তীর্থে যেতেন বিপুল সমারোহ করে, উদ্দেশ্ত পুণ্য সঞ্চয় নয়, প্রমন্ততার ঘূর্ণাবর্তে অবগাহন করা। জামদেবের মেলায় আনন্দটাদকে দেখে তিনি উন্মন্ত হয়ে উঠে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। আনন্দটাদ একটু হেসে বলেছিলেন, আমি তো ষেতে পারব না, তাঁকে আসতে বল এইখানে। প্রমন্তা বিধবা তাই এসেছিলেন এবং এসেই শুম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফাটিয়ে চিংকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, গোপাল—আমার গোপাল—ওরে গোপাল! তুই হাত বাড়িয়ে আনন্দটাদের দিকে করেক পা এগিরে এদে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন. তুমি কে ? তুমি ? আনার গোপাল কই ? আমার গোপাল ?

প্রবৃত্তি-প্রমন্তা বিধবা আনন্দটাদের কাছে এসে তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন তাঁর মৃত সন্তানকে। মনে হয়েছিল তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সেই সন্তানটি বসে আছে। তু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে এসে দেখলেন, কোথায় গোপাল ? গোপাল নয়, বসে আছেন আনন্দটাদ।

আনন্দটাদ হেসে বলেছিলেন, কেন মা, এই তো আমি তোমার গোপাল

বিধবা আবার আনন্দটাদের মধ্যে তাঁর মৃত সম্ভানকে দেখেছিলেন। এবং এর পর আছাড় থেয়ে পড়েছিলেন আনন্দটাদের পারের উপর। চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল বিধবার প্রবৃত্তির তাড়না। তৃটি পা ধরে স্বীকার করেছিলেন জীবনের সকল পাপ।

আনন্দটাদ বলেছিলেন, সব পাপ তো চোথের জলে ধুয়ে আমার পায়ে ঢেলে দিলে, আবার ভয় কী ?

বিধবা বলেছিলেন, আবার যদি সেই মতি জাগে ?

- —জাগবে না। আমি তোমায় মন্ত্র দেব। সেই মন্ত্রজপে রক্ষা পাবে। কয়েক মুহূর্ত শুরু থেকে বিধবা বলে উঠেছিলেন, নানানা।
- **—কেন** ?
- —আমার গোপালকে তো তা হলে দেখতে পাব না তোমার মধ্যে! তুমি যে আমার গুরু হবে!
 - —তবুও পাবে। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।
- —তা হলে আর এক শর্ত করতে হবে। আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তি তোমাকে নিতে হবে। আমি নিশ্চিম্ভ হয়ে হ্রথে চোথ বুজব, জ্ঞেনে বাব, আমার ধন আমার গোপাল পেলে।
 - —নেব। কিন্তু আমার দেবতার নামে নেব।
 - —দে তোমার যা খুশি।

বিধবাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে তাঁর পরলোকের ভার নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন আনন্দর্চাদ। সংবাদটা সেই দিনই সেই মেলার জনতার মারফতে দিকে দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

ব্রজমোহন ভটচাজ হা-হা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, আমি জানি, আমি জানি। মাটির চোরা বালিতে বেটার পা ডুববেই। ডুবল। শেষ পয়সা খামতি থেকে গেল, থেকে গেল, থেকে গেল—জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী!

এ কথা কানে পৌছলে আনন্দটাদ চমকে উঠেছিলেন। কিছু তখন আর উপায়াস্তর ছিল না। যে কর্ম তিনি করেছেন তার ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সে ফল সারা জীবনই পেরে চলেছেন। আজ গৃহস্থ বৈষ্ণবদের গুরুর গুরু তিনি। উত্তরাধিকারীহীন গৃহস্থ বৈষ্ণবের সম্পত্তি আজ এসে তাঁকেই অর্সায়। ইষ্টদেবতা গোবিন্দের নামে তিনি গ্রহণ করেন। গোবিন্দের আজ বিপুল সম্পত্তি। ধর্মসাধনার সঙ্গে সে সম্পত্তিও তাঁকে পরিচালনা করতে হয়। বাউন বৈরাণী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারপর আর তিনি সম্পর্ক রাখেন নি। তবে তাদের শ্বেহ করেন। প্রেমদাস বাবাজীও তাঁর সম্প্রদারকে দ্বে দ্রে থাক্তেই বলে গেছে।

—তেলে জলে মিশ খায় না। ভূল আমারও, গোসাঁইয়েরও। তোরা আর ভূল করিদ না। যাদ না ওর কাছে, ওরও সহু হবে না, আমাদেরও না। তবে বাম্ন বৈরাগীর মস্তবে দিদ্ধ হলে রাজা হয়, দেখ্ চোখের ওপর। রাজদ্ববার গেরন্ডের জ্বন্তে, সম্পত্তিবানের জন্তে। আমাদের মত ভিখারীর জন্তে নর।

* * *

সেইদিনই কেশবানন চলেছিলেন এই আনন্দর্চাদের সঙ্গে দেখা করতে। वाखनवामी वृक्षिमान लालाजनयणि व्यानन्मठाम जिक्षशूक्य कि ना विठात करतन নি। বিচার করে বুঝেছিলেন আনন্দটাদ শক্তিমান এবং বুদ্ধিমান। বিলম্ব তিনি করবেন না। হয়তো বিলম্ব ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু এর আগে কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। সমন্ত সংবাদ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। শুধু আনন্দটাদেরই নয়, এথানকার সকল বধিষ্ণু লোকের নিভূল ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন এই চতুর বাজনীতিবিদ সম্যাসী। এবং নারকেলের মত ছোবড়া ছাড়িরে থোলা ভেঙে তাব শাঁস বের করার মত সমস্ত ইতিহাসের মর্ম উদ্যাটিত করে তার আসল সত্যটি আবিদ্ধার করেছেন। এককালের চতুর রাজকর্মচারীটি জানেন, লোকেরা লৌকিক জীবনে যত চুর্বল যত অসহায় হয় তত্তই তারা অলৌকিককে আঁকডে ধরতে চায়। না হলে তারা বাঁচতে পারে না। অবশ্য ধর্মসাধনায়, দেবমহিমায় অবিশাসী তিনি নন; কিন্তু তিনি জানেন সে বস্তু সিরুপ্রমাণ জলের মধ্যে বিন্দুপ্রমাণের মতই তুর্লভ। সেই বিন্দু যখন সিম্বুকে ব্যাপ্ত করে তাকে ছাড়িয়ে ওঠে—তার লগ্ন আছে সময় আছে। ত্রেতায় রামের আবির্ভাব, দ্বাপরে ক্লফ্রভগবানের আবির্ভাব ত্রেতা এবং দ্বাপরের এক খণ্ডাংশে। তার আগে চলে তাঁর আবির্ভাবের জন্ম লোকের তপস্যা। ক্ষীর আবির্ভাবের বিলম্ব আছে। তার পূর্বে সনাতন ধর্মকে রক্ষার জক্ত लोकिक **(**ठिष्ठात श्रायाक्रम श्राष्ट्र) स्म (ठिष्ठा श्रुष्ठ अनुतास्मत्र नार्म श्राय धर्मत বিচারের আয়েজনে সার্থক কথনও হয় না। সেখানে বিষয়বৃদ্ধি, রাজনৈতিক

চতুরতার প্রয়োজন সর্বাশ্রে। আজ সময়ের গুণে রাজনৈতিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান শক্তি ভাঙছে; স্বাভাবিক ভাবে মুঘল বাদশাহী শক্তির চাপে যে সব শক্তি চাপা ছিল তারা উঠছে। মঠ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবে শাসন-শৈথিল্যের স্বযোগে মাথা তুলছে।

হাতেমপুরের হাতেম খাঁ ফৌজদারের বিষয়বৃদ্ধি ছিল। এ অঞ্চলের বিদ্রেহী ব্রাহ্মণ রাঘব রায়কে দমন করে হাতেমপুরে গড় তৈরি করবার সময় এই সত্যটা সে ব্রেছিল। এই অঞ্চলের ক্ষুত্র একটি ঘটনার মধ্যে ভাবীকালের সংঘটনের আভাস অফভব করেছিল। সেই কারণেই, এ অঞ্চলের মঠ-মহান্ত, ব্রাহ্মণ, গুরুদের উপর—হিন্দু জমিদারদের অপেক্ষাও সতর্কতর কঠিন দৃষ্টি রেখেছিল। কোনও অজুহাতে সে কোনও মঠে বা মন্দিরে গড়বন্দী শক্ত পাঁচিল তৈরি করতে দিত না, নিদিষ্ট সংখ্যার বেশী পাইক রাখতে দিত না। হাতেম খাঁর মৃত্যুর পরই আনন্দর্টাদ গোস্বামীর নবর্লাবনের গড়ন বিচিত্রভাবে আপনা আপনি ঘারকার যাদবপুরীর গড়ন নিচ্ছে। ঝিল হচ্ছে গড়বাই, পাড় হচ্ছে গড়বন্দীর বাধ। সিংহ্মার তৈরী হচ্ছে চারটি। সিংহ্মার অক্তগুলির নীচে থেকে উপর পর্যন্ত যে বন্দুক্ধারী সৈন্সসাল্লবেশের স্বচতুর ব্যবস্থা থাকবে, সে সম্পর্কে কেশবানন্দ নিঃসন্দেহ।

আনন্দর্গদ সামাত গৃহস্থ-সন্তান। আর মাধবানন্দ, তাঁর ওক, জমিদার-সন্তান। আনন্দর্গদ গৃহী সন্ন্যাসী হয়ে সম্পত্তি অর্জন করে যে সত্যটা বুঝেছেন, মাধবানন্দ সম্পত্তি বর্জন করার জন্তই সে সত্যটা বুঝতে পারছেন না।

কেশবানন্দ দাঁড়ালেন।

এথান থেকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন আনন্দটাদ গোস্বামীর নবরুন্দাবনের সংগঠন। হাা। গোস্বামীর দ্রদৃষ্টি আছে। গড়টি দৃঢ় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কেশবানন্দের সঙ্গী বললে, ওই যে আনন্দর্চাদ গোস্বামী। ওই আসছেন। এই দিকে।

दक्षातानम व्याक यथारयांगा मंत्रामात्र मदक अत्मदक्त। मदक रक्त

আশ্রমবাসী ব্রন্ধচারী এবং গ্রামের চারজন পাইক সঙ্গে নিরে বেরিয়েছেন।
সঙ্গে আছে তাঁদের ধ্বজা। পাইকদের একজন দেখিরে দিলে সঙ্গী ব্রন্ধচারীকে।
ব্রন্ধচারী কেশবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।—এই দিকে। ওই আসছেন।

কেশবানন্দ দেখছিলেন গড়বন্দীর বাঁধ। চমৎকার হরেছে। সঙ্গীর কথায় দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালেন।

বাং, স্থম্পর স্থপুরুষ লোকটির মহিমা আছে।

আনন্দর্চাদ আসছিলেন, সঙ্গে একদল লোক—ভক্ত সম্প্রদায়।

কেশবানন্দ অগ্রসর হলেন। আনন্দর্চাদও তাঁদের ধ্বজা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দাঁড়ালেন। কিছু বললেন দলস্থ লোকেদের। দল থেকে ত্জন লোক তাঁদের দিকে এগিয়ে এল।

কেশবানন্দ হাত তুলে বললেন, জয়, কংসারি কাহাইয়ালালকি জয় !
আনন্দটাদের লোকেরা বললে, জয় শ্রামস্কার !

কেশবানন্দ বললেন, গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছি। ওপারের কংসারি মঠ থেকে আসছি আমরা।

— আস্থন আস্থন। শ্রামস্থলর আজ ভক্তের আগমনে তৃপ্ত হয়েছেন।
এরই মধ্যে একজন ফ্রতপদে এগিরে চলে গেল। সংবাদ দিল আনন্দচাঁদকে।

আনন্দটাদও অগ্রসর হলেন। কাছাকাছি হতেই সম্ভাষণ জানালেন, নমো নারায়ণায়!

প্রত্যাভিবাদনে নারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে কেশবানন্দ বললেন, ক্রাটি শীকার করছি, অনেক পূর্বেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমাদের কর্তব্য ছিল।

হেসে আনন্দটাদ বললেন, কর্তব্য আমারই ছিল আগে। যেহেতু না আপনারাই এখানে আগন্ধক। বিশেষ করে কেন্দুলীতে সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী বর্গীদের সঙ্গে আপনারা যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তাতে তার পরদিন থেকেই নিত্য ভাবি আপনাদের আশ্রম দর্শন করে আসব। কিন্তু—

'কিছ' বলে চুপ করলেন আনন্দটাদ।

কেশবানন্দ বললেন, অতিথিকে আতিথো কার্পণ্য অবশ্রই অধর্ম। কিন্তু

বিশ্বাস একটি কর্ম দেখেই করা যায় না। আপনার দোষ নেই গোস্বামী-গুরু।

- —না। সে জন্ম নয়। যেতে দিধা হয়েছে এই হেতু মহারাজ যে,
 আপনারা শ্রীমতী রাধাকে নির্বাসিতা করেছেন।
- —ধর্ম্বজ্ঞের কাল সমাগত হলে শ্রীমতীকে পশ্চাতে রেখে প্রভৃকে যেতেই হয় গোস্বামী-গুরু। ধর্ম্বজ্ঞ শেষ হলে কুরুক্ষেত্র এগিয়ে আসে। আপনার বৃন্দাবনে দেখছি যাদবপুর ঘারকার আয়োজন। এ পুরীতে হাতের বাঁশি প্রভূবাজাবেন কথন ? চক্রই বা ধরবেন কোন হাতে ?

কেশবানন্দের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আনন্দটাদ।
কেশবানন্দ বললেন, তত্ত্বের কথা কইতে আমি আসি নি গোস্বামী-প্রভূ।
তত্ত্বে আমি পারক্ষমও নই। সে কথা বরং কোনদিন আমাদের গুরুর সঙ্গের হবে আপনার। আমি এসেছি এইটুকু বলতে যে, রাত্রি তৃতীয় প্রহর সমাগত।
শিবাসংকেত শুনতে পাচ্ছি। আমরা, যারা তীর্থাত্রী, যে যে মন্দিরেই যাই না কেন, এ সময় আমাদের একসঙ্গে দল বেঁধে চলা উচিত নয় কি?

—আহ্ন, ভিতরে আহ্ন। এ আলোচনা তো পথে দাঁড়িয়ে হবে না। —চলুন।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতে কাতর কণ্ঠে 'ঠাকুর !' 'ঠাকুর !' বলে ডাক্তে ডাকতে কে এগিয়ে আসছিল। আনন্দর্চাদ ঘূরে দাঁড়ালেন। কে ? কী চার ? জ ছটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর। এমনি একটি গুরুতর ভাবনায় মন যথন ব্যাপৃত এবং সেই গুরুতর বিষয় নিরে আলোচনার জন্ম যে মুহূর্তে পা বাড়িয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তটিতে পিছু-ডাকার মত এই ডাক তাঁর ভাল লাগল না। মুথ থেকে আপনি বেরিয়ে গেল, কী বিপদ!

কেশবানন্দ বললেন, আপনার কোন শিক্সকে বলুন ওর আবেদন শুনতে। আর আমাদের আলোচনা অনেক পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। ওর এ ডাকে তাতে বাধা হয় নি। চলুন।

আনন্দটাদ একজন শিশুকে ওই লোকটির আবেদন শুনতে আদেশ দিয়ে কেশবানন্দকে নিয়ে তাঁর পুরীমধ্যে প্রনেশ করলেন। কয়েকটি বাঁক ফিরে একটি ঘরে চুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বে লোকটি চিৎকার করে ঠাকুরকে ডাকছিল, সে করো। কয়োর মত হতশ্রী মান্তবের চেহারাও এমন বিপর্যন্ত, কাদায় ধুলায় তার মাথা থেকে পা পর্যস্ত এমনই বিক্বত ও বিচিত্রিত যে, তাকে চেনবার উপায় ছিল না।

উপায়াস্তরহীন হয়ে সে এসেছে আনন্দর্চাদ গোস্বামীর কাছে। কাল রাত্রে মা-জী অর্থাৎ ক্লফদাসী নিকদেশ। করে। তার পিছন পিছন জরদেব-কেঁতুলীর শাশান পর্যন্ত গিয়েছিল, সে মাধবানন্দকেও দেখেছিল, মা-জীর দেই উন্নাদিনী উলন্ধিনী রূপ, তার সেই অভিশাপ দেওয়া, তাও দেখেছিল। তারপর সে তারই অমুসরণ করেই আসছিল। উলঙ্গিনী উন্নাদিনী আসছিল অজ্বয়ের শীর্ণ জলধারার পাশে পাশে বাল্চরের উপর দিয়ে। কয়ো সভয়ে দূরত্ব বন্ধায় রেথে আসছিল তটের উপরের পথ ধরে। এরই মধ্যে অন্ধকারে इंडो९ मायानाथ कृष्णनामी काथात्र शांत्रित शांह । काया जानक शुं रिक পায় নি। অবশেষে ভোরের সময় ক্লান্ত হরে ধুলোকাদা মেখে আথড়ায় ফিরে দেখেছে যে, আথড়াও শৃত্ত; মোহিনী নাই। আথড়ার দরজা থোলা, ঘরের দরজা থোলা, বিছানা জিনিসপত্র বিপর্যন্ত, মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে, মোহিনীর হাতের চুড়ি-ভাঙার টুকরো সকালের আলোয় ঝিকমিক করছে। আশপাশের লোকের কাছে সন্ধান করেও সংবাদ পায় নি। কেউ দের নি। ওই সংবাদ না-দেওরাতেই দে মোহিনীর সঠিক সংবাদ পেয়েছে, তাকে বর্বর অক্রের চরেরা চুরি বা ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই করো ছুটে এসেছে আনন্দর্ভাদ ঠাকুরের কাছে। আনন্দর্ভাদ এখানকার গৃহস্থ বৈষ্ণবদের গুরুর গুরু। অক্রুর, অক্রের বাপ যত পাষ্ণ্ডই হোক, নিজেদের তো বৈষ্ণব বলে! তোমার কথা অবশ্রই শুনবে। গোস্বামী ঠাকুর, মোহিনীকে বক্ষা কর-এই আবেদন জানাতে ছুটে এসেছে।

সে এসে টলতে টলতে বসে পড়ল সামনের ফটকে। ভাঙা কর্কশ কঠে ভাকলে, গোস্বামী ঠাকুর! ঠাকুর!

ঝড়ে-লাট-থাওয়া ভগ্নকণ্ঠ কাকের মতই তার সে কণ্ঠস্বর।

—ঠাকুর, তুমি বক্ষা কর অভাগিনীকে। ঠাকুর! ঠাকুর! ঠা-কু-র!

কেশবানন্দ এবং আনন্দর্চাদ তথন হিন্দুস্থানের রাজশক্তির প্রস্তর-কঠিন স্বরূপকে চোথের সামনে ধরে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করছিলেন। চুলের মত অসংখ্য সরু দাগ দেখা দিয়েছে তার সর্বাক্ষে। এই দাগগুলি ক্রমে ফাটলে পরিণত হবে। তার্পর একদিন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

কালতা কুটিলা গতি। যত্পতির মথুরাপুরী আছে, কিন্তু সে যাদব-গৌরব নাই। রঘুপতির সূর্যবংশ-গৌরবও ভেঙ্কে পড়ে। কালধর্ম।

— কিন্তু কালধর্ম পূর্ণ হয় প্রকট হয় মাস্থবের চেষ্টায় উভ্যমে। রাজা গিয়ের রাজা হওয়া তো নিতানৈমিত্তিক ঘটনা। সিংহাসন খালি থাকে না, পূর্ণ হয়ই। ধর্মের অভ্যত্থানের জন্ম স্বতম্ব বিশেষ পথ চাই গোস্বামী-গুরু। নদী অনেক নেমেছে পাহাড় থেকে। কিন্তু গঙ্গাজী যখন নামেন তখন স্বর্গ থেকে নামেন, তখন তাঁকে ধরবার জন্ম কল্রের মাথা পাতার প্রয়োজন হয়। আজ সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। আমি আপনার অস্ত্র-সংগ্রহের ভার নিলাম। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

ঠিক এই সময়টিতে কয়োর শেষ উচ্চারিত সর্বোচ্চ ক**ঠের দীর্ঘারিত** 'ঠা-কু-র' ডাকের শব্দ বদ্ধ দার ভেদ করে ক্ষীণ হয়েই অবস্থা ভেদে এল, কিব্ধ তার মধ্যেও কয়োর চেরা কর্কশ কণ্ঠস্বরের স্বরূপটি ঢাকা পড়ল না। তার সব্দে আরও ছিল মর্মান্তিক একটি আকৃতি। তারই স্পর্শে চমকে উঠলেন আনন্দ-টাদ।—কে । এমন আকৃতির সব্দে কে ডাকে । পরক্ষণেই একটু তিক্ত অথচ সকৌতুক ব্যঙ্গহাসি দেখা দিল তাঁর মূখে। বললেন, ও, ইলাম-বাজারের সেই ধর্মাধর্ম-জাতি-বিচারহীন উচ্ছিইভোজী বৈরাগী পশুটা ।

কেশবানন্দও কয়োর কণ্ঠশ্বর চিনেছিলেন, তিনিও হাসলেন, বললেন, পশুন্য—পক্ষী। কউয়া।

আবার ডাক ভেসে এল, ঠাকুর গো!

আনন্দটাদ বন্ধ ত্যারের দিকেই মৃথ ফিরিয়ে ডাকলেন, বাইবে কে রয়েছে ? বাইরে থেকেই সাড়া এল, আমি প্রাভূ, দীনদাস !

আনন্দটাদ বললেন, ইলামবাজারের ওই লোভী বৈরাণীটাকে থান্ত দিয়ে বিদায় কর। দেখ গত রাত্রের উদ্ভ থান্ত কী আছে! চিৎকার করতে নিষেধ কর।

- --করেছি প্রভূ। কিন্তু ও সেজগু চিৎকার করেছে না। থেতেও চার না।
- —থেতে চায় না ? কয়ো ? তবে কী চায় ?
- —কাল রাত্রে উন্নাদিনী ক্ষঞ্দাসী—প্রেমদাস মহাস্কের বেটার বউ কোথার চলে গিয়েছে। খুঁজে—
- —কী বিপদ! উন্মাদধর্মে কোথায় কোন্দিকে গিয়েছে, আবার আসবে। অবশ্য অপ্যাত ঘটলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তার আমি কী করব?
- আরও আছে প্রভু। ক্লফদাসীর ক্যাটিকেও পাওয়া যাচছে না। কাল রাত্রে আথড়ায় কারা ডাকাতি করে মেয়েটিকে নিয়ে চলে পিয়েছে। কয়ো বলছে, ইলামবাজ্ঞারের দে-সরকারের ছেলে অক্রুর। তার উদ্ধারের জ্ঞেই ও এসেছে, বুক চাপড়ে কাদছে।

আনন্দটাদ মূহুর্তে যেন আগুনের মত জবল উঠলেন। কী করবেন তিনি ? প্রেমদাসের কাছে যে বাক্য দান করেছিলেন, সে বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কৃষ্ণদাসীর আচার-আচরণের কোন কথাই তিনি তো না-জ্ঞানা নন। দে-সরকারের সঙ্গে সাধনভজনের নামে ব্যাভিচারের কথা , তিনি জানেন, দে-সরকারের ওই বর্বর পুত্রটার জন্ম কন্মাকে বিক্রি করার কথাও তিনি শুনেছেন। কিছু কোনদিন কোন শাসন করেন নি, কোন প্রেশ্ন করেন নি, ত্-চার জন বৈরাগী মহাস্তও তাঁর কাছে এসে এর প্রতিবিধানের জন্ম তার সাহায্য চেয়েছে; কিছু তিনি নীরব থেকেছেন, সাহায্য করেন নি। এই পরিণাম কৃষ্ণদাসীদের অনিবার্য। তিনি কী করে নিবারণ করবেন ?

কেশবানন্দ বললেন, ইলামবাজারের শেঠ দে-সরকার কি গোস্বামীপাদের শিশু ?

—আমার ভক্তের শিশ্ব। আমার নয়। পরক্ষণেই বিচিত্র হেসে বললেন, দে-সরকার বণিক। সে সর্বক্ষেত্রেই বণিক। গুরুর কাছে সে দীক্ষা নিয়েছে দক্ষিণা দিয়ে। দীক্ষা তার ধর্মের নামে ব্যাভিচারের জ্ব্য। পাপ করে সেই পাপ থেকে মৃক্তি পাবে দীক্ষাবলে—এই ছলনায় নিজেকে ছলবার জন্ম মহারাজ। গুরুকে এরা অর্থ দেয়, তাদের সর্ব কর্মে ধর্মে অধর্মে গুরুর সমর্থন পাবার জ্ক্ম। এদের আপনি জানেন না।

एट्ट क्यांनम् वललन, थूव कानि গোস্বামীপাদ। **आंगनात्र ए**एक्छ

বোধ করি বেশী জানি। শুধু গুরু নয়, রাজা গুরু ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই ওদের এক সম্পর্ক। হাতেমপুরের হাতেম খাঁর সঙ্গে দে-সরকারের সম্পর্ক খুব নিবিড় ছিল। জয়দেবের মহাস্ত মহারাজ আমাকে বলেছিলেন। যেদিন ওর ওই পাষও ছেলেটা ছল্মবেশী বর্গী সয়্যাসীদের সঙ্গে কলহ করে আহত হয়, সেদিন আমাদের গুরু মহারাজের দিকে থুৎকার নিক্ষেপ করেছিল। আমি ভবেছিলাম, ওকে শান্তি দেব। জয়দেবের মহাস্ত বলেছিলেন, ওকে ঘাটাবেন না, হাতেম খাঁকে আপনাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে। আমরা শক্ত হয়ে বসতে পারি নি বলে চুপ করে গিয়েছিলাম। শুনেছি ওর নিজের পাইকলাঠিয়ালের দলটিও নেহাত উপেক্ষার নয়।

আনন্দটাদ বললেন, ওকে আমি কঠোর সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করব। আর ওকে দণ্ড না দিলে ধর্ম বিরূপ হবেন।

কণ্ঠস্বর তাঁর গভীর ও গছীর হয়ে উঠেছে তথন।

কেশবানন্দ বললেন, এ সময়ে যা করবেন, গভীরভাবে বিবেচনা করে করবেন গোস্বামীপাদ। আগশনার বৃন্দাবন দারকা হয়ে উঠছে।

—মহারাজ, এ ঝিল এ গড় পুরনো কালের ভগ্ন কীতি। আমি কিনে দেবতার নামে সংস্কার করাচ্ছি মাত্র।

—তব্ও বিবেচনা করবেন। যে কোনদিন কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার দশা অথবা ব্রজের গোবিন্দ-মন্দিরের দশা হতে পারে আপনার মন্দিরের। বিশেষ করে হিন্দু যদি হিন্দুর বিপক্ষে গোপন সংবাদ দেয়, তা হলে তার গুরুত্ব কত প্রচণ্ড হবে ভেবে দেখবেন।

আনন্দর্চাদ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কেশবানন্দের দিকে।

কেশবানন্দ বললেন, স্কলাখা মৃত্যুর পূর্বে বীরভূমের বাকী রাজন্মের জন্ম বীরভূম-অভিযানের সংকল্প করেছিলেন। বর্ধ মানের মহারাজা জামিন হয়ে লক্ষ টাকা পেলাস দিয়ে মিটমাট করে দিয়েছেন। বীরভূমের নবাবের এখন অর্থাভাব। এদিকে স্কলাখা গত হয়েছে, সরফরাজ খাঁ নবাব হবেন। এখন নজরানা ভেট পাঠাতেই হবে। এ সময়ে ফৌজদার নবাব, শিকার খুঁজছে, অজুহাত খুঁজছে। এর পর বিবেচনা করে দেখবেন সাবধানতার প্রয়োজন আছে কি না!

আনন্দটাদ ডাকিনী-বিদ্যা প্রভাবে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন, মান্ন্ত্বের ভবিশ্রুৎও দেখতে পান; কিন্তু এই ভাবে গোটা দেশের ভবিশ্রুৎ কথনও দেখতে পান নি, অবশ্র দেখতেও চেষ্টা করেন নি।

কেশবানন্দ আবার বললেন, তা ছাড়া, মহাযজ্ঞে বছ বলি বছ আছতির প্রয়োজন গোস্থামীপাদ। শুধু দেবতাই বলি আছতি পান না, ভূত প্রেত পিশাচ রক্ষ এদেরও দিতে হয়। সাধনজ্ঞা একটা স্বৈরিণীর কন্সা, তাও তো সে বিক্রীতা।

আনন্দটাদ ন্তক হয়ে বসে রইলেন। কঠিন সমস্থা তাঁর সন্মুখে। ঠিক এই সময়েই বাইরে থেকে দীনদাস বললে, প্রভূ!

উত্তর দিতে পারলেন না আনন্দটাদ। বোধ করি শুনতেই পেলেন না। দীনদাস আবার বললে, ম্রশিদাবাদের মোক্তারের কাছ থেকে লোক এসেছে, চিঠি এনেছে। জরুরী চিঠি। আর বলছে, দিল্লীতে নাকি বড় গোলমাল!

কেশবানন্দের কপালে ভ্রতে প্রশ্নের কুঞ্চনরেখা জেগে উঠল: কী হয়েছে? বাদশা মহম্মদ শা—

—না মহারাজ, বলছে ইরানের বাদশা নাদির শা আটক পার হয়ে পাঞ্জাবে ঢুকেছিল। পাঞ্জাব লুঠ করেই সে ফিরে যাবে ভেবেছিল লোকে। কিছু সে ফিরে যায় নি। সে দিল্লীর দিকে আসছে। যে দিক দিয়ে আসছে সব শাশান করে দিয়ে আসছে। এতদিনে সে দিল্লী ঢুকেছে। দখল করে বসেছে। যে খবর নিয়ে এসেছে যে আসবার সময় পথে খবর পেয়েছে নাদির শা দিল্লী দখল করে ছারখার করে দিয়েছে।

চমকে উঠলেন আনন্দটাদ।

কেশবানন্দ মুহুর্তে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোথ হুটি তাঁর বিক্ষারিত, তারা হুটি যেন প্রদীপের মত জলছে, ইরানের বাদশা নাদির শাহ! প্রথম জীবনে ভেড়াওলা নাদির শা, সাক্ষাৎ শয়তান যাকে ভর করে বিশ্ববিজয়ী করে তুলেছে?

তাঁর উত্তেজিত মুখের রেখায় মুহুর্তে মুহুর্তে পরিবর্তন ঘটতে লাগল, প্রাদীপের মত জলস্ত চোখের তারা চ্টিও যেন নিবছে আর জলছে, নিবছে আর জলছে। হঠাৎ তিনি চারিদিক চেয়ে দেখলেন, তারপর ঘরের মেঝেতে ফরাসের চৌকির নীচে রাখা বৃহৎ গুরুভার একখানা পাথর তু হাতে সবলে মাথার উপর পর্যস্ত তুলে সেখানাকে মেঝের উপর আছড়ে ফেলে দিলেন। খোরা-রাধানো মেঝেটা ফেটে চৌচির শুধু হল না, গর্ত হরে গেল। পাথরখানাও ভেঙে গেল তিন টুকরো হয়ে।

কেশবানন্দ গর্তের কাছে এসে বললেন, হিন্দুস্থানের বাদশাহী—
পাথরখানার কাছে এসে বললেন, ইয়ে হার নাদিরশাহী—
তারপর বললেন, ছনো যায়েগা। নাদিরশাহীও থাকবে না। লয়

এসেছে। এখন থুব হুঁ নিয়ার গোস্বামীপাদ। মহাযত্তে আগুন জলেছে।

। चाम्न श्रीतरम्ब ॥

"অশেষ করুণা এবং মহিমার আধার, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, নিয়ম ও স্থারের বিধানকর্তা, সৃষ্টি এবং ধ্বংস-শক্তির উৎস, মহামহিমামর ঈশ্বর, থাঁহার বদাগুতা ও অন্তর্গ্রহের মূল হইতে আলোকদাতা স্থের প্রকাশ, তাঁহার যিনি ছায়া, সেই সমাট সৌভাগ্যবান অভিজাতদিগের মধ্য হইতে বিশেষ সম্মানিত, জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন, গ্রারনীতি ও মহত্ত্বের আদর্শে একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের, প্রদেশের স্থাদার সেনানাম্বক নবাব ফৌজদার বহাল করেন এই হেতু যে, ঈশবের অভিপ্রেত স্থায়নীতি নিয়ম শৃঙ্খলা, দেশে সমাজে যেন স্থিকিরণ, বায়ু ও বর্ষণের মতই পক্ষপাতশূর এবং স্ক্র হয়। কিরণ উত্তাপ বর্ষণের ভার যেমন তিনি স্থের উপর অর্পণ করিয়াছেন, মাম্বরের সমাজে ক্যায়বিচারের ভার তেমনি তিনিই অর্পণ করিয়াছেন সম্রাটের উপর। সেই অমোঘ নিয়মে যে বৃক্ষ সদস্তে মন্তকোত্তলন করিয়া বছ বুক্ষের উপর অত্যাচার করে, তাহার মন্তকে বজ্র-নিক্ষেপে তাহা নাশ করিয়া তিনি বছ অসহায় বৃক্ষকে রক্ষা করেন, আলোক ও জল ঘারা তাহাদের পালন করেন। সম্রাটের নির্দেশে শাসনে নিয়মে, সামাজ্যের অন্তম্বরূপ শাসকগণ দেশের সেই নিয়মেই নি:শঙ্কতা ও স্থথের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ঈশবের রাজ্যে, একজন রাজা ও একজন সামান্ত ভিক্ষুকের ভাগ্যফল, যাহা পূর্বজন্মের কর্ম দারা নির্দিষ্ট, অমুসারে ভোগস্থথের তারতম্য দত্ত্বেও তাহাদের প্রাণের মূল্য এক। সেই নিয়মেই সম্রাটের বিচারা-লম্বে একদা এক বিধবার পুত্রকে দৈবক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরের আমাতে বধ করার জন্ম সায়পরায়ণ কাজী সাহেব স্বরং সমাট নাসিফ্ছিনের বিচার করিরাছিলেন এবং সম্রাট অবনত মন্তকে সে বিচার শিরোধার্ষ করিয়াছিলেন। ইসলামের

মহামান্ত প্রগম্ব সামান্ততম মাহ্যকেও সকলের সঙ্গে সমান মধাদা দিয়া গিয়াছেন। অশেষ করুণার আধার ঈশ্বর, অন্তার অভ্যাচারে অভ্যাচারিত সামান্ত প্রাণীর ত্ংথে দীর্ঘনিশাস ফেলিয়া থাকেন। সামান্ততম ব্যক্তি অন্তায়ভাবে পীড়িত হইলে, ভাহা জ্ঞাত হইবামাত্র ঈশবের ছারাশ্বরূপ সমাটের ক্ষ হইতেও তেমনি দীর্ঘনিশাস পড়ে। স্মাটের বাজ্যে শাসকর্ম্দ সেই সব গুণের শ্রিক, ভাঁহারাও বিচলিত হন।

"মহামান্ত ফৌজদার অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহম্মদ হাফেজ থা জনাব আলি বাহাত্ত্ব—আপনি অভিজাত, আপনি ধার্মিক, আপনি নিভীক, আপনি দর্মার্দ্রহাদয় অথচ ন্তায়পরায়ণ। আপনার শাসনাধীনে প্রজাবর্গ ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান-নিবিশেষে স্থথেই কালাতিপাত করিতেছে। তবুও মুব্তিকার গহরের দিবসকালেও অন্ধকারের মত সেই অন্ধকারগহরবাসী হিংসক অজগরের মত লুকায়িতভাবে অন্তারকারী অত্যাচারী যে রহিয়াছে ইহা সত্যা, এবং সে সত্য স্ক্রান্দৃষ্টিসম্পন্ন মহামান্ত ফৌজদার সাহেবও অস্বীকার করিবেন না। বহু ক্ষেত্রে ইমারতের মধ্যেও এমন অজগর বাস করে। আপনার এলাকাধীনে গঞ্চ ইলামবাজারে এমনি এক অন্ধগরচরিত্রের ব্যক্তি অর্থসম্পদের ইমারতের গহরের আত্মগোপন করিয়া বিষনিশ্বাসে বায়ু বিয়াক্ত করিতেছে; বহু অসহায় জীবকে কবলগত করিয়া নাশ করিতেছে, গ্রাস করিতেছে। আমি ইলামবাজারের ধনী ব্যবসায়ী রাধারমণ দে-সরকার এবং তাহার পুত্র অক্রুর দে-সরকারের কথা বলিতেছি।"

মাধবানন্দ হাতেমপুরের ফৌজদার হাফেজ থাঁয়ের উদ্দেশে পত্র রচনা করছিলেন। ধুলাকাদা মেথে করো সামনে একটা গাছতলার শুরে কাঁদছিল। করো স্থপুরে গোসাঁই ঠাকুরের ওথান থেকে হতাশ হরে কাঁদতে কাঁদতে এখানে এসেছে।—নবীন গোসাঁই, তুমি বাঁচাও। তোমার জ্বস্তেই গোসাঁই, তোমার জ্বস্তেই এ সর্বনাশ, তুমি বাঁচাও।

প্রথম সে মাধবানন্দের কাছে আসে নি, আসতে ভরসাও হয় নি, মনও চায় নি। সে তো রথবাত্রার দিন এসে গোসাঁই রের কাছে ক্ষদাসীর ভূপশার কথা জ্বোড়হাত করে নিবেদন করে বলেছিল, সিদ্ধপুরুষ, দয়া কর। কিছু দয়া হয় নি। গোসাঁই দেখিয়ে দিয়েছিল হাতেমপুরের ফৌজদারের

দরবার। ফৌজদার লোক ভাল, তার বেগম আরও লোক ভাল; কিছ্ব রাজা নাদশা ফৌজদারের মন গরিবের ছুংথে কাঁদতে চাইলেও কাঁদবার তাদের অবকাশ কোথার? ভগবান যে ভগবান, তারই সমর হর না। শুধু সময়? এর বিচাব করাণ তো সোজা নর। ভাবতে গেলে কয়োর চোপের সামনে বিশ্বরন্ধাণ্ড হিজিবিজি হয়ে যায়। কয়ো এই গড়জপলের দিকে তাকায় আর ভাবে, বনে বাঘ আছে, হরিণ আছে। বাঘ বলে— ভগবান থেতে দাও, হরিণ দাও মেরে খাই। হে ভগবান, হে ভগবান! হরিণ বলে—ভগবান, বাঘের হাত থেকে বাঁচাও, কচি ঘাস দাও; ভগবান, হে ভগবান!

ভগবান কী করে ? ওদিকে তথন দ্রৌপদীকে হয়তো চুলে ধরে তৃঃশাসন রাজ্যভার এনে তার কাপড় ধরে টানছে। দ্রৌপদী ডাকছে—গোবিন্দ, রক্ষা কর। ঠাকুর তখন বাঘ-হরিণের কথা কানে তোলেন, না দ্রৌপদীকে কাপড় জোগান? কিংবা কুফক্ষেত্রে রথের ঘোড়া চালান? তা ছাড়া 'অক্কুজর' যদি ফৌজদারকে বলে—জনাব, আমি বড়লোকের ছেলে, আমার অনেক টাকা, তোমাকে দফার দফার খেলাত দি, পেশকস্ দি; আমার দরবারও তো তোমাকে শুনতে হবে। আমার যদি লোকলম্বর না থাকে তো আমি কিসের বড়লোক ? আমার বড় বাড়ি ঘোড়া পালকী না থাকলে বেমন চলে না, তেমনি মোহিনীর মতন হ-চারটে সেবাদাসী না থাকলে চলবে ক্যানে ? বাদশার ঘরে দশ হাজার বিশ হাজার বাঁদী, লবাবের ঘরে হাজার হু হাজার, ফৌজদার কাজী জমিদার এদের ঘরে গণ্ডার গণ্ডায় ; কুলীন বামুনদের শ-দরুনে পরিবার ; অক্কুরুরের দোষই বা তা **इटन** कोषाय ? अहे का मिन मिन को मीन की श्री इस তাকে খাইরে হুটো মিষ্টি কথা বলছিল, বলতে বলতে কী খবর এলো কোথা থেকে, বাস, ফৌজদার হস্তদন্ত হয়ে চলে গেল; হয়ে গেল থতম। কোণার মোহিনী, কে মোহিনী, কেই বা করো—কে তার থোঁজ রাখে, ধবর রাথে।

তাই সে মাধবানন্দ বা ফৌজদার এদের কাছে না গিয়ে, উপায়াস্তরহীন হয়ে শেষ ছুটে গিয়েছিল আনন্দটাদ ঠাকুরের কাছে। কিন্তু দেখানেও ঠাকুর যথন দর্জা বন্ধ করে ঘরে চুকে আর দরজাই খুললেন না, তথন হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ইলামবাজারে ফিরেই আসছিল। হঠাৎ পথে ক্য়ো ওপারের বনের দিকে তাকিয়ে রাগে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল: ওই নবীন গোঁসাই-ওই নবীন গোঁসাই সব সর্বনাশের মূল। ওরই অভি-गारि या-की भागन रहा (गन। या-की-कृष्णनामी देवस्वी यथन दक्य-বিক্তাস করে, কপালে তিলক নাকে রসকলি কেটে, পান-দোক্তায় ঠোঁট রাঙা করে পথ দিয়ে চলে যেত তথন পথের লোক দাঁড়িয়ে দেখত তার রূপ। সে যথন কথা বলত, তথন লোকে অবাক হয়ে শুনত, ভাবত, কথা তো স্বাই বলে কিন্তু এমন কথা এ মেয়ে কেমন করে বলে—এ কথা, কোন কথা, যার ধার ক্ষুরের মত, যার ছটা বেলোয়ারি চুড়ির ঝিকিমিকির মত, কণ্ঠস্বরে বাঁশির হুর, কথার দক্ষে হাসিতে মধুর আমেজ। কয়ো মা-জীকে ভয় করত, তার আচার-আচরণ ভাল লাগত না তার, তবু ভাল-বাসত; মন্দ কথা মন্দ মানে করতে ভাল লাগে নি, ভরসা হয় নি। একদিন সে বড়ো বাউলদের হ-চারজনের কথা শুনেছিল—তারা বলাবলি করছিল, "মা-জী সাক্ষাৎ রাধা-রসের দৃতী গো। ওই রসে ডগমগ। চলনে शिम, रन्ता शिम, त्राक् शिम, राष्ट्र शिम। त्रामत शिर्ट, त्राम त्राम এলিয়ে আছে, তুলে ধরতে গলে পড়ে। সাক্ষাৎ বসময়ের কুপা না হলে কি জীবনে এত রস ঢোকে? জয় রাধে—জয় রাধে! রসেই আশ, রসেই বাদ, রদেই ভোজন, রদেই শরন, রদেই স্থপন, রদেই জাগরণ। চামড়ার চোখে চেয়ে দেখে মা-জীকে বিচার কর না, ঠকবে।" বুড়ো বাউল বলাই-দাস গান গেরে উঠেছিল—সেই গান, যা তাদের একান্ত অক্তরক ছাড়া কারুর কাছে গাইতে নাই, গাইতে মানা—সেই গান একে অপরের কানের কাছে মুখ এনে রসের ঘোরে মুচকি মুচকি হেসে গুন গুন করে গেয়েছিল---

> "রসের ভন্তন রসের পৃক্ষন রসের ভোজন কর। রসেতে মজিবি রসিকে পৃজিবি রসেতে বাঁধিবি ঘর॥ রসেতে শরন রসেতে স্থপন রসে হাসি রসে কাঁদা। রসের সাগরে ডুব দিলে পরে রসময় পড়ে বাঁধা॥"

অন্ধকারে গাছতলায় শুরে ছিল কয়ো। তার ধাঁধা জটিল হরে উঠছিল; ক্লফদাসী আরও রহস্তমরী হরে উঠছিল তার কাছে।

সেই মা-জী উন্মাদ পাগল হয়ে গেল ওই নবীন গোঁসাইয়ের রোষে, ভার শাপে।

— দায়ী তুমি। দার তোমার। দার তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোঁসাই, দায়ী তুমি।

রাগে ক্ষোভে ক্ষ্যাপার মত এই চিৎকার করতে করতে সে ইলামবাজারের রাস্তা থেকে সরে সরে কথন যে অজয়ের কূলে এসে হাজির হয়েছিল, কথন যে নদী পার হয়ে এপারে এসে বনের মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রমের ফটকে এসে উঠেছিল, সে সম্পর্কে কোন সচেতনতাবোধও তার ছিল না। প্রচণ্ড কোধে ক্রুদ্ধ কয়ো আশ্রমের হয়ারে চিৎকার করছিল—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি।

মাধবানন্দ অশ্রীষ্ট পদক্ষেপে মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে ফিরছিলেন।
কেশবানন্দ তাঁকে বন্দী করে চলে গেছেন; শ্রামানন্দ এবং আরও কয়েকজ্বন তরুণ সন্ন্যাসী নতদৃষ্টিতে বা উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টিব সঙ্গে
দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্কোচ বা লজ্জা এড়িয়ে তাঁর উপর বোধ করি প্রহরা দিয়েই
বসে ছিল। মাধবানন্দ তাদের সঙ্গে একবারমাত্র কথা বলেছিলেন—একটি
প্রশ্ন করেছিলেন, কেশবানন্দের উপলব্ধিকেই কি তোমরা সত্য বলে মনে
কর ? আমি ল্রাস্ট বলে তোমাদের বিশ্বাস ?

উত্তর তারা দিতে পারে নি। নীরবে যে যে-ভাবে বসে ছিল সেই ভাবেই বসে থেকেছিল।

মাধবানন্দ আর প্রশ্ন করেন নি। তাদের মৌনতার মধ্যেই তাদের উত্তর তিনি পেরেছিলেন। দোষ দেন নি। এরা নিতান্ত তরুণ। প্রত্যেকেই তাঁর থেকেও বয়সে নবীন। এবং এদের ত্-তিনজনকে বাদ দিয়ে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন আঘাতে আহত হয়ে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। কারও ঘর ভেঙেছে সমাজের আঘাতে, কারও ঘর ভেঙেছে রাজা বা নবাব জার্মীরদার কি ফৌজদারের আঘাতে, কারও সংসার ছারধার হয়েছে রাজার রাজায় সংঘর্ষের মধ্যে, কারও ঘর লুটে জালিরে দিয়ে গেছে ডাকাত,

লুটেরার দল। বর এরা ত্যাগের প্রেরণার ছাড়ে নি, ঘর হারিয়ে গেছে বলে উপায়াস্তরহীন হয়ে সন্ন্যাসী। প্রতিষ্ঠা হারিয়ে গৈরিক নিয়ে ভিক্ক্কের প্রতিষ্ঠাহীনতার লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করেছে। বুকের মধ্যে এদের ক্ষোভ हि:मा ठाभा चाहि, न्तर नि। मकरनरे पित्ती थरक कामी भर्यस चकरलाइ অধিবাসী। কয়েকজন সমৃদ্ধ সম্পন্ন ঘরের ছেলে, ঘর ভেঙেছে কোন লড়াইমে বা স্থবাদার-জমিদারের অত্যাচারে। পথে দাঁড়িরে আত্মরক্ষার জন্ম ভিক্ষুকের চীরবস্ত্র গায়ে না জড়িয়ে গেরুয়া কাপড় গায়ে দিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নেওয়ার লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি খুঁজেছে। বাকী কয়েক-জন নিতাস্তই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—ঘর-পালানো ছেলে সব; কারও মধ্যে একটা হা-ঘরে প্রকৃতি আছে, কেউ ঘরে তুষ্কৃতি করে কেউ বাইরে তুষ্কৃতি করে ঘর ছেড়েছিল। সকল লজ্জা সকল অপরাধ থেকেই আত্মরক্ষার পক্ষে এ দেশে গেরুয়া আবরণের মত আর-কিছু নাই। এদেরও বুকে আগুন রয়েছে, ওই এক আগুন। সেই আগুনের উত্তাপে ওদের বুক শুকিয়ে তৃঞ্চার্ড, কিন্তু সে তৃঞ্চা অমৃতের নয়—সে তৃঞ্চা মদিরার। শক্তির মদিরা। ঠিক এই সময়টিতেই কয়োর চিংকার এসে তার কানে ঢুকল।—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোঁসাই,

এতক্ষণে মাধবানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ওই চিৎকার, তাঁর চিস্তা এবং পদচারণার গতিতে একটি ছেদ টেনে দিল চকিতে।

माग्री जूमि।

করোর কণ্ঠস্বর চিনতে দেবি হল না তার। কয়োকে মনে হতেই, করোর
সক্ষে সংশ্লিষ্ট ক্লফলাসীকে মনে পড়ে গেল। গতকাল রাত্রির ছবি মনের মধ্যে
ভেসে উঠল। উ:, হতভাগিনীর কর্মফলের সে কী নিদারুল পরিণাম! সে কী
মর্মযাতনা তার! সে কি তা হলে আরও কোন নিষ্ঠ্রতর পরিণামে— ?
শিউরে উঠলেন মাধ্যানন্দ। নইলে নির্বোধ জড়বৃদ্ধি কয়ো এমন কাতর
আবেগে তাঁকে দায়ী করে চিংকার করে কেন ? কয়োর ধারণার কথা তো
জানেন। সে নিজের মুখে বলে গেছে—নবীন গোঁসাই, তৃমি সিদ্ধসূক্ষ,
তোমার রোধে পড়েই ক্লফদাসীর এই অবস্থা। প্রশ্ন করেছিল, হতভাগী
বিষ্টুমীর কি অপরাধ্টা খ্ব বেশী হয়ে গিয়েছিল গোঁসাই ?

মাধবানন্দ শ্রামানন্দের দিকে মুখ ফেরালেন, ভাকলেন, শ্রামানন্দ!
মাধবানন্দের এ কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। এ কণ্ঠস্বরে আদেশের হুর এবং
নেতৃত্বের গান্তীর্বের গুরুত্ব অলক্ষ্রনীয়। কেশবানন্দ হয়তো একে লক্ষ্যন
করতে পারে, কিন্তু শ্রামানন্দ পারে না।

শ্রামানন্দ চকিত হয়ে সামনের গাছটির উপর ইচ্ছাক্বত প্রসারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে চাইলে; কিন্তু মাধবানন্দ বললেন, শোন। ওই বৈরাগী ভিক্কটিকে ডাক। নিয়ে এস এখানে। যাও।

শ্রামানন্দ অবনত মন্তকে বেরিয়ে গেল, কয়োকে ডাকবার জন্ম ইতন্তত করতেও সাহস করলে না।

কয়োর কাছে সকল কথা শুনে মাধবানন্দ কিছুক্ষণ শুদ্ধ হরে বসে রইলেন। কৃষ্ণদাসী গতরাত্তির অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে। উন্মাদিনী মরেছে। অন্ধয়ের জলম্রোত এখন অগভীর, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দহ আছে। দহে কুমীর আছে।

কৃষ্ণদাসীর মর্মযাতনার অবসান যদি এ ভাবেও হয়ে থাকে তবে সে
নিকৃতি পেয়েছে। এক মূহুর্ত পরে অকস্মাৎ শিউরে উঠলেন তিনি। কৃষ্ণদাসীর নিষ্ঠরতম পরিণতির জন্ম নয়, মূহুর্তে তাঁর চিস্তা কৃষ্ণদাসীর দিক থেকে চলে গেছে গোটা সমাজের বিকৃত অবস্থার দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে তিনি যেন দেখলেন, গোটা সমাজটাই আজ কৃষ্ণদাসীর মত প্রেমসাধনা থেকে ভাই হয়ে ব্যাভিচারময়তার নেশায় বিকৃত মায়্রের মত বিহ্বলচিত্ত হয়ে উঠেছে। তিনি শিউরে উঠলেন। তারাও কি ঠিক ওই ভাবে জীবননদীর দহে পড়ে অপঘাতে শেষ হয়ে যাবে?

তাঁকে স্তব্ধ দেখে করে। আবার চিৎকার করে উঠল, তোমাকেও সে শাপাস্ত করে গিয়েছে। ডাকিনীসিদ্ধ মা-জীর শাপ তোমাকেও লাগবে।

ভামানন্দ তাকে ধমক দিরে উঠল, এ-ই! কাকে কী বলছিল রে বৈরেগী ?

—ঠিক বলছি। আরও বলছি, মোহিনীর এ দশা হল কোন্ অপরাধে—

বল, বল তুমি গোসাঁই? তাকে তুমি একদিন নাগা গোসাঁইদের হাত থেকে বাঁচিরেছিলে, তোমাকে সে দাক্ষাৎ ঠাকুরের মত ভক্তি করে। তার এই দশা আবার তুমি করলে! বল, কেনে করলে, কোন্ পাপ তার? তার উদ্ধার যদি না হয় তবে তার দায় তোমার, সেই দায়ে তোমাকে আমি শাপাস্ত করব।

এবার মাধবানন্দের মোহিনীকে মনে পড়ল। সরলা কিশোরী মেয়েটি
বড় অসহায় বড় ভীক্ষ, মারের মুখের ছাপ মেয়েটির মুখে পড়ে নি। এ মেরে
যেন ওই জাতের নয়। অক্রকে মনে পড়ল। কুংসিত বীভংসদর্শন
বর্বরটার আহত অবস্থাতেও সেই থু-থু করে থুংকার নিক্ষেপের ছবি ভেসে
উঠল চোঝের উপর; সেই কুংসিত অল্পীল গালিগালাজ মনে পড়ে গেল।
অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন মাধবানন্দ। কয়েক মুহুর্ত চিস্তা করে একটা দীর্ঘনিশাস ফেলে বললেন, বোস তুই।

- —की कत्रव वरम ? की इरव ?
- —বোদ, উপায় আমি করছি। তুই কিছু খা। খ্রামানন্দ, ওকে কিছু বেতে দাও।
 - —আগে বল কী উপায় করবে ?
- —ফৌজদারকে আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, সেই পত্র নিয়ে তুই যা। ফৌজদার অবশ্যই বিধান করবে।
 - —ছाই कत्रत्व। कत्रत्व ना, कत्रत्व ना।
 - --করবে। আমি বলছি।
 - —তুমি বলছ ?
 - -- हैं।, ज्यामि वनहि।
- —তার চেরে গোসাঁই, তুমি তাকে শাপ দাও, তার পক্ষাঘাত হোক, দে বোবা হোক, মোহিনী তার চোথের ছামনে কালীর মত ভয়ত্বরী হয়ে উঠুক।
- চিংকার করিস নে কয়ে। তোকে থেতে বলছি, তুই খা। আমি
 পত্র লিখে দি, তুই ফৌজদারের কাছে নিয়ে যা। যদি ফৌজদার প্রতিবিধান
 না করে, আমি বিধান করব। যা তুই শ্রামানন্দের সঙ্গে।

তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কাগন্ধ এবং দোয়াত কলম নিয়ে বসলেন। ফৌন্দাের হফেন্সর্থাকে পত্র লিখবেন।

মনের উদ্ভাপ এবং আবেগের বশে পত্র রচনা করলেন। দীর্ঘ পত্র। ঈশবের অভিপ্রেত স্থায়ের ভিত্তির উপর রাজধর্মকে স্থাপিত করে সেই স্থায়-বিচারের দাবি জানিয়ে অক্রের শান্তি ও মোহিনীকে উদ্ধার করবার প্রার্থনা জানালেন। পরিশেষে লিখলেন—"ঈশ্বরের ক্রায় ও করুণার উপর একটি পিপীলিকার যে অধিকার আছে আপনার দরবারে – বাদশাহের রাজ্যে এই হতভাগিনী অসহায়া বালিকারও অবশ্রুই ততটুকু অধিকার আছে। একটি পিপীলিকাকে অকারণে বধ করিলে মামুষকেও সর্বশক্তি-মানের দরবারে শান্তি পাইতে হয়। শুধু তাই নয়, এই সংসারে ওই পিশীলিকাবধের পাপ জমা হইয়া বিশ্বসংসারের পাপের ভার বৃদ্ধি করে। এবং একদা পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্তবন্ধপ মহামারী, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, ছুর্ভিক্ষের প্রাহুর্ভাব হয়। মাসুষের রাজ্যে এমনই ভাবে পাপ জমা হইলে আমাদের শাস্ত্রে বলে—ভগবান আবিভূতি হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া তাহার অবসান ঘটাইরা থাকেন। জনাব আলি, একটি সামাল অসহায়া বৈষ্ণবক্তার দীর্ঘনিশাসও উপেক্ষার নয়। নিরপরাধের দীর্ঘনিশাস অগ্নির তুলা; এক কণা অগ্নি সমন্ত্রিশেষে ধুমান্তিত বহিংপুঞ্জে যুক্ত হইয়া দীপ্যমান করিয়া সর্বনাশা বহিদাহের সৃষ্টি করিতে পারে। সে সময় না হইলেও, সে সময়কে এক মুহূর্ত সন্ধিকট করিয়া তোলে। স্থতরাং ইহার প্রতিবিধানে উপেকা করিলে রাজ্যের অকল্যাণ ঘটিবে। অতএব আপনি ইহার প্রতিকার করুন।"

পত্র শেষ করে মাধবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কয়োর হাতে দিয়ে বললেন, ফৌজদারের হাতে দিবি। ঠিক সেই মূহুর্তে বিত্যাতালোকে সমস্ত বনভূমি চকিতে দীপ্ত হয়ে উঠল, পর-মূহুর্তেই বজ্রগর্জনে থর থর করে কেঁপে উঠল সব। দিগস্ত থেকে দিগস্ত পর্যন্ত আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে; উতলা বাতাস উঠেছে; অনেক দ্রে বোধ করি বনভূমিয় অপর প্রান্ত থেকে একটা অবিশ্রান্ত ঝর ঝর শন্ধ উঠছে; শন্ধটা য়েন চলমান—দ্র থেকে নিকটে আসছে এগিয়ে। একটানা ঝর-ঝর-ঝর-ঝর-ঝর শন্ধ। বর্ষণ নেমেছে,

এগিরে আসছে নৈশ্বতি কোণ থেকে। আরও কিসের শব্দ। ক্যাও—ক্যাও—

মাধবানন্দ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বর্ণার মেঘমেত্র আকাশের কী একটা বিষণ্ণ মারা আছে! সেই মারা মনকে বিষণ্ণ করে তোলে, উলাস করে দেয়। তেমনি বিষণ্ণ উলাসীনতার মধ্যেই মাধ্বানন্দের এই মূহুর্তে অকস্মাৎ মনে হল, হতভাগিনী মোহিনীর ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি আকাশে বাতাসে ফুটে উঠেছে। নিজের করুণার কাছে তাঁর নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। বিচিত্র ভাবে নিজের অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছায় রুফ্গলাসীর শোচনীর পরিণতি, তার সঙ্গে মোহিনীর এই ত্র্দশার সকল কারণের মূলের সঙ্গে তিনি যেন জড়িরে গেছেন।

ঝরঝর শব্দে বর্ষণ নেমে এসেছিল কখন।

চিস্তামগ্র মাধবানন্দের থেয়াল ছিল না। ধারাবর্ধণের মধ্যে সব নৃপ্ত হয়ে গেছে। বন ঢেকে গেছে, আকাশ ঢেকেছে, অজয়ের তটভূমি, অজয়, অজয়ের পরপার—সব ঢেকে গেছে। তাঁর চিস্তা ভাবনার দিক্দিগস্ত সব যেন এমনি একটা কিছুর মধ্যে হারিয়ে গেছে, ঢেকে গেছে। তিনি ভাবছিলেন, যদি ফৌজদার কোন প্রতিবিধান না করে? তারপর? কী করবেন তিনি? অসহায় কোটা কোটা জীব এই স্প্তের ভাল-মন্দের ঘন্দের মধ্যে বলি হছে; ভাল মরছে, মন্দ মরছে, তারই মধ্যে স্প্তি চলেছে আপন পথে। মহাকুরুকেতের শেষ আজও হয় নি, কতকালে হবে কে জানে! সেই যজ্ঞে নিজেকে বলি দিয়েছে রুফ্লাসী। তিনি মন্ত্র পড়েছেন। আবার মোহিনীও বলি হবে? তিনি পুরোহিতের মত মন্ত্র পড়েছ চলবেন? কয়ে। বলে গেছে, ঝুলন-পূর্ণিমার দিন মোহিনী বলি হবে। রুমণ দে-সরকার অফ্রান করে ব্যাভিচারী পুত্রের হাতে মোহিনীকে তুলে দেবে। বলির পশুর মতই মোহিনীর সকল আর্ডনাদ ব্যর্থ হবে। পরশু পূর্ণিমা—একদিন পর।

—গুরু মহারাজ।

মাধবানন্দ মৃথ তুলে তাকালেন। কেশবানন্দ ঘরে প্রবেশ করেছেন।

মাধবানন্দ উত্তর দিলেন না। শুধু তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন। কেশবানন্দের সর্বাঙ্গ সিজ্ঞ; মাথার চুল থেকে জল ঝরছে। চোথ ছটি রাঙা, বোধ হয় ভেজার জন্মই এমন রাঙা হয়েছে।

—ফৌজদার যদি আপনার পত্র উপেক্ষা করেন ? চমকে উঠলেন মাধবানন।

—ক্ষোর হাতে আপনি যে পত্ত দিয়েছেন, সে পত্ত আমি পডেছি। পত্র আপনারই উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু জয়দেবের মহান্ত মহারাজ বললেন-গদাজী যথন অলকাপুরী থেকে মর্ত্যধামে নেমেছিলেন তথন শিব তাঁকে মাথা পেতে ধরেছিলেন: সে মাহাত্ম্য সাক্ষাৎ শিবরুদ্রের যেমন তেমনি অলকাবাহিনী গলারও বটে। মাটির এই পাপপুণাময় ধরতিতে গলা অবতরণ করার পর তাঁর জলে মাটি মিশেছে। শিবের জটা থেয়ে জল তাঁর যত বাডে. ধরতির মাটি তাতে তত বেশী মেশে। তাই বক্সার কালে গঙ্গার মধ্যে যত জল, তত মাটি। তথন তাই তার প্রবাহে স্প্রের চেয়ে ধ্বংসের শক্তি বেশী। তাই গলার বান ডাকলে তথন এক কেন, শত শিবলিক সাজিয়ে বাঁধ দিলেও বানের গতি রোধ হয় না: বানে যা ভাঙবার তা ভাঙে। তোমার গুরুকে वनत्व-क्रेश्वत्तत्र निश्चम रूर्य मात्न, ठक्क मात्न, वांजाम मात्न, वर्षा मात्न; কিন্তু মাছবের মধ্যে তার দশা হয়—কাচম্বচ্ছ অলকানন্দার অমৃতবারির ধরতির বুকে বহতা গলার ঘোলা জলের মত। রাজবিধান গলার ঘোলা জল, আর রাজা হল ওই পথলের শিবলিক। স্থবাদার ফৌজদার কাজী এ তে। মুড়ি ভাই। গায়ে একটা সাদা দাগের বেড় থাকে সেটা দাগই ভাই, উপবীত নর। গলাজনের মহিমা গেয়েছে তোমার গুরু, এক স্থাড়ির কাছে! হা রে গদাজল, যার আধা হল মাটি আর কাদা।

— তুমি বলছ, ফৌজদার হাফেজথা আমার পত্র অন্নধাবন করবে না ? পরক্ষণেই বললেন, তুমি কি কেন্দুলীর মহাস্তের কাছে গিয়েছিলে ? তুমি তো স্থানে গোস্বামীপাদের কাছে গিয়েছিলে !

—সেথান থেকে আমি মহাস্ত মহারাজের কাছেও গিরেছিলাম। স্থপুরে সংবাদ পেলাম আগুন জলেছে। দিল্লীতে নাদির শাহ এসে চেপে বসেছে। এ ধরর ত্মাসের পুরনো। এতদিনে কী হয়েছে কেউজানে না। কিছ দিল্লীর বাদশাহী তক্ত যে পাথরের উপর বসানো, সে পাথরথানায় বাদশা-জাদারা হাতুড়ি মেরে মেরে ফাটিরেছিল, নাদির শাহের ইরানী হাতুড়ির ঘারে সেটা ভেঙেছে। আর তো বসে থাকবার সমর নেই। তাই মহাস্ত মহারাজের কাছে না গিয়ে পারি নি। এ থবর হাতেমপুরেও এসেছে গুরু মহারাজ। এখন আপনার পত্র পড়ে অম্থাবন করবার মত তার সমর নাই বলেই আমার ধারণা।

মাধবানন্দ হাত তুলে উপরের দিক নির্দেশ করে বলতে গেলেন—ফৌজদার না শুনলে তাঁর হাত। আমি কী করব কেশবানন্দ? কিন্তু বলতে গিরেও পারলেন না বলতে। চুপ করে আকাশের দিকে নর, মাটির দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি কি করোকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ফৌজদার প্রতিকার না করলে—। কথাটা শেষ করলেন না তিনি, অসমাপ্তির মধ্যে ইন্ধিতে প্রশ্নটিকে সামনে ধরে দিলেন।

মাধবাননা মুখ তুললেন। বললেন, ধর্মসাধনার পথে আত্মরকার জন্ত অন্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম। তুমি তাকে এই কালের স্থযোগে বিধর্মীশাসন উচ্ছেদের কাজে প্রয়োগ করতে চাও। বিধর্মীর উচ্ছেদের সঙ্গে অধর্মের উচ্ছেদ করবে কেশবাননা ? বল তা হলে—

মাধবানন আসন ছেড়ে উঠলেন। কংসারি-বিগ্রহের বেদীর এক পাশে থাকত একথানি তরবারি, অপর পাশে একথানি ঢাল। তরবারিথানি হাতে তুলে নিয়ে মাধবানন বললেন, তা হলে আমি তোমাদের সকলের ইচ্ছা এবং চেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিচ্ছি। বল।

কেশবানন্দ নতজাত্ব হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে মাথার ঠেকিয়ে বললেন, জয় কংসারি! আপনি নিশ্চিম্ভ থাকুন, ঝুলন-পূণিমার পূর্বেই অসহায়া মেরেটিকে আমরা উদ্ধার করব।

॥ खरशांमन পরিচেছদ ॥

को कतरवन माधवानन ?

বাকী সারাটা দিন এবং রাত্রি ও পরের দিন তিনি ওই চিস্তা করে দেখলেন। কয়ো ফিরে এখনও আসে নি। সংবাদ পেয়েছেন, ফৌজদারের লোক এসেরমণ দে-সরকার এবং তার বর্বর ছেলেটাকে আজ সকালে প্রায় গ্রেকতার করে নিয়ে গেছে।

কেশবানন্দই তাঁকে খবর দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ আশা তিনি প্রকাশ করেন নি। বরং ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেছেন, ফৌজদার অথর্ব অজগরের মত পড়ে ছিল, তার মুখের সামনে সে শিকার পেরেছে। দিল্লীর অবস্থার কথা শুনে অর্থ সংগ্রহের জন্ম সকলেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অর্থ ভিন্ন সামর্থ্য শক্তি সব-কিছুই আকাশকুস্থম। এদিকে সরফরাজ থাঁ মুরশিদাবাদের তক্তে বসেছে, তার নজরানা চাই। রমণ সরকারের অর্থদণ্ড হবে। ফৌজদারের কিছু স্থবিধা হল।

পর-মুহুর্তেই বলেছেন, আপনি চিস্তা করবেন না। আমি সে বৈঞ্চব-ক্স্যাকে নিশ্চয় উদ্ধার করব। আমার উপর ভার দিয়েছেন। আমি নিয়েছি ভার, সে ভার উদ্ধার না করতে পারলে আমার নরক হবে। শুধু চঞ্চল হয়ে আমার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।

—না, করব না। যা হয় তুমি কর। শুধু আমার বাক্য যেন নিফল না হয়। ওই সরলা অসহারা মেয়েটি উদ্ধার হোক। তা হলেই আর অন্থশোচনা থাকবে না। কৃষ্ণদাসীর জন্ম তাঁর অন্থশোচনা নেই। না, নেই। এই পরিণতিই তার অনিবার্য। কৃষ্ণদাসী বাজির অন্ধকারে ফসলকীট শ্রামাপোকার মত জন্মছিল।
তিনি অন্ধকারের মধ্যে স্বর্গোদরের তপস্থায় হোমকুগু জেলে বদে আছেন,
তাতে শ্রামাপোকা-কৃষ্ণদাসী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরল; তিনি কী
করবেন তাতে? তর্পণের সময় 'আব্রন্ধত্ত্ব' পর্যন্ত জ্বগৎকে জ্বলগগুর যথন
তিনি দেবেন, তথন তার মধ্য থেকে একটি জ্বলকণা সে পাবে, দেবেন তাকে।
একটা দীর্যশাস ফেলতে গিয়ে আ্যুসম্বরণ করলেন মাধ্বানন্দ।

এই সরলা অসহায়া মেম্বেটি রক্ষা পেলে তাঁর আর কোনও গানি থাকবে না। মেরেটির কিশোর-চিত্তটি তাঁর সম্মুথে সূর্যের সম্মুথে ফুলের মত মেলে ধরেছিল, তিনিও ঠিক তেমনি ভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন—দেখানে বিমুশ্বতা আছে, ভক্তি আছে, আর কিছু নাই; সে নিপ্পাপ। পাপ দণ্ডিত হয়েছে অমোঘ নিয়মে, কিন্তু তিনি হয়েছেন তার হেতু। দেই কারণেই ওই নিষ্পাপ মেয়েটিকে রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। তাঁর অস্তর বলছে। হার, যদি তাঁর পুণ্যময় ইচ্ছামাত্রেই মেয়েটি রক্ষা পেত! কিন্তু সে পুণ্য এখনও তাঁর সঞ্চিত হয় নি। সকল সময়ে ইচ্ছাশক্তিতেও কান্ত হয় না। ভগবানের অবতাবেরও হয় না। তাঁকেও সেতৃবন্ধন করে সমূল পার হয়ে যুদ্ধ করে রাবণকে ধ্বংস করতে হয়; তাঁকেও কুফক্টেত্রের আয়োজন করে অশ্বরজ্ব ধরতে হয়—তাতেই শেষ নয়, অশ্বরজ্ব ছেড়ে চক্রও ধারণ করতে হয়। হোক, তাই হোক। কুরুক্ষেত্রই হোক। সমগ্র ভারতভূমে দিকে দিকে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন কার্যকারণে গড়ে উঠছে; প্রথরতম গ্রীমে এক দিকে বায়ুন্তর শুষ্ক হয়ে উঠছে, অন্ত দিকে বৃক্ষশাখা শুকিয়ে ভিতরের অগ্নিকে উন্মুথ করে তুলছে; শাখায় শাখায় সংঘর্ষে উন্মুথ অগ্নি জললে সমস্ত অরণ্য জুড়ে আগুন জলবে। এ সমরে শান্তিজল সিঞ্চন, শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের সময় নয়। এখন আছতি-মন্ত্র উচ্চারণের সময়, আছতি দেবার তাই করবেন, তাই-ই দেবেন তিনি। এই মহাকালের মহাযজ্ঞে তিনি প্রথম আহতি দিয়েছেন তাঁর সংসার, জীবন, ইহলোক, তাঁর ধ্যান-ধারণা; দ্বিতীয় আহতি দেবেন জীবনমৃক্তি পরলোক। প্রথম বলি হয়েছে পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবী ক্লফ্দাসী, বিতীয় বলি হোক বর্বর পশুতুল্য ওই ধনী-পুত্রটা। ভগবানের যদি অত্ত অভিপ্রায় হয় তবে ফৌজদার অবশ্রই

অ্রতিবিধান করবে। না করলে কেশবানন্দ বলির ভার নিয়েছেন। কেশবানন্দ নির্ভীক ছেন্তা।

অকশাৎ একসময় মাধবানন্দ অহতেব করলেন যেন দিন শেষ হরে গেছে। ঘরের ভিতরটার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। অন্ধকার কোণে কোণে বিনিপোকাগুলি প্রথরভাবে মুখর হরে ডাকছে। দিন শেষ হয়ে গেল! এত শীঘ্র! পরক্ষণেই হাসলেন। কাল যেমন নিজের গতিতে চলে, মাস্তবের মনও তেমনি নিজের গতিতে চলে। সে যখন আনন্দে আপনার মধ্যে সমাহিত তখন কাল চলে এগিয়ে, মনের এক দিন শেষ হতে হতে হয়তো কালের তিন দিন পার হরে যার; তপস্বীদের একটি সমাধিতে একবার চোথ বন্ধ করে চোথ খুলতে খুলতে একটা কাল কেটে যাওয়ার কথা মিথ্যা নয়। আবার মন যখন চঞ্চল অধীর, বাইরে ছোটে, সে তখন কালের চেয়েও ক্রততর গতিতে চলে—তখন কাল পড়ে পিছিয়ে; একটি উদ্বেগের রাত্রে মাস্তবের কালো চুল সাদা হয়ে যায়, একরাত্রে গোটা যৌবন অতিক্রম করে মাস্তবের কালো চুল সাদা হয়ে যায়, একরাত্রে গোটা যৌবন অতিক্রম করে মাস্তবের কালো চুল সাদা হয়ে যায়, একরাত্রে গোটা যৌবন অতিক্রম করে মাস্তব্র কালো হল সাদা হয়ে যায়, একরাত্রে গোটা বেবির বেরিয়ে এলেন: শ্রামানন্দ।

বাইবে এসে শুরু হরে দাঁড়ালেন। না, দিন শেষ হয় নি, আকাশে আবার মেঘ উঠেছে। পশ্চিম দিগস্ত থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নিঃশন্ধ সঞ্চারে বনভূমির মাথা পার হয়ে চলেছে পূর্ব দিগস্তের পানে। মৃত্মন্দ বাতাসও বইতে শুরু করেছে। বেলা অবশ্য অপরাহু পার হয়েছে, পশ্চিম দিকে বনের প্রোয় শেষের দিকে মেঘাচ্ছয় আকাশে স্থের আভাস বোঝা যাছে। প্রবল বর্ষণ নামবে আবার। আকস্মিকভাবে মেঘ উঠে আসার জন্মই সন্ধ্যা নেমেছে বলে শ্ম হয়েছে তাঁর। কিন্তু আশ্রমটি অত্যন্ত শুরু বলে মনে হছে। মাহ্মর থাকলে তার অন্তিত্বের একটা আভাস অহ্নভব করা যায়, তাও অহ্নভব করা যাছে না। কোথার গেল সব প

- —কেশবাননা !
- —খামানন!
- यान्वानमा

—গোপালানন !

এবার সাড়া এল: গুরু মহারাজ!

विनानास्य मदन मर्क शांभानानन । स अस मांकान ।

-এরা সকলে কোথার গোপালানন্দ ?

গোপালানন্দ জোড়হাত করে বলল, ওহি কউয়াঠো আইলো গুরু মহারাজ, কেশব মহারাজজীকে সাথ কী বাতচিজ হইলো, কেশব মহারাজজী সবকইকে লিয়ে বাহার হোই গেলেন। হামাকে বোল দিলন কি—গুরু মহারাজকে বাতানা কি হমলোক যাচ্ছে, গুরু মহারাজকে হুকুম তামিল করকে ঘুমেকে।

মাধবানন্দ একটা গভীর দীর্ঘনিশাস ফেললেন শুধু। দাঁড়িয়েই রইলেন আকাশের দিকে চেয়ে। ফৌজদার প্রতিকার করে নি। কেন্দুলীর মহাস্ত ভরতদাস মহারাজের কথাই সত্য; ঈশবের প্রায়নীতির অন্তসরণে রাজ্যের নীতি, স্বর্গের গঙ্গার ভূমিতলবাহিনী অবস্থার মতই মহিমা সত্ত্বও মৃত্তিকামলিন। শাসকরাজা ফৌজদার-স্বাদারে আর শিবজরহিত স্কড়িতে কোন প্রভেদ নেই। জীবনের গ্লানি থেকে পরিত্রাণ আজ শাসননীতি এবং শাসক হতে অসম্ভব। আজ মৃত্তির জন্ম যজের প্রয়োজন।

আকাশের মেঘ দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেল প্রায়। ঘন কালো রঙ ফিকে হয়ে আসছে, সীসার রঙের মত রঙ ধরছে। স্বল্লদীপ্তির স্ক্র বিহাৎরেখা খেলে গেল—তামসীর মৃথের স্মিত হাস্তের মত। মৃহ গন্তীর গর্জনধ্বনি বেজে গেল গড়জঙ্গলের মাথার মাথার। দীর্ঘায়িত মৃহ গুরুগুরু ধ্বনি। মেঘ-মলারের আসর পড়েছে, মহামুদকে গৌরচন্দ্রিকার ঘা পড়ছে।

- -- গুরু মহারাজ!
- —िक्डू वन्ड, लाभानानम ?
- —না, গুরু মহারাজ, আপ কুছ আদেশ করে—?
- —না। যাও তুমি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম—এরা গেল কোথায়? গোপালানন্দ চলে গেল।

মাধবানন পদচারণা শুরু করলেন।

वाजान প্রবল হয়ে উঠল। দ্র থেকে ঝর ঝর শব্দ ক্রমশ নিকট হয়ে

আবাসছে। বনভূমির পাতার পাতার পরাবে পরাবে সঙ্গীতধ্বনির মত স্থর উঠছে। অজয়ে বস্তা আবাবে।

কী ভাবে কেশবানন্দ এ কাজ উদ্ধার করবে ? শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে বিফল হবে না তো ? কেশবানন্দ থাকতে তা হবে না। এরা কি বন্দুক নিয়ে গেছে ? হতাহতের সংখ্যা বেশী হবে ? হোক। পাপ যেখানে শক্তিকে আশ্রায় করে অন্তর সেখানে। এ ছাড়া পথ নেই।

আকাশের দিকে আবার চাইলেন। এখনও স্থান্ত হয় নি? না। এখনও হয় নি। এখনও পাথিরা ভাকে নি। শৃগালেরা সন্ধ্যা ঘোষণা করে নি। ও:, মন বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ছুটে চলেছে, মনের গতির সঙ্গে কাল চলছে না। জীবনের উদ্বেগর সঙ্গে নিক্ষরেগকালের সম্পর্ক নেই।

মাধবানন্দ আবার মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করে গীতা খুলে বসলেন। ওদিকে আবার বর্ষণ নামল বাইরে।

হঠাৎ একসমন্ত্র গোপালানন্দ ঘণ্টাধ্বনি করলে, শিঙার ফুৎকার দিলে। সন্ধ্যা হয়েছে তা হলে। গোপালানন্দ আরতির প্রদীপ নিরে আসছে। আরতির জন্ম উঠলেন মাধবানন্দ।

এক পদলা প্রবল বর্ষণের পর বর্ষণ ক্ষান্ত হরে এদেছে। ত্রস্ত বাতাদে মেঘ জতগতিতে চলে গেছে, তারই মধ্যে যতটা সম্ভব প্রবল বর্ষণ হরেছে।
শীতল হয়েছে পৃথিবী। পূর্বদিগস্তে মেঘান্তরালে শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদ উদিত হয়েই আছে। মেঘাচ্ছয়তার মধ্যেও তার আভাস ফুটে উঠেছে। আলো এবং অন্ধলরের সংমিশ্রণে এ প্রকাশ হয়েছে অপরপ—তুই রঙের মিশ্রণে এ বেন তৃতীয় রঙের ফ্টি। কলরোল তুলে জলস্রোত নামছে সেনপাহাড়ীর মাথা থেকে অজ্বয়ের দিকে; আশ্রমের আশপাশের শালবনের গাছের পাতা থেকে পাতায় জলবিন্দু ঝরছে; এর শব্দ বিচিত্র; সব নিয়ে এ এক সন্ধীত। মেঘ-মল্লারের সমাপ্তিপর্ব। মধ্যে মধ্যে এখনও মেঘ ডেকে উঠছে। দূর পূর্বদিগস্তে বিত্যংরেখা ঝলসে উঠছে। বর্ষণ চলছে, এগিরে চলছে।

গোপালানন্দ আরতির আয়োজন করে দিয়ে খণ্টায় থা দিলে, শিঙাধ্বনি তুললে। মাধবানন্দ আরতির পঞ্পশ্রদীপ তুলে ধরলেন।

পঞ্চশিখার ছটায় কংসারির হাতের তরবারি ঝকমক করছে, ঝলসে

ঝলসে উঠছে। অক্তদিন তো ওঠে না! না, এ তাঁর মনের বিভ্রম্ভি? না, এ সত্য। এ-ই সত্য। বিগ্রহ সত্য হলে এও সত্তা। সংশার কেন? মন্তিক্ষ থেকে পা পর্যস্ত রক্তধারা চঞ্চল বেগেই প্রবাহিত হচ্ছিল, সে বেগ ক্রতত্তর হল।

আরতি শেষ করে আবার তিনি বসলেন গীতা নিয়ে। কংসারির তরবারিতে আন্ধ বহিচ্ছটার মধ্যে তিনি ইঙ্গিত পেয়েছেন; কেশবানন্দ এতক্ষণ দলবল সমবেত করেছে নিশ্চয়; কেশবানন্দ পাষ্ডদলন করে অনাথা नित्र शत्राध मत्रना त्यात्रिक छेकात ना करत कितर ना। विष्क कि किनानम, এককালে রাজকর্মচারীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেশবানন্দ, পুণ্য-কর্ম-উত্তত কেশবানন্দ —তার সম্মধে বর্বর পাপী ও ধনী পিতাপুত্র ভয়ে আত্মমর্পণ করবে। উদারায়ের জন্ম অর্থ নিয়ে যারা তাদের দাসত করে, তারা কেশবানন্দের উদ্দেশ্যের কথা শুনে সভয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াবে। কেশবানন্দ নিশ্চর বলবে— वाधा फिल्ल खु थानरे रात्रार्य ना, रेरकानरे खुरू यार्य ना राज्यारापत, उरे নিরপরাধ বালিকার ধর্মনাশে সমুগত পাপীর সহারতা করার পাপে পরকালও হারাবে, অনম্ভ নরকে নরক্স হবে। সরে দাঁড়াও। কংসারির সেবক আমরা, পাণীকে ধ্বংস করে পুণ্যাত্মার প্রতিষ্ঠা আমাদের ধর্ম। আমাদের বিপক্ষে যে দাঁড়াবে, সে অধর্মপক্ষ সমর্থনের পাঁপে ভগবানের বিধানে ধ্বংস হবে। এই পাপে ভীম হত হয়েছেন, দ্রোণ ধ্বংস হয়েছেন। সাবধান! এখনও পাপপক্ষ থেকে সরে দাঁড়াও, অমতাপ কর, ভগবানের চরণে শরণ নাও, ধর্মকে আশ্রয় কর। অসহায়া কিশোরী কুমারীকে বক্ষা কর।

উত্তত হাতিয়ার সম্বরণ করে তারা কয়েক মৃহর্ত শুর থেকে হরিধ্বনি দিরে অস্ত্র রেখে বলবে, আমরা ধর্মের পক্ষকে বরণ করছি। উদ্ধার করুন, আপনারা মোহিনীকে উদ্ধার করুন।

প্রোট রমণ দে-সরকার পায়ে আছাড় থেয়ে পড়বে।—মার্জনা করুন। এখনি মুক্ত করে দিচ্ছি আমি তাকে। হয়তো বর্বর পশু অক্তৃর মানবে না। চিৎকার করবে; অস্ত্র হাতে নিয়ে উন্নত্তের মত বাধা দিতে আসবে।

মাধবানন্দ বিগ্রন্থের দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন—মনে মনে কামনা করলেন, তোমার প্রভাবে যেন কেশবানন্দের মধ্যে দৈবশক্তির সঞ্চার হয়; কেশবানন্দ সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শুধু বলবে—ওইথানে, ওইথানেই শঙ্কু হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্ পাষণ্ড। সদে সদে বর্বর অক্রুর পঙ্গু হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্বে। নির্বাক। শক্তিহীন পঙ্গু চোথে বিশ্বয়বিস্ফারিত দৃষ্টি।

উত্তেজনার চঞ্চল হয়ে উঠে পড়লেন মাধবাননা। মন তাঁর আর ধানে মগ্ন নয়, বাইরের জগতে ছুটে চলেছে, ইলামবাজারের দিকে। ও-পারের ঘটনা তাঁর মনের কল্পনার ঘটে চলেছে। পা তুথানিও আপন অজ্ঞাতে চলতে শুরু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে স্থির হয়ে কান পেতে দাঁড়ালেন। দলবদ্ধ মাছযের পায়ের শন্ধ, মৃত্ত্বরে কথা বলার শন্ধ তো শোনা যায় না! ওপার থেকে কেশবানন্দের গভীর কণ্ঠত্বরও শোনা যাছে না। সমবেত কণ্ঠের হরিধ্বনিও না। শোনা যাছে জল-কলরোল, জলত্যোত নামছে; তার সঙ্গে হাজার হাজার ব্যাঙের আনন্দ-চিৎকার; মধ্যে মধ্যে এক-একটা প্রমন্ত ময়্রের কেকাধ্বনি। আকাশের দিকে তাকালেন, কত রাত্রি হল প

এতক্ষণে তাঁর মন স্থানকালে বাঁধা পড়ল। অপরূপ! অপরূপ বাঁধা পড়েছ—স্থান ও কালের বেষ্টনীর মধ্যে হয়তো আক্ষিকভাবে, হয়তো বা কার্যকারণের অনিবার্য বন্ধনে। অপরূপ! এ কী রূপ! অবিশ্রাম্ভ বর্ষণে ঘনকুষ্ণ মেঘপুঞ্জ গলিত হয়ে ক্ষরিত হয়ে ক্ষীণন্ডর একথানি ক্ষ্টিক আন্তর্মণের মত পাতা রয়েছে। না। অতি ক্ষীণ এক তার মেঘ মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে তার উপর। যেন মসলিনের স্ক্ষা একথানি আন্তরণ মৃত্ব বাতাসে ছলছে। তারই অন্তরালে চতুর্দশীর চাঁদ অবস্তঃ চনত বিশ্বত-হাস্তম্থী কোন স্থাকিয়ার মত আকাশ-অক্ষনে চলম্ভ একথানি আসন পেতে বসে আছে।

মনে পড়ে গেল, বাদশাহ আলমগীর, মসলিনের-তৈরী-পোশাক-পরা কল্পা ন্দেবউন্নিসাকে দেখে বলেছিলেন—লক্ষাহীনা। চাঁদেরও রূপ তেমনি হরেছে, কিছু চাঁদ লক্ষাহীনা বলে তিরস্কারের অতীত। মানবীর অংক রূপের মাধুরীর সব্দে মোহ আছে, তাই তারও লজ্জা আছে, তার দিকে তাকাতেও লজ্জা আছে। চাঁদের তথু রূপের মাধুরীই আছে, মোহ নেই।

মাধবানন্দ একেবারে মৃক্ত অঙ্গনতলে নেমে এসে দাঁড়ালেন। নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে দিলেন বনভূমির মাথার উপর। মেঘের অবগুঠনে ঢাকা চাঁদের ওই অপরপ মাধুরী বনভূমির মাথার মাথার রূপালী রেগার একথানা মারাজালের মত বিছিয়ে রয়েছে। সভ-বর্ষণস্নাত শালের ঘনভাম পাতাগুলির উপর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত আলোর ঝিকিমিকি ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে বাতাসের আন্দোলনে পাতার দোলার দোলার যেন এই নিবছে এই জলছে, আলো যেন পাতার মাঝে তুব দিছে আবার ভেসে উঠছে।

মাধবানন্দ ধীরে ধীরে এসে নিমগাছের তলায় পাথরখানির উপর বসলেন। পাথরখানা এখনও ভিজে রঙ্গেছে, গাছের পল্পব থেকে টোপার টোপায় জল ঝরছে মধ্যে মধ্যে। থাক্ ভিজে, পড়ুক জল, তিনি পাথরখানার উপর বসলেন। মন বাঁধা পড়েছে এবার প্রক্লতির রূপের খেলায়। সন্মুখে অজয়, ওপারে কেন্দ্রিছ; মনে পড়ল গীতগোবিন্দ।

কবিরাজ গোস্থামীর বর্ণনার সঙ্গে আজ ঠিক মিলছে না। "মেঘৈর্মেতুর-মন্থরং বনভূবঃ শ্রামান্তমালক্রনৈ।" অম্বর আজ মেঘমেতুর নয়; বনভূমি স্থাম, তমাল না হোক—শালতক্রর শ্রামলতা গাঢ়ই বটে। জ্যোৎস্নার আলোয় শ্রাম আভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মেঘাড়ম্বর বিষণ্ণ নর—প্রসন্ত দীপ্তিমতী হয়ে এমন হলে বালক কৃষ্ণকে রাধার হাতে দিয়ে নন্দ তাকে গৃহে পৌছে দেবার কথা হয়তো বলতেন না।

আবার মন ফিরে এল বাস্তব বর্তমানে, আঞ্চকের দিনের ঘটনাবর্তে, উদ্বিগ্ন চিস্তায়। মাহুবের সাড়া উঠছে নিকটেই কোথাও। একদল লোক যেন কলকল করতে করতে আসছে।

ফিরল ? তা হলে কেশবানন্দরা ফিরল পাষগুদলন করে, অসহায়াকে উদ্ধার করে? আসন থেকে উঠে পড়লেন। এসে দাঁড়ালেন আশ্রমের ফটকে। কথা এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

— তিন পোর চেঁরে বেশী হবেক আমি বলে দেলম। এক ভার করাকরি।

- —হাঁ। এক ভার লয়, এক মণ। মাগুর লয়, কুমীর বটে উটা তোর। হাঁ।
 - উরিমারে! উরিমারে! উ! উ! উ! আর্তনারীকঠ!
 - -- সাপ! সাপ! সাপ!

কলরব উঠল। পর-মুহুর্তেই আর্ত কলরব হাসিতে ভেঙে পড়ল।

- —মরণ দশা, ল্যা-লীর দড়িতে পা দিয়ে (খড়ের দড়িতে) ঢঙ দেখ ছুঁড়ীর!
- —হি-হি-হি! মাইবি বলছি, তুর কিরে (দিব্যি) আমি বলি গেলম, লিলেক আমাকে যমে, থেলেক কালে। অমন মাগুর মাছটো আর খ' হল নাই আমার। হি-হি-হি!

নারীকণ্ঠের কৌতুকহান্তে বনের পল্লবদল যেন চকিত হয়ে উঠছে।
পল্লীবাসী দরিদ্রের দল, আজ এই বর্ষণের পর নালায় খালে জলের চল
নামার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল মাছের সন্ধানে। মাছ ধরে ফিরছে।
কেশবানন্দেরা নয়। কিন্তু ওরা কি ওপারের কোনও কোলাহল শোনে নি?
নিন্তুক রাত্রি, অজয়ের ওপারের কোলাহল এপারে আসবে না? এত বড়
কোলাহল! এ কোলাহল তো ক্ষুদ্র হবে না!

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাকলেন, কারা যায়! কারা তোমরা?

- আমরা গ। গাঁয়ের লোক। মাছ-ধরনে যেয়েছিলাম গ।
- —অজ্ঞাের ধার থেকে আসছ তোমরা ?

শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন মাধবানন্দ এবং কথা শেষ হতে হতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে চিনতে তাদের দেরি হল না। তথন মেঘ কেটে খানিকটা নীল আকাশের প্রকাশ হয়েছে প্রায় মাথার উপর, আধখানা চাঁদ তার মধ্যে পূর্ব জ্যোতিতে দীপ্যমান। তাঁকে চেনবামাত্র তারা সদম্বমে বললে, গোসাঁই-বাবা মহারাজ।

- —ইয়া। অজ্বের ওপার থেকে কোনও গোলমাল শোন নি তোমরা ?
- —গোলমাল ? আজ্ঞা, কই না তো ! বরং চুপচাপ গ সব। বাদলের ঠাণ্ডিতে সব ঘুম দিছে লাগছেক।

—হঁ। আচ্ছা, তোমরা যাও।

চিস্তিত মনে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। গ্রাম্য লোক কটি তাঁর ন্তক্ষতার গান্তীর্থে শক্ষিত হয়ে আর দাঁড়াতে সাহস করলেনা, নীরব হয়েই স্থান ত্যাগ করলে।

মাধবানন্দ কণ্ঠস্বর উচ্চ করে ডাকলেন, গোপালানন্দ !

আশ্রমের ফটক থেকেই সাড়া দিল গোপালানন্দ: গুরু মহারাজ! গুরু মহারাজ আশ্রম ছেড়ে বাইরে বের হওরার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁকে অহসেরণ করেছিল। মাধবানন্দ লোক কয়টির সামনে দাঁড়ালেন যথন, তথন সে ফটকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মাধবানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সেও আছে।

সাড়া দিয়ে সে এসে কাছে দাঁড়াল। বলিষ্ঠদেহ স্থুলবৃদ্ধি গোপালানন্দ, গুরু মহারাজ্বের আশেপাশে ঘোরে মন্ত্রম্ম পোষা বাঘের মত। গুরু বসে থাকেন, সে তাঁর দিকে মৃশ্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গুরু মহারাজ শ্বোত্র পাঠ করেন, সে দূর থেকে উৎকর্ণ হরে শোনে। পোষা পাথির মত শুনে যতটা আয়ত্ত হয়, সেইটুকুই ঠিক তেমনিভাবে, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত নকল করে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করে। ভালবাসে হাইপুই গাভী কটিকে। মধ্যে মধ্যে অকারণে কাঁদে। প্রশ্ন করলে স্থুলদৃষ্টি মেলে উত্তর দেয়: ভর ত্নিয়া ত্থ, ত্থ আগত্তর ত্থ মাল্ম হোতা হায়—গ্রহি ত্থদে রোতা হায় মহারাজ।

কতদিন মাধবানন্দ নিজে তার চোথ মৃছিয়ে দিয়ে সাস্থনা দিয়েছেন।
তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছেন, আনন্দ হার ভগবানমে।
উনকো দর্শন তুমারা মিলেগা বেটা।

মধ্যে মধ্যে সামান্ত কারণে রাগে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। তথন সামনে এসে দাঁড়ান কেশবানন্দ। কেশবানন্দকৈ তার প্রচণ্ড ভয়; মাধবানন্দের শিশুত গ্রহণের সময় কেশবানন্দই তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

হাতভোড করে গোপালানন্দ বললে, গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দ বললেন, তুমি গিয়ে অজরের ধারে দাঁড়িয়ে থাক। ও-পারে কোন গোলমাল শুনলেই ওখান থেকে শিঙা বাজিরে আমাকে জানাবে। ও-পার থেকে কেশবানন্দরা ফিরছে দেখলেই বা ব্ঝলেই আমাকে এসে থবর দেবে।

গোপালানন্দ বললে, হাঁ গুরু মহারাজ।

—শিঙা নিয়ে যাও গোপালানন।

যেতে যেতে ফিরে গোপালানন্দ সবিনয়ে হেসে বললে, হাঁ হাঁ বাবা শুরু মহারাজ।

শিঙা নিয়ে সে চলে গেল; তার মোটা গলার গান ক্রমশ দ্রে চলে গেল।

> "তনি স্থথ মিলে ভিথ্দাতা স্থদাতা।"

মুহূর্ত দীর্ঘ হয়ে যেন প্রাহর মনে হচ্ছে। সময় চলছে না। এরই মধ্যে বিপ্রাহর ঘোষণা করে শিবারব ধ্বনিত হল; প্রাচারা ভাকল, বাহুড়ের। উড়ল। আর থাকতে পারলেন না মাধ্বানন্দ, নিজেও বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে পড়বার সময় তরবারিখানি টেনে নিলেন কংসারির বেদী থেকে।

কী হল ? কেশবানন্দের। ভয়ে পারলেন না অগ্রসর হতে ? প্রথম উভ্নমেই ব্যর্থতা ? তু পাশের ঘন শালবনের মধ্যে এখনও জলম্রোত নামছে; পায়ের তলায় রাঙা মাটি নরম হয়ে খানিকটা পিছল হয়েছে। সন্তর্পণে চলতে হছেে। পথও ভাল দেখা যাছে না। সেই ছায়াছয় জ্যোৎসার দীপ্তিময় স্থামবর্ণাভা যেন মান হয়ে গেছে। ও! আকাশে মেঘ আবার গাঢ় হয়ে উঠছে; পশ্চিম দিগস্তে আবার একখানা নিক্ষ-কালো মেঘ মুখ বাড়িয়ে বুক পর্যন্ত যেন এগিয়ে আসছে। তারই প্রথম অংশটা টাদকে ঢাকছে। আদ্ধকার মৃহুর্তে মৃহুর্তে ঘন হছেে যেন মহাকাল-প্রেয়সী সতী দক্ষযজ্ঞের স্টনায় শ্রামা থেকে কৃষ্ণা কালী হয়ে উঠছেন।

অবস্মাৎ নিশীথ-রাত্রির এই কৃষ্ণরূপান্তর চকিত হয়ে উ্ঠল বিহাৎ-চমকের দীপ্তিতে, তারই সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শিঙা বেজে উঠল। মাধবানন্দ উল্লসিত হয়ে প্রাণ খুলে ডাক দিয়ে উঠলেন, জয় কংসারি!

তাঁর ডাক শেষ হতে হতে মেঘ ডেকে উঠল গুরু গুরু গুরু গর্জনে।

কিন্তু সে গর্জন মাধবানন্দের মনে যেন ধরাই পড়ল না। মনে হল, গোপালানন্দের শিঙাধ্বনিই দিগ্দিগন্তে বিপুল হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে।

—জর কংসাদ্ধি! তোমার নির্দেশ, তোমার ভক্তদের মধ্যে সার্থক কর। পাপীর ক্ষয় হোক, সাধু পুণ্যাত্মার জয় হোক; নিরীহ, অসহার, পরিত্রাণ লাভ করক।

জ্বতপদে অগ্রসর হলেন তিনি। ই্যা, তিনিও কোলাহল শুনতে পাছেন।
ও-পারে আ-আ-আ ধানি উঠছে। প্রচণ্ড কিছুর আঘাতশন্ধ উঠছে যেন—
হম-হম্-হম্। বোধ করি দে-সরকারের বড় দরজায় ঢেঁকির ঘা পড়ছে।
ঢেঁকি দিয়ে ঘা মারলে গড়ের দরজাও ভেঙে পড়ে। বড় বড় জমিদারের
ঘরে ডাকাতেরা এই ভাবেই দরজা ভাঙে।

দক্ষে সক্ষে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ডাকাতি! এ কি ডাকাতি নয়? স্থাপুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন মাধবাননা। কতক্ষণ তার স্থিরতা নেই। তিনি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিলেন। উপায় নেই। আর মৃক্তি নেই। ও-পারের কোলাহল বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকছে। কোথায় যেন বাজ্ব পড়ল, প্রচণ্ড বিত্যুৎ-দীপ্তি, পরক্ষণেই ভয়য়য় মেঘগর্জনে সব কেঁপে উঠল। সেই মৃহুর্তেই নারীকণ্ঠের আর্তিচিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল কোথাও। কাছেই কোথাও। যেন ওই নদীর ধারে!—আ—

মাধবানন্দের সর্বশরীরে যেন বিত্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। তিনি ছুটলেন।

—আ—। ছেডে দাও। বাঁচাও। আ—

নাধবানন্দ দিক লক্ষ্য করে ছুটে এসে উঠলেন অজ্ঞরের বাঁধের উপর। চিৎকার করে ডাকলেন, গোপালানন্দ!

একটা ক্রুদ্ধ জাস্তব গর্জনে উত্তর এল: আ:—

ঠিক সেই মুহুর্তে একটি বিহাৎ চমকের মধ্যে মাধবানন্দ দেখলেন, এই দিকেই ছুটে আসছে একটি বালিকা—কিশোরী। চকিতে দেখাতেই মনে হল অপরূপা মেয়ে। তার পিছনে তুই বাছ বিস্তার করে ছুটে আসছে লালসার উন্মন্ত দানবের মত গোপালানন্দ।

মাধবানন্দ কঠোর চিৎকারে শাসন করে হাঁক দিলেন, গো-পা-লা-ন-ন্দ! মেরেটি সেই মুহুর্তেই তাঁর পায়ে এসে চিৎকার করে আছাড় থেরে পড়লঃ

ভাগে গো-সাঁ-ই! কে? মোহিনী? কিন্তু সে দেখবার তখন সময় ছিল না। তার পিছনে কামার্ত গোপালানন্দ সেই কুদ্ধ আন্তব চিৎকারে উত্তর দিল: আ:! চোখ গুটি তার জলছে। উন্নত্ত দৃষ্টি, পাশব কামার্ততায় সে ক্রক্ষেপহীন, তার জ্ঞান বৃদ্ধি ভর সমন্ত বিল্পু হয়ে গেছে। সে গুরু মহারাজকে চিনতে পারছে না। দাঁতে দাঁত টিপে, কঠিন আকোশে সে তাঁর উপর আক্রমণোগ্যত হয়ে উঠেছে এই মুহুর্তে।

মাধবানন্দ মৃত্যুর্তে তাঁর হাতের তরবারিখানার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিদ্ধ করে দিলেন গোপালানন্দের বৃকে। উষ্ণ তরল একটা ধারা পিচকারির মুখের ধারার মত তাঁর দেহে এসে লাগল। বারেকের জন্ম চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। চোখে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, রঙ কালো মনে হচ্ছে আলোর অভাবে কিছু উষ্ণ স্পর্শে, গাঢ়তায়, গদ্ধে বলে দিছে—রক্ত।

মাথার মধ্যে যেন বজ্বপাতের বিহ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল। তীব্রতম উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলেন মাধবাননা। জীবনে তাঁর এই প্রথম স্বহস্তে অস্ত্রাঘাতে আততায়ীকে হত্যা। অসহায়া ভীতার্তা একটি কুমারীকে রক্ষা করতে, কামোন্মন্তার হিংস্র পশুতে পরিণত গোপালানন্দের দানবের মত শক্তিকে প্রতিহত করে তাকে হত্যা করেছেন। গোপালানন্দ তাঁর শিশু। সে তাঁর সন্তান হলেও এমনি দৃঢ়হন্তে তরবারি ধরতেন তিনি। ছই কানের পাশ দিয়ে যেন আগুনের উত্তাপ অক্ষত্তব করছেন। চোথ যেন আগুনের উত্তাপ অক্ষত্তব করছেন। চোথ যেন আগুনের উত্তাপ অক্ষত্তব করছেন। চোথ যেন হলেছ। প্রবল বর্ষণসিক্ত দিনটির বাতাসের শৈত্য শ্লিশ্ব বলে মনে হলেছ।

পরক্ষণেই হতচেতন মেরেটিকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন এবং দৃঢ়
মৃষ্টিতে রক্তাক্ত তরবারিখানা ধরে অকারণে উহাত করে ফিরলেন। আশ্রমে
ফিরে মন্দিরের দাওয়ার উপর নামাতে গিরে নামালেন না। এদিকের
সেবকদের ঘরের দাওয়ার ধুনি অর্থাৎ অহরহ প্রজ্ঞলিত অয়িকুগুটার পাশে
মেয়েটাকে নামিয়ে দিলেন। মেয়েটার বেশবাস সর্বাক্ত জলে ভিজেছে,
হাত তুটোর স্পর্শ যেন হিমের স্পর্শ। ধুনির কাঠগুলি একটু ঠেলেও দিলেন।

তারপর নিজে উর্ধনোকে মুখ তুলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে দীড়িয়ে রইলেন। প্রবল একটা গতিবেগে তিনি যেন ভেসে চলেছেন।

নিয়তি ? ব্ৰাতে পারছেন না, তাঁর মন এবং মন্তিক যেন ন্তক হয়ে গেছে। তিনি যেন নিজে চলছেন না। ত্বয়া হ্যাকেশ হাদিছিতেন—আ;, তারপর কী ? স্থাতিও যেন বিশ্বতির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। হারিয়ে যাচ্ছেন নিজে।

একসময় করুণ আবেগভরা নারীকণ্ঠের মৃত্স্বরে এবং পারের উপর কোমল কিছুর স্পর্শে চমকে উঠলেন মাধবানন।—কে ?—ওঃ, সেই মেয়েটি! সচেতন হয়ে উঠলেন এতক্ষণে। দৃষ্টি নামালেন।

কথন চেতনা পেরে মেয়েটি উঠে তাঁব পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে বলছে, দয়াময় নবীন গোসাই! ঠাকুর! ওগো দেবতা!

এ কী, এ যে মোহিনী ! ই্যা, এ তো মোহিনী ! সেই ভাষা।

— खर्र। खर्र, कृषि खर्र। भा हाए। खर्र।

তাঁর বাক্য অবহেলা করবার মত শক্তি মোহিনীর নেই, সে পা ছেড়ে উঠে হাত জ্বোড় করে নতজান্ত হয়ে দেবতার সম্মুখে পূজাথিনীর মত বসল।— তোমার দয়া ছাড়া আমি বাঁচতাম না গোসাঁই। ঠাকুর, তুমি আমার সাক্ষাৎ ভগবান।

এর উত্তর দিতে পারলেন না মাধবানন। ওদিকে ধুনির আগুন চমকে উচ্জল হয়ে উঠেছে, সেই আগুনের আভা পড়েছে মোহিনীর সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য মনে হচ্ছে। এ তো ভিখারিণী অসহায়া মেয়ে নয়, এ যে কোন অপরপা রাজনন্দিনী, মহার্ঘ বেশবাস, কপালে চন্দনের ছাপ, চোখে কাজল। কেমন করে হল? তবে কি—

॥ हजूम न नित्रष्टम ॥

ওই কটি কথা বলেই যেন সকল আবেগ শেষ করে নিঃশেষ হয়ে গেছে মোহিনী। ক্লাস্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে ছিন্নমূল লতার মত। চোথ ছটি আপনা থেকে বুজে আসছে, মধ্যে মধ্যে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। উপবাসক্লিষ্ট বিশীর্ণ মুখ। তার সে মুখ দেখে করুণা না হয়ে পারে না। চোখ থেকে জালের ধারা নেমে আসছে।

মাধবানন্দ অধীর হয়ে উঠলেন। অস্তরে মমতা বিগলিত তুষারের মত প্রোতবতী হয়ে উঠছে, অন্ত দিকে প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্বেগে উত্তেজনার তিনি আরেয়গিরির মত উত্তাপে বিস্ফোরণোনুথ হয়ে উঠেছেন। ওই কল্মিত দেহটাকে বাঁচাতে নরহত্যা করলেন তিনি ? আত্মা মরেছে অক্রের হাতে ? তার কী হল ? তাঁর কণ্ঠস্বর গন্তীর হয়ে উঠল। আবার প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে বল ? তুমি একা কেন ? একলা তুমি কেমন করে এলে ?

- * অজয় পার হয়ে বনে বনে অজয়ের ধারে ধারে পালিয়ে এসেছি গোসাঁই।
 তুমি ক্সামাকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমাকে বাঁচাও।
 - —তুমি বেঁচেছ ?
 - এ প্রশ্নে অবাক হরে তাঁর মুখের দিকে চেরে রইল সরলা গ্রাম্য কিশোরীটি।
- —যদি বেঁচেছ তো এই প্রেতিনীর সাজ কেন তোমার? অকুর তোমাকে—

এবার ব্ঝল মোহিনী। ঘাড় নেড়ে স্মিত হেসে বললে, না, সে আমাকে ছুঁতে পারে নি, সেও তো তোমার দরা ঠাকুর। ওদের বাপ-বেটাকে যে ফৌজদার ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেও তো তুমি চিঠি নিকে দিয়েছিলে গোসাঁই। বিকেলে ফিয়ে এসে বড় সরকার আমাকে বললে—তোর নবীন গোসাঁই তোকে ছাড়িয়ে নিতে ফৌজদারকে চিঠি নিকেছিল, এবার কীকরে ছাড়ায় দেখি! কায়য় বৈষ্ণবের ছেলের সেবাদাসী হতিস, এবার য়া, নবাবী হারেমে বাঁদী হয়ে থাকবি, য়া। আমাকে সাজিয়ে-টাজিয়ে নৌকায় তুলে দিয়েছিল সন্জের সময়। ভোর ভোর আমাকে শহরে নবাবের কাছে নিয়ে যেত।

সঠিক বুঝতে পারলেন না মাধবানন্দ—কী বলছে মোহিনী। সবিশ্বয়ে প্রশ্ন করলেন, নবাবের কাছে পাঠাচ্ছিল তোমাকে ?

—রাজনগরে রাজার কাছে ঘোরস'র (সওয়ার) পাঠিয়েছিল বড় সরকার। বৃদ্ধি থাটিয়ে চিঠি নিকেছিল—

বড় সরকার—রাধারমণ দে শুধু কৃতী ব্যবসায়ীই নয়, তার সঙ্গে কৃটবিষরবৃদ্ধিতে চতুর তীক্ষধী ব্যক্তি। কৌজদার হাফেজ থা উদার মুসলমান, আয়বান শাসক। তিনি পত্র পড়ে অভিভূত হয়ে, ভোর-রাত্রে সগুয়ার পাঠিয়ে, সরকারদের পিতাপুত্রকে নিজের কাছারিতে হাজির করেছিলেন। কিন্তু রমণ সরকার হাতেমপুর রওনা হবার পূর্বেই ফৌজদারের লোকুদের কাছে সকল বিবরণ জেনে নিতে কিছু অর্থব্যয় করতে কার্পণাও করে নি, ভূলও করে নি। এবং রাজনগর দরবারে একথানি পত্র লিথে ফ্রতগামী সংবারের হাতে দিয়ে তৃটি মূল্যবান পারশ্রসাগরের মূক্তা ও স্বর্ণমুলা উপঢ়োকন সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে, গোবিন্দ শারণ করে, নির্ভয়ে রওনা হয়েছিল। তাতে সে লিথেছিল—মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপ আয়বিচারকারী বীরভূমাধিপ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজনগর-রাজ জনাবআলি বাহাত্রের সমীপে ইলামবাজার-অধিবাসী পুরুষান্তকমে রাজান্তগত তুলা ও গালা-ব্যবসায়ী রাধারমণ দে-সরকারের একান্ত বিনীত আরজি এই যে—। তীক্ষবৃদ্ধি দে-সরকার মূহুর্তের চিস্তায় আশ্রুষ্ঠ বার্যকরী প্রতিরাধ-পন্থা আবিজার করেছিল।

নবাব স্থজাউদ্দিন গত। নবাবজাদা সরফরাজ থাঁ মসনদে বদেছেন।

সরফরাজ থাঁর চরিত্র অতি বিচিত্র। তাঁর হারেমে প্রার হাজারখানেক উপপত্নী। কেউ বলে—নারীবিলাসী কাম্ক, কেউ বলে—নাবাবজাদার বিচিত্ত ধনসাধন-পন্থায় ওরা তাঁর সহচরী। উপপত্নীর অহ্নথ হলে নবাবজাদা কোরান মাথায় সারাদিন প্রথর রৌত্রে দাঁড়িয়ে থাকেন। দে-সরকার নিজেও নারী নিরে ধর্মদাধনা করেছে। চতুর ব্যবদায়ী, টাকা-আনা-পাই নিরে সারাদিন অন্ধ ক্ষে; গুদামে মাল বোঝাই করে ধরে রেখে ছ মাস পরের বাজার-দর বাঁধে। সে হিসেব করেই রাজনগরের রাজাকে জানাল যে, ভাবী নবাব শাহেবের ধর্মশাধনার পথে সহায় হইবার যোগ্যতা আছে এবং সেবার তাঁহাকে তুষ্ট করিবার নিষ্ঠা আছে দেখিরা একটি বৈষ্ণব-বালিকাকে তাহার মায়ের কাছ হইতে উচিত মূল্য দিয়া ক্রন্ত্র করিরা অগ্যাগ্র উপঢৌকনসহ তাহাকে রাজধানী মুরশিদাবাদে ভেট পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছি। এবং নিজের জন্ম রায় থেতাব প্রার্থনা করিয়াছি। কিছু অজ্বের ওপারে গড়জঙ্গলে আগস্কুক এক ধর্মান্ধ সন্ন্যাসী ইহাতে হিন্দু-কত্মা মুসলমানের হাতে সমর্পণ করা হয়--এই অজুহাত তুলিয়া হাতেমপুরের নৃতন ফৌজদার সাহেবের বরাবর এক পত্র পেশ क्तिशाष्ट्र । . मत्मह रुश्न, এই বৈষ্ণব সাধু নিজেই নবাবের নামে জ্য়-করা এই অপরূপ গুণ ও রূপবতী কুমারীটিকে মনে মনে কামনাও করে। হাতেমপুরের ফৌজদার ব্যাসে নবীন—ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার ় **জন্ম অধীনকে এবং তদীয় পুত্রকে একরূপ গ্রেপ্তারই** করিতেছেন।

এর ফলে বেলা তুপহর নাগাদ রাজনগর থেকে সওয়ার এসে হাতেমপুরের ফৌজদারী কাছারিতে নবাবী তুকুমত জারি করে দে-সরকারদের
পিতাপুত্রকে মুক্তি দের। সেই দেখেই করে। ছুটে এসেছিল আশ্রমে।
করোর সংবাদ নিয়েই কেশবানন্দরা বের হয়ে গেছে। কয়ো একটা সংবাদ
পার নি। সে সংবাদ হল এই যে, রাজনগরের রাজার আরও একটি তুকুম
ছিল। সে তুকুম দে-সরকারের উপর। তুকুম ছিল, ওই বাদীকে ভেট সহ
অবিলম্বে আগামী প্রত্যুষের মধ্যে যেন মুরশিদাবাদ রওনা করা হয়। এই
তুকুম খেলাপে দে-সরকারকে মন্দ অভিপ্রায়ের জন্ম দারী করা হইবে।

রাজনগরের ঘোড়সওয়ার নিজে দাঁড়িয়ে, মোহিনীকে নৌকায় চাপানো দেখে তবে রাজনগর ফিরে গেছে। দে-সরকার আপসোস করে বলেছিল, রাজকুল, চিরকালই বুনো তেঁতুলের মত জোঁদা টকই থাকল রে বাবা, যত গুড় দিরেই রাঁধ না কেন, থেলে শুধু অম্বল নর—অম্বলশূল হবে।

সাজিয়ে-গুজিয়ে মোহিনীকে নৌকায় তুলে দিয়ে, তার সঙ্গে গালার থেলনা, মসলিন, বিষ্ণুপুরের রেশমী কাপড় এবং আবও নানান জিনিসে নৌকা সাজিয়ে, মালা-মাঝি এবং পাহারাদার জিম্বা করে নেমে যাবার সময় দে-সরকার মৃথভিদ করে মোহিনীকে বলেছিল, যাও, লবাবী হারেমে গিয়ে বাদীগিরি কর, গরম গোন্ড আর প্যাজ-রন্থনের কালিয়া পোলাও থেয়ে বহুমী-জন্ম সার্থক কর। তোমার নবীন গোসাঁইয়ের বাবার বাবা এলেও এথেকে রক্ষে নাই।

জিমায় রেখে গিয়েছিল জন তুই পাইক আর মাল্লাদের। কিছুক্ষণ পর এসেছিল ফুলজান বিবি, সে তার সঙ্গে যাবে।

অতি সরল, ভীরুপ্রকৃতির মেরেটি প্রথমটার দে-সরকারের এত কথা শুনেও বুঝতে খুব কমই পেরেছিল। যেটুকু বোধশক্তি, তাও ভরে বিহ্বলতায় দিশাহার। হয়ে গিয়েছিল। এমন মনোহর সাজে সেজে নৌকার চড়ে এইটুকু শুধু বুঝেছিল যে, তাকে নবাবী হারেম নামক কোন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। নৌকার ছইরের মধ্যে খাঁচার বন্দিনী হরিণীর মত ছু পাশের ঘুটি ছোট ঘুলঘুলির কাছে এসে বাইরের দিকে চেয়ে ভয়ার্ড এবং বিহবল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রবল বর্ষণ নামল, মুই পারের সমস্ত-কিছু বর্ষণধারার মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর সন্ধ্যা হল, রাত্তি নামল, দে একসময় ক্লাস্ত হয়ে পাটাতনের উপর বিছানো একথানা শতরঞ্চির উপর বদে পড়ল। অন্ধকার হয়ে গেছে ছইয়ের ভিতর, দেই অন্ধকারই যেন পৃথিবীজোড়া অন্ধকার, তারই মধ্যে দে ডুবে গেছে। মাল্লারা বাইরে থানিকটা ঢাকা অংশের মধ্যে তামাক থেতে থেতে গল্প করছিল ফুলজান বিবির সঙ্গে। ফুলম্বান বিবি ইলামবাজারের গালার চুড়ির বিখ্যাত চুড়িওয়ালী। সে বরাত দিয়ে চুড়ি তৈরি করিয়ে হিছড়ে ঝাঁকাওলীর মাথায় চাপিয়ে বড় বড় জমিদার মহাজন থেকে কাজী ফৌজদার মনসবদার সাহেবদের অন্দরে গিয়ে বহু-বেটী-বিবিদের চুড়ি পরিয়ে আসে। বছরে ত্-তিনবার মুরশিদাবাদ যার, তথন স্থবা বাংলার স্থবাদার, নবাব বাহাত্বের হারেমে গিয়ে চুড়ি পরিয়ে আসে। হারেমের পোজা বাঁদী বেগম, এমন কি নবাবও তাকে চেনেন। নবাব স্থজার ফররা-বাগেও সে অনেকবার গিয়েছে। চেহেল-সেতৃনের সব সে চেনে। বিশেষ করে নতুন নবাব সরফরাজ থাঁ তাকে ভাল করে চেনেন। হাজারখানেক বেগম। নবাবের থেয়ালে সব বেগমকে কথনও একরকম চুড়ি পরিয়েছে, কখনও রকম রকম পরিয়েছে। ফুলজান প্রোঢ়া কিন্তু সাজ্ত-সজ্জা করে তরুণীর মত। এবং দোক্তার সঙ্গে তার ফুরসি নিয়ে সে মাল্লাদের গাল দিচ্ছিল আর গল করছিল: উল্লু—বুরবক—ছোট জাত—ছোট আদমী, জহাল্পমে যা। এই তোরা ছিলম বানিয়েছিল! তোবা—তোবা আমার খুসবইদার তমকুল **এমন করে বানালি যে সব বরবাদ হয়ে গেল! নবাব স্থবাদার হলে** কী করত জানিস রে বেকুফ! ফুরসির নল সটাকসনি আছড়ে ফেলে হাঁকত— আবে কৈ হার রে ? কোতল করনা ছিলমবরদারকো। ই ! দে রে বুরবক, উল্ল, বন্দর, একটা কাঠি-উঠি দে; খুঁচে-থেঁচে দেখি কী হয়! আরে, বোলাও না, ওহি লেড়কীকে বোলাও; তম্কুল পিলাতে তালিম দেই দি। নবাবী হারেমে যাবে, আর ওর যা স্থরত, আর নতুন নবাবের যা নজর, তাতে ' ওর নসীব খুলবে। সঙ্গে সঙ্গে হারেমে কি ফররা-বাগে ভেজবে। একদিনমে বেগম বনেগী। পেশোয়াজ ওড়না পরিয়ে কিংখাবের বিছানার বসিয়ে বাঁদীরা শরবৎ আনবে, তারপর পান, তারপর হাতে তুলে দেবে ফুরসির নল। বেকুফের মত টেনে কেশে মরবে। বমি করবে।—তার চেরে আন ওকে, তালিম দেই দি। নদীবওয়ালী গরিবের বেটী হত—ভুঁড়িওলা তুলাবেচা সরকারের ওই ভালুর মত বেটাটার বাঁদী, নরতো ওই ওপারের ওই যে নতুন हिन्दू क्कित- अतरे भाषा कुछ, छ। ना। এक्तित नत्रीय धूनन, ठनन শহর মুরশিদাবাদ, স্থবা বাংলার স্থবাদার জঙ্গ বাহাত্র নবাব-উল-মূল্ক সরফরাজ খাঁ বাহাত্রের চেহেল-দেতুন না হয় ফররা-বাগ! হা-রে-হা! হা-রে-হা! त्न, कहे इराहरू, तम तमिश हिता। जूहे विका हिता हिता धारा भूँ हा নিকাললি রে কি কই ইটাকে ভাঁটা মে আগ লাগা মালুম হোতা। ছোটা আদমী, ছোটা জাত, উল্লু বান্দর কাঁহাকা! আমার যদি একতিয়ার থাকত তো তোদের চাবুক লাগাতাম। আর ওই হিন্দু ফকিরকে ধরে এনে কলমা

পড়িরে এক বৃঢ্টীর সবে নিকা দেওয়াতাম। হাঁ। এই এমন ছোকরী, তার উপর তার নজর!

মাল্লা একজন বলেছিল, আমাদের গাল দিচ্ছ দাও, নবীন গোসাইকে নিম্নে পড়লে কেনে ? সে কী করলে ?

— মাঁ ? কী করছে ? কেয়া কিয়া হায় ? ওহি ওহি ফকির তো দব করলে বে ব্রবক ! ওর নজর ছোকরীর উপর ছিল কিনা—তাই কউয়ার পাশ যব শুনলো কি, অক্কুকর ছোকরীকে ঘর মে লে গিয়া, কাল পূর্ণমাসী রোজ, উসকী সেবাদাসী বানা লেগা, ব্যস—এক চিঠ্টি লিখা ফৌজদার হাফেজ খাঁ বরাকরে। হঠ্ হঠ্, পানের পিচ ফেলে নিই আগে।

পানের পিচ ফেলে নতুন পান জ্বদা থেয়ে খুসবইওয়ালা তমকুলের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ফুলজান বক বক করে বকে একলাই নদীর বুকে নৌকার মজলিসটি জমিয়ে রেথেছে।

মোহিনী উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেই চলেছে। যতই শুনেছে, ততই বেদনা, নৌকার তলার অজয়ের জলের মতই বেড়ে চলেছিল। নৌকাথানার দোলা বাড়ছিল, ছলছল শব্দ ক্রমশ যেন কলকল ধ্বনিতে রূপাস্তরিত হচ্ছিল, সেই শব্দের অস্তরাল দিয়ে মোহিনী কাঁদতে কাঁদতে একটি কথাই বলে চলেছিল—ওগো গোসাই, ওগো দেবতা, যদি ওই অক্কুরের মত কুমীরের হাত থেকে বাঁচালে, এতই দয়া যদি করলে, যদি দাসী হিসেবেই আমাকে চেয়েছ, তবে মাঝনদীতে ছেড়ে দিয়ে ভাসিরে দিলে কেনে? আমি যে সাঁতার জানি না দয়াল! কুমীর ছেড়েছে, এখন ভেসে চলেছি হাঙ্রের দহে। দেবতা, নবাবের হাত থেকে বাঁচাতে তুমি ভগবানকে খত নিকলে না ক্যানে? তোমার খত তো তাঁর দরবারে পৌছয়! ঠাকুর! দয়াল! ওগো নবীন গোসাঁই!"

এরই মধ্যে শেয়াল ডাকল, রাত্রি এক প্রহের হল। ফুলজান ছইয়ের মধ্যে এদে খানা নিয়ে বললে, খা, ছোকরী, খেয়ে নে! বাইগুনের কাবাব আছে, রোটী আছে, ঠাণ্ডি ভাত আছে, পিঁয়েজ দিয়ে বছত তরিবত করে কুরতি

ক্লাইবাঁটা আছে, পুঁটিমাছের কালিয়াভি আছে। খা। পোলাওয়ের থারি, মূরগ মসল্লম থাবি ছদিন পর, তখন দেখিস ফুলজানের হাতের পাকানো খানা ভাল, না, নবাবের বার্টিখানার খানা পাকানো ভাল!

মোহিনী তথু ঘাড় নেড়ে জানিমেছিল, সে খাবে না।

ফুলজান আরও বার হুরেক খেতে বলে আর বলে নি, নিজেই থেতে বদে গিয়েছিল। বকা ফুলজানের স্থভাব, থাবার সময়েও বকেই চলেছিল। মোহিনীকেই বকছিল ফুলজান। ছোট জাত, ছোটলোকের বেটার মন কি ফুলজান জানে না ? জানে। তা না-থেয়ে কদিন থাকবি থাক্। কদিন ওই হিন্দু ফকিরের খ্বস্থরত ম্থখানা ভেবে না-থেয়ে থাকা যার দেখবে সে। আর ওই হিন্দু ফকিরকেও দেখবে সে। নবাবকে বলবে, ওকে কলমা পড়িয়ে ফুলজানের হাতে দাও, সে ওকে শায়েন্ডা করে দেবে।

খাওয়। শেষ করে পান তামাক খেয়ে শুয়েই সঙ্গে সঙ্গে নাক ভাকিরে ঘুমতে শুরু করেছিল সে। মাঝিমালারাও ঘুমিয়েছিল, ইলামবাজারের বাজার ঘুমিয়েছিল, ঘুমোয় নি বাতাস, ঘুমোয় নি অজরের ধারের শালবনের পত্রপল্লব, ঘুমোয় নি অজরের জল। বাতাসে শালবনের শাথাপল্লবের সন-সন সোঁ-সোঁ শব্দ কথনও কম হচ্ছিল, কথনও বাড়ছিল—অজয়ের কল-কল শব্দ বেড়েই চলেছিল। জেগে ছিল শুধু ছইয়ের দরজায় দে-সরকারের পাইকটা, সে মধ্যে মধ্যে গাঁজা থাচ্ছিল এবং অল্লীল গান গেয়ে চলেছিল। আর জেগে ছিল মোইনী। শুরু হয়েই পড়ে মনে মনে ভাবছিল, হায় গোসাঁই! গোবিন্দের দরবারে কেনে তুমি জানালে না নবীন গোসাঁই?

হঠাৎ একটা বিপুল কোলাহল উঠেছিল কোথায়। আতঙ্ক-করা কোলাহল। কয়েক মূহুর্ত পরেই গোটা নৌকাটা তুলে টলে উঠেছিল। সঙ্গে কে চিৎকার করে ডেকেছিল, ওরে—ওরে শন্তা রে! জ্বগা রে!

- -की ? कि ?
- সর্বনাশ হয়েছে। সরকার-বাড়ির গদিতে ডাকাত পড়েছে। ওরে,
 আমি ফড়কে বেরিয়েছি। তোদের ধবর দিতে এসেছি। আয়, জলদি
 আয়। ডাকাত।
 - —বেরত তাকাতের দল। পঞ্চাশ-ষাট জনা লোক। ঢাল তবোয়াল

শড়কি! পগগর বেঁধে চলে এয়েচে। ঢেঁকি দিয়ে ছ্রোর ভাঙছে। চারিদিকে ঠিক ঠিক জায়গায় ঘাঁটি পেতেছে। শিগগির আয়।

- लोका १
- --থাকুক পড়ে।

তারা চলে গেল। মালারা এবং ফুলজান উঠে বসল। ফুলজান গাল দিতে বসল, নারেব-নাজিম জলবাহাত্র মালিক-উল-মূল্ক নবাব বাহাত্রকে বলে, এই ডাকাতের দলকে সে এমন সাজা দেওয়াবে যে, লোকের ডরকে মারে রাত্রে ঘুম হবে না। ছ পা ধরে কুড়াল দিয়ে ছ দিকে ফেড়ে গাছে টাঙিয়ে দেবে। হাত পা টুকরো টুকরো করে কেটে জানোয়ারকে খাওয়াবে, কোমর পর্যন্ত ডালকুত্রা লেলিয়ে দেবে।

আরও গালাগাল দিত, কিন্তু বাধা পড়ল। আবার একজন ছুটে এল— ওই পাইকদেরই একজন। লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে মোহর জহরতের সেই হাতীর দাঁতের বাক্সটা নিয়ে ঝপ করে অজয়ের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বললে, পালা, পালা সব। ডাকাতেরা মোহিনীকে লুটে নিয়ে যেতে এসেছে। বড় সরকারকে খুঁটিতে বেঁধে মশালের ছেঁকা দিয়ে ভুধুছে— মোহিনী কাঁহা বাতাও? কয়ো বোরেগী মোহিনী মোহিনী বলে চেল্লাছে— সাড়া দে মোহিনী, তোকে নিতে এসেছি। মোহিনী! পালা। এখুনি কে বলে ফেলাবে মোহিনী লায়ের ভেতর আছে আর তারা ছুটে আসবে হে-রে-রে করে। পালা। পাঁচ-সাতজনাকে তু ফাঁক কয়ে দিয়েছে। এরা সেই ওপারের সয়েসীর দল; বর্গীদিকে তাড়িয়েছে; এদের হাতে রক্ষে নাই—

বলতে বলতে সে সাঁতরে ওপারে উঠে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।
তারপর শব্দ উঠেছিল কয়েকটা। ঝপ্ঝপ্ঝপ্ঝপ্। ফুলজান
বৃ্বু করে কেঁদে উঠেছিল। এবং কয়েকটা বৃ-বু শব্দের পর অকস্মাং শুদ্ধ
হয়ে নৌকার উপরেই আছড়ে পড়ে গিয়েছিল।

ওগো গোসাঁই! ওগো দেবতা!—ওগো দয়াল! বলে এবার ছই থেকে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে মোহিনী বেরিয়ে বাইয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। তথন অস্ত্রেয়ের জ্বল গর্ভের সমস্ত বালি ঢেকে কুলে কুলে ভরে উঠেছে। কলকল শব্দ উতরোল উল্লাসে উচ্ছুদিত হয়ে উঠেছে। মোহিনী অজয়ের ক্লের মেয়ে, সাঁতার তার না-জানা নয়, তার বৃকও উল্লাস উচ্ছাসে কানায় কানায় ভরা এই মৃহুর্তে। অজয় ছুটেছে গঙ্গার দিকে, তার মন ছুটেছে নবীন গোসাঁইয়ের চরণতলের দিকে, গিয়ে আছাড় থেয়ে পড়বে। তব্ও সে মৃহুর্তের জন্ম থমকে দাঁড়িয়েছিল। পর-মৃহুর্তেই মনে পড়েছিল, মালাদের রায়াবায়ার জন্ম সঙ্গে নেওয়া হাড়ি-কলসীর কথা। খুঁজতে বেশী হয় নি, অয়েই পেয়েছিল; একটা বড় কলসী নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নৌকো থেকে। খানিকটা স্রোতে টানলেও সাঁতার কেটে কুলে উঠে অজয়ের বল্পারোধী বাঁধ ধরে সে ছুটে আসছিল।—গোসাঁই ! দেবতা! দয়াল! চয়নে আশ্রেম দাও। বাঁচাও। ঠাকুর!

হঠাৎ পথের উপর সামনে দাঁড়াল গোপালানন।

— (कोन? (कशा हड़ा? की इटेरब्राम?

একটা আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল মোহিনী। গোপালানন্দ বলেছিল, ভর নেহি—ভর নেহি।

মোহিনী क्যानक्यान করে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গোপালানন্দও তার দিকে তাকিরেছিল। অকন্মাথ একসময় তার দৃষ্টি হয়েছিল নিম্পালক। তারপর সে দৃষ্টির রূপান্তর ঘটতে লাগল। চকমকি-থেকে-ঝরে-পড়া একবিন্দু আগুন যেমন শোলার মধ্যে পড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ঝকমক করে বাড়ে—মুহূর্তে মূহূর্তে দীপ্ত হয় আবার মান হয় ঠিক তেমনি ভাবে গোপালানন্দের দৃষ্টির মধ্যে আগুনের মত একটা কিছু ঘৃটি চোথকে জলস্ত অঙ্গারখণ্ডে পরিণত করে তুলেছিল। মোহিনী কেন ভয় পাচ্ছিল তার হেতু ম্পান্ত সে জানে না, কিছু ভয়ে সে অভিভৃত হয়ে পড়েছিল। এমন সময় তৃই সবল বাছ প্রসারিত করে গোপালানন্দ তাকে জড়িরে ধরতে উত্যত হয়ে বলেছিল, পিয়ারী। আ মেরে পিয়ারী।

চিৎকার করে উঠে মোহিনী পড়ে গিরে বাঁধের ঢালু গারে থানিকটা গড়িয়ে গিরেছিল, তাকে পাবার জন্ম উন্নত্ত অধীর পদক্ষেপে ছুটে নামতে গিরে গোণালানন্দও পা পিছলে পড়ে গড়িরে গিয়েছিল আরও অনেকটা এবং একটা কাঁটার ঝোপে জড়িরেও গিয়েছিল, কিছু তাতে তার ক্রক্ষেপ ছিল না। সবলে টেনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেকে মৃক্ত করে উপরে উঠতে গিরে আরও ত্বার পা পিছলে পড়েছিল। এই সমর্টুকুর মধ্যে মোহিনী উঠে আর্তস্বরে চিৎকার করে ছুটেছিল বাঁধের উপরের প্রশন্ত পথ ধরে। পিছনে গোপালানন্দ, তুই বাহু তার প্রসারিত, চোধ প্রদীপ্ত, কুরিত নাসারক্।

অকস্মাৎ দেবতার আবির্ভাবের মত সামনে দাঁড়ালেন মাধবানন্দ।

মোহিনী বললে, ঠাকুর, দয়াল, ছামনে দেখলাম তুমি। আঃ ঠাকুর, আমার সব ভর সব ভাবনা সব তৃঃখু চলে গেল, আমি তোমার পা তৃটির ওপর গড়িয়ে পড়তে গেলাম, কিন্তু কী হল মনে নাই। সব যেন আঁধার হয়ে গেল। অথৈ অন্ধকার হয়ে গেল স-ব।

. . .

মাধবানন স্থির হয়ে সব শুনলেন। শুনেও স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই একই ভাবে। ভাবছিলেন ঘটনা একটা ঘটলে তারপর সে চলে আপনার নিজের গতিতে আপন পথে, তখন আর তাকে বল্লাবদ্ধ রথাখের মত চালানো যার না। সে চলে অজরের জলপ্রোতের মত। তাঁর ইচ্ছামত ঘটনাম্রোত চলে নি গোপালানন্দ মরল। তাঁকেই মারতে হল; আশ্রমের সেবকেরা দম্যুর মত আচরণ করলে; মুথে কালি মেখে, ফেটা বেঁধে, পাগজ়ি বেঁধে, ছন্মবেশে আক্রমণ, ডাকাতি ছাড়া কী ? প্রকাশ্ত পরিচয় দিয়ে আক্রমণ করলে না কেন কেশবানন ? অবশ্য বৃদ্ধির দিক দিয়ে ঠিকই করেছে সে, কিছ এ আক্রমণ যে তাঁর নির্দেশে সে কথা তো গোপন নেই। ভবিয়াৎ ভাবনাও বধার মেঘের বিত্যাৎবেখার মত মৃহুর্তে মৃহুর্তে চকিতদীপ্তিতে উকি মাবছিল। কাল-কাল কেন, আজ রাত্রেই এই কথা ছড়িয়ে যাবে চারিদিকে-গ্রামে গ্রামে। গ্রামের জন্ম তিনি চিস্তিত নন। মাসুষ হ ভাগ হয়ে যাবে। এক দল মামুষকে তিনি অবশ্রুই পাবেন। দে-সরকার এবং তার ওই ছেলেটার প্রতি কেউ সম্ভষ্ট নর; প্রায় নিত্য-অত্যাচারে পীড়িত তারা; রাজ-দরবারে অভিযোগ করে ফল পায় না, নীরবে ঈশ্বরকে ভাকে। তিনি জনবের সেবকের কর্ম করেছেন। সামান্ত কিছু লোক, ওই দে-সরকারের সমধর্মী সহকর্মীর। বিরুদ্ধে যাবে। রাজ-সরকারে অভিযোগ যাবে। তাঁকে দাঁড়াতে হবে দৃঢ় হয়ে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চকিতে

মনে হন, আর একদন মান্তব তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। এ অঞ্চলের দৈহিক শক্তিশালী দুর্দাস্ত লোকেরা, ডাকাতেরা, লাঠিরালেরা। চমকে উঠলেন তিনি।

সেই মৃহুর্ভটিতেই তাঁর পায়ের উপর অতি কোমল উত্তাপমধুর একটি লপর্ল অফ্লুর করলেন; স্নায়্লিরার একটা কিসের তরক ছুটে গেল। হংপিণ্ড ধক করে উঠল; মন শিউরে উঠল। কে? কী? এ কী? কেন? বুঝেছেন তিনি কী হয়েছে, তবু প্রশ্ন করলেন। মোহিনী তাঁর পা তৃটির উপর মৃথ রেথে উপুড় হয়ে পড়েছে। নিস্তর্ক নির্জন নির্মীথ, আকাশে বাতাসে বর্ধা-প্রকৃতির আকুলতা, আকাশে মেঘ ডাকছে—গুরু গুরু গুরু, চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে ছারা ঘনিয়ে এসেছে, বনের পল্লবে পত্তে মাতামাতি, মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নেই, সব আড়াল পড়েছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সরলা কিশোরীটি বিগলিত হয়ে উদ্ধারকর্তার পায়ের উপর নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। ক্রফালাসী বই মার মেয়ে, সে তার ভাষায় তার ভাবনার কথা অকপটে নিবেদন করে চলেছে: ওগো গোসাই, তুমিই আমার শ্রাম, তুমিই আমার ঠাকুর, আমি তোমার দাসী। ওগো, এত দয়া তোমার দাসীর ওপর! আমা এত ভাগি।

দর্পম্পৃষ্টের মত পা ঘূটি টেনে নিলেন মাধবানন্দ। কংসারি! কেশব। গোবিন্দ! গোবিন্দ! ওঠ। তুমি ওঠ। উঠে বস। বস।

উঠে বসল মোহিনী। মাধবানন প্রশ্ন করলেন, দয়া ভগবানের, মাস্থবের নয়। এখন আমার কথার জবাব দাও। কে আছে তোমার আপনার জন ?

- —আপনার জন? কেউ নাই ঠাকুর তুমি ছাড়া। তুমিই তো বাঁচালে।
- আমি বাঁচিয়েছি তুমি অসহায় বলে। অধর্মের অত্যাচারকে রোধ করবার জ্বত্যে বাঁচিয়েছি। এখন বল, কোথায় যাবে তুমি ?
 - —কোথার যাব । আমি এখানেই থাকব ঠাকুর।
 - -ना। ऋष् ভाবে মাধবানन বললেন, ना।
- —তবে তুমি বলে দাও, আমি কোথার যাব! সক্রণ মিনতি-ভরা কঠের হার, সজল বাতাসের সঙ্গে বিগলিত হয়ে তথু মিশেই গেল না, তুটি চোথের কোণ থেকে ধারা বেয়ে মাটির উপরেও ঝারে পড়ল।

মাধবানন্দ এবার করেক মুহূর্ত ন্তর থেকে বললেন, ভাল, আশ্রমের কাছেই কোন গ্রামে তৃমি থাকবে। কয়ো ভোমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসে। ভোমাকে পাপস্পর্শ করতে সে দেবে না। করোর সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।

আর্তিমরে মোহিনী চিৎকার করে উঠল, না, না, না। তোমার চরণ ছাড়া আমি কিছু ভন্নতে পারব না। ডুকরে কেঁদে উঠল দে।

আবার চমকে উঠলেন মাধবাননা। সংঘটিত কর্মের স্রোভ এসে তাঁকে প্রবল আক্রমণে ভাসিয়ে নিতে চাচ্ছে। সরলা অসহায়া বলে যাকে উদ্ধার করেছেন, তার উদ্ভব যে পাপ থেকে; তার রক্তে পাপ, তার মর্মে পাপ, তার রূপে মোহ, তার ধ্যান ধারণা ভাবনা কামনা—সব পাপ—সব পাপ। প্রেম বড় সহজে বিকৃত হয়, কাম পঙ্কে পরিণত হয়, সারা বৈষ্ণুবধর্মের বিকৃত পঙ্কের বিষ আকণ্ঠ পান করে ও বিষাক্ত। আজ্ঞ সেই বিষপুষ্ট জীবনকামনা যেন জলস্তিক লক্ষ লক্ষ বীজের মত একসঙ্গে ফেটে অঙ্কুর মেলে জেগে উঠেছে। ওর ওই জলস্কিক দেহের রোমকৃপে-কৃপে যেন সর্বনাশের বীজ্ঞোদগন হচ্ছে। তবু শেষ চেষ্টা করবেন তিনি।

— তুমি বৈষ্ণবী। গোবিন্দের চরণ ছাড়া তোমার ভজনা নেই। তিনি ছাড়া তোমার ধ্যান নেই। শ্রাম ছাড়া স্বামী নেই। মান্তব তোমার কেউ নয়। তোমার মায়ের পরিণাম তুমি দেখেছ। করো তোমার স্বামী হিসেবে উপলক্ষ। ভজনা তোমার গোবিন্দের—শুধু গোবিন্দের। স্বামী ঘাকে ভজতে যাবে, মহাপাপ হবে।

—মহাপাপ হবে? অবাক বিশ্বয়ে প্রশ্ন করলে মোহিনী। মুহুর্ভ পরেই কিছ সে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে, নিপ্পলক দৃষ্টিতে মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, না, না। তুমি ছাড়া কাউকে ভজতে আমি পারব না। ওগো গোসাঁই, তুমি—তুমি আমার শ্রাম, তুমি আমার গৌর, তুমি আমার ঠাকুর, তুমি আমার গোসাঁই। এবার তার কঠম্বরের আবেগ গাঢ়তর হয়ে উঠল, সর্বাক্ত কেপে উঠল, সে আবেগে বললে, ওগো গোসাঁই, তোমার তো অকানা থাকার কথা নয়, প্রথম দিনের দেখার কথা। তুমি প্রথম এলে নৌকার উপর ধ্বজা-পতাকা উড়িয়ে, কাসর-ঘন্টা বাজিয়ে, আমি

অথবে চান করে আঁচল ভরে পলাশফুল কুড়িরেছিলাম, তোমাকে দেখেই বে তোমার চরণে বিকিয়ে গেলাম। আমার অল অবশ হয়ে গেল, দিনের আকাশে চাঁদ উঠল, আমার আঁচলের হাত এলিয়ে পলাশফুলের রাশ ঝর্ঝর করে মাটিতে পড়ে গেল; সে তোমারই চরণের উদ্দেশে, গোসাঁই, সেই পলাশের সঙ্গে মন হারালাম, পরান বললে—তুমি আমার সব পরানের পরান! সেই দিন থেকে যে আমার সাধ—আমি তোমার সেবা করব, তোমার সেবাদাসী হব।

মেরেটা যেন ভেঙে পড়ে গেল আবেগে, সে নতজাম হয়ে বসে হাত-জ্বোড় করে হাঁপাতে লাগল: দয়া কর। পারে রাখ। ওগো গো-সাঁ-ই!

—না। মাধবানন্দপ্ত কঠোর সংখমে বাঁধছিলেন নিজেকে; মোহিনীর আবেগ গাঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সে বন্ধনকে দৃঢ়তর করছিলেন। এবার নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন তিনি, রুঢ় গন্তীর স্থরে বললেন, না। সে না' এক গর্জনের মত।

মোহিনী কিন্তু তবু থামল না। সে যেন আজ্ঞ আর-এক মোহিনী।
পাথরের বাঁধ ভেঙে প্রথম-ঝরা ঝরনার মত। ঝরঝর কলকল শব্দে মৃথর।
সভ-যৌবনা বৈঞ্চবের মেয়ে, ক্লফদাসীর মেরে মোহিনী। পরকীরা-সাধনার
ব্যগ্র কামনা তার রক্তে, তার সাধনের তব্রে, তার আশেশব-শেখা ও
নিত্য-আর্ত্তি-করা ময়ে; তার বাহির-মনে, তার ভিতর-মনে, তার স্বপ্নে,
তার শোনায়, তার জানায়, তার দেহমনের একাগ্র কামনায়। তার
উপর এই নিদাকণ বিপদ এবং আতত্ককর অবস্থার মধ্য দিরে পার হয়ে
এসে তার ভয় ভেঙেছে; আজ অপরায়ু থেকে রাত্রির ত্প্রহর পর্যন্ত সে
ভধু ভনেছে তার এই দেহখানা নিয়ে নানান জনের নানান কুংসিত কথা।
তারই মধ্যে ভনেছে নবীন গোসাইয়ের তার প্রতি কক্লার কথা। রাত্রি
বিপ্রহরে, নবীন গোসাইয়ের স্লেহে মৃক্তি পেয়ে আবেগে তার জীবনের ফুল
ফুটেছে, সে অজ্বরে ঝাঁপ থেয়েছে, সে অল্ককার বনপথে ছুটে এসে এই
নবীন গোসাইকে ডেকেছে; গোপালানন্দ মাঝখানে পথ আগলেছে দৈত্যের
মত; দেবতার মত গোসাই তাকে বাঁচিয়ে, তাকে কাঁথের উপর তুলে
নিয়ে এসেছেন; চৈততাহারা অবস্থার মধ্যেও সে তাঁর দেহম্পর্শ অম্বত্ব

করেছে। আজ তার রজের কণায় কণার নারীজীবনের পরম উত্তেজনা ফেটে পড়ছে, আজ তার লজ্জা নাই, বাধাবদ্ধ নাই, দেহমনের একাগ্র কামনা মৃক্তকণ্ঠে বেরিয়ে এসেছে, এবার সে মৃক্তকণ্ঠ উচ্চ হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে উঠল, তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না, ওগো গোসাঁই, আমি বাঁচব না।

সে চিৎকার প্রাণ-ফাটানে। চিৎকার। মাধবানন্দ চমকে উঠলেন, দৃঢ়তা সত্তেও তিনি এমনটির জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না। বনভূমির পল্লবান্দোলন-শব্দম্পরতাকে ছাপিয়ে সে চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। সামনের গাছটার কোটরে বসে অকমাৎ চকিত হয়ে একটা প্যাচা ডেকে উঠল; একটা বাহুড় গাছ থেকে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী আবার পারের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে গড়িয়ে গড়ল।

দর্পস্থির মতই চকিত আকর্ষণে পা টেনে নিলেন ও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত তাকে ঠেলে দিলেন মাধবানন এবং নিষ্ঠ্রতম ক্রোধে বললেন, পাপিষ্ঠা!

একটি অফুট আর্তনাদ করে উঠল মোহিনী।

নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মাধবানন্দ যেন নিজের কথা সংশোধন করে বললেন, না, সাক্ষাৎ পাপ।

মোহিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠে বদল; সামনের অগ্নিক্গুটার শিখা তখনও জনছিল, দেই শিখার আভা তার মৃথের উপর পড়ল; তার উপরের ঠোটখানা কেটে গিরে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাধবানজ্পের পদাস্ত্রের নথের তীক্ত্র কাছাতে কেটে গেছে। হাত বুলিয়ে মুছে নিয়ে মোহিনী আগুনের শিখার সামনে ধরে রক্ত দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। নবীন গোসাঁই, তার শ্রাম, তার গৌর, তাকে—

মাধবানন্দ দীর্ঘপদক্ষেপে এ দাওয়া থেকে নেমে অকন অতিক্রম করে বিগ্রহের ঘরের দিকে চলে গেলেন। দাওয়ার উপর উঠে বললেন, কাল ভোরে তুমি চলে যেয়ে। আর যেন তোমার মুথ আমাকে দেখতে না হয়।

বিগ্রহ-গৃহের হুয়ারে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

বেহটা যেন অশুচি হরে গেছে। নিজের কাছে অস্বীকার করতে তো পারছেন না তিনি, তাঁর দেহকোষে-কোষে যেন লোভী শিশুর ক্রন্ধনের মত ক্রন্সন উঠেছে। তারস্বরে চিৎকার করছে ওই কিশোরী কুমারীর স্বকোমল উষ্ণ ম্পর্শ। হরতো বা মনের মধ্যে ওই মেয়েটিকে অসহায়া অভাগিনী বলে করুণা অভভব করছেন; তার মধ্যেও কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কামনার বীজা। অশুচি হয়ে গেছেন তিনি। স্পান প্রয়োজন, শুদ্ধি প্রয়োজন। অলনে নেমে তিনি দক্ষিণ দিকে গিয়ে নামলেন আশ্রম-সংলগ্ন প্রাচীন কালের প্রস্করিণীটিতে। ইছাই ঘোষের খনিত সরোবর। স্পান করে শীতল হল দেহ মন্তিক। ফিরে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করে মন্দিরে চুকে বিগ্রহের সম্মুথে বসলেন। না, কংসারির শ্রীমুথ ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না। দীপশিখা ন্তিমিত হয়ে এসেছে। তাই আসে। শিখা মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল করে দিতে হয়়। দিলেন তাই। হাা, এবার দেখতে পাচ্ছেন। কংসারির মুখমগুলে নিরাসক্ত স্বথচ আনন্দমন্ধ দৃঢ়তা; চোথে প্রথর প্রসয় দীপ্তি। উত্যত ডান হাতের মৃষ্টিতে ধরাচক্র, বাঁ হাতে শন্ধ। যেন বলছেন—

> যা নিশা সর্বভূতানাং তত্তাং জাগতি সংয্মী। যত্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্রতো মুনে:॥

কামনার বাত্তির অন্ধকার দূর হোক শ্রীম্থের দীপ্তিতে। হে কংসারি, তুমি বল, তুমি বল, জন্ম থেকে শৈশব থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তুমি যোগী। চৈতক্সময় প্রতিক্ষণের ভগ্নাংশেও জাগ্রত। তোমার জীবনে রাধা ছিল না, রাধা নাই, রাধা নাই। রাধা তোমাকে মোহগ্রন্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে চিরকাল কেঁদেছে—কেঁদেছে।

শ্রীমুথের মহিনায় গৃহাভাস্তর সতাই বুঝি দিবালোকের চেরেও প্রদীপ্ত ছটায় ভরে উঠল। জার কংসারি! জার কংসারি!

আঃ, কিসের এমন বিকট গর্জন ? ও, মেঘ ডাকছে।

বাইরে বজ্রপাতের মত বিতাৎ চমকে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘপর্জন। তার সঙ্গে বাতাস। দ্রাস্তর থেকে বনের মাধার মাধার ধারাবর্ধণের শব্দ সঙ্গীত তুলে বর্ধণ এগিয়ে জাসছে। সন-সন ঝর-ঝর। ঝর-ঝর, ঝর-ঝর, ৰায়-ৰায়-বার । অবল্প্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বসংসার। যাক। মাধবানন্দও ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন।

আঃ! কে? কে ভাকে? ও, কেশবানন্দের কঠম্বর। গভীর ধ্যানের মধ্যেও পৃথিবীর সঙ্গে যোগের একটি রন্ধু যেন মুক্ত ছিল; কেশবানন্দের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা। সেই রন্ধুপথে ধ্বনি এসে পৌছেছে। কেশবানন্দ ভাকছে। কেশবানন্দ। উঠে পড়লেন তিনি। দেবতাকে প্রণাম করতে ভূলে গেলেন। আসন ছেড়ে এসে মুরার খুলে বাইরে এলেন।

-কেশবাননা

—ওরে শালা, বদমাস, নচ্ছার, ভণ্ড, লম্পট — বর্বর অক্রুর তাঁকে দেখে এই অবস্থাতেও গাল দিয়ে উঠল। শ্রামানন্দ তাকে মুখে আঘাত করে বললে, চুপ রহো।

কেশবানন্দ বললেন, সেই মেয়েটিকে কোথায় লুকিয়েছে। আমারা পাই নি। তাই ওকে গুরু মহারাজের কাছে বেঁধে এনেছি।

আহত হয়ে অক্র চিৎকার করে উঠল পশুর মত, তারপরই অভ্যাস
মত, থ্-প্ করে থুতু ছুঁড়তে আরম্ভ করলে: তোদের মুখে আমি থুতু দিই—
পুতু দিই। ওরে চোর ডাকাত লম্পট বদমাশের দল, তোদের আমি ছাড়ব
না—শূলে দোব, ফাঁসি দোব। জালিয়ে দোব আশ্রম। তুই—তুই—তুই
শালাকে কেটে কেটে ছন লহা দিয়ে দিয়ে মারব। মাধবানন্দের দিকে উরম্ভ
আক্রোশে থুতু ছুঁড়তে লাগল—থ্-থ্-থ্-থ্-থ্-

মাধবানন্দের রক্তের আগুন তথন নেবে নি। সে আগুন থোঁচা থেছে আলার জলল—দাউ দাউ করে জলল। মূহুর্তে তিনি টেনে নিলেন কেশবানন্দের তরবারিখানা। তারপর বিহ্যতালোক ঝলসে উঠে নিবে যাওয়ার মত চকিতে ঘটে গেল একটা বক্সাঘাতের মত সংঘটন।

বিদ্যুদ্বেগেই তরোরালখানা উপরে উঠে অগ্নিকুণ্ডের ছটায় ঝলসে উঠে নেমে এল বজ্লের বেগে, পর-মূহুর্তে বৃত্তাস্থরের স্থায় কৃষ্ণকার তুর্দাস্ক অক্রুরের মুখটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ছিটকে গড়িনে পড়ল; কবন্ধ দেহখানা একটা নিদারুণ মৃক আক্ষেপে দারাদিনের বর্ষণসিক্ত মাটির বুক্টুকুকে কর্দমাক্ত করে তুলল। তাতে মিশছিল তারই গাঢ় লাল রক্ত। রাত্তির নিপ্রভাগ মনে হচ্ছিল গাঢ় কালো দে রক্ত।

ন্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। কেশবানন্দ পর্যন্ত। মাধবানন্দ এমন পারেন, এ ধারণা যে তাদের স্বপ্রাতীত।

মাধবানন্দ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিরে ছিলেন বর্বরটার মৃত্যু আক্ষেপের দিকে। আক্ষেপ স্থির হয়ে গেল, তিনি হাতের রক্তাক্ত তরবারিখানা ফেলে দিলেন। বললেন, কামার্ত পশুর রক্তের জক্তে পৃথিবী আজ তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন। বাক্যশেষে এদিক-ওদিক চাইলেন। উষ্ণ গাঢ় রক্ত হাতে লেগেছে, অশুনি মনে হছে। জল! ওঃ, এই যে দাওয়ার উপর করেকটাই ঘড়া নামানো। একটা ঘড়ার কানা ধরে তিনি কাত করলেন। এ কী? এত ভারী! কী? জল তো নয়, কঠিন বস্তু কী, এ প্রশ্নের উত্তর এসে পড়ল তাঁর হাতে। অন্ধকারের মধ্যেও স্থান্বর্গের স্বরূপ ঢাকা পড়ল না, আকার অগোচর রইল না। হাতে এলে পড়েছে একম্ঠো মোহর। চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। ঘড়াটা ছেড়ে দিলেন, হাতের মোহরগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটতে। বিশ্বয়-বিশ্বারিত দৃষ্টিতে তিনি কেশবানন্দের দিকে তাকালেন।

কেশবানন্দ সে সবিষয় নীরব প্রশ্নের উত্তর দিলেন তৎক্ষণাৎ।

—পাষও পরাস্বাপহারী দে-সরকারের গুপ্ত সঞ্চয়। কংসারির সেবার লাগবে। অধর্মের ধন ধর্ম-সংস্থাপনে ব্যয়িত হবে।

মাধবানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। একটা বিপুল ঘুর্ণাবর্তের মধ্যে ভূবে যেতে যেতে তাঁর চিস্তাশক্তিও যেন লোপ পেরে যাচছে। স্পষ্ট প্রশ্ন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উত্তর দূরের কথা।

এরই মধ্যে কেশবানন্দের কণ্ঠশ্বর শুনলেন তিনি।

- শ্রামানন্দ, তৃতীয় প্রহরের শিবাধ্বনি শুনেছ ?
- —কই, না তো!
- —কে**উ ত**নেছ ?

মৃত্র সম্মিলিত কণ্ঠের উত্তর হল, না।

কেশবানন্দ বললেন, তা হলে এক প্রহরেরও অধিক রাত্রি আছে এখনও। শোন শ্রামানন্দ, এখনই আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। মৃহুর্ত বিলম্বের অবসর নাই। গুরু মহারাজ!

- -কেশবানন্দ !
- অক্রকে বেঁধে এনেছিলাম মোহিনীর সন্ধানের জন্মও বটে এবং দে-সরকারের প্রতিহিংসা শক্ততা থেকে আত্মরকার জন্মও বটে। বলে এসেছিলাম, ফৌজদার কি নবাবের দরবারে অভিযোগ করলে অক্রকে আমরা হত্যা করব। কিন্তু সে আর হবে না। এখন এ স্থান ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের আশ্রম স্থরকিত নয়, শক্তি সঞ্চর করি নি। সকাল হতে হতে আমাদের চলে যেতে হবে।
 - —চলে যেতে হবে ? উপায় নেই ?

আকাশের দিকে তাকালেন মাধবাননা। ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ অন্ধকার; বনের মাধার সঙ্গে মিশে যেন একাকার হরে গেছে। চারিপাশ অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই চলতে হবে, উপান্ন নাই।—তাই হোক। চল।

কেশবানন্দ সক্রিয় হয়ে উঠলেন, অস্ত্র সংরক্ষণের গুপ্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হলেন, ডাকলেন, শ্রামানন্দ, যাদবানন্দ, অস্ত্রগুলি বের করে শবের মত করে বাঁশে বাঁধ, তার পাশে বিছিয়ে দাও মোহর এবং শিরম্বাণগুলি। এক-একটি শববাহকের দলে ভাগ হয়ে যাত্রা করব। এক-এক দলে আটজন। কিছু যাবে গরুর গাড়ির সঙ্গে। গাড়িতে যাবে অস্ত অত্যন্ত প্রশ্নোজনীয় দ্রব্য। বাকী সব পড়ে থাক্। গাই বাছুর, তৈজস পত্র, থাত্যভাগ্র সব পড়ে থাক্। গোপালানন্দ, গোকুলানন্দকে ডাক। গোপালানন্দ! গোপালানন্দ!

এতক্ষণে সচেতন হলেন মাধবানন্দ, ওই গোপালানন্দের নামই তাঁর চেতনা ফিরিরে আনলে। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি যেন বেরিরে এল তাঁর বুক থেকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধবানন্দ গভীর শ্বরে বললেন, সেনেই কেশবানন্দ, আমি তাকে হত্যা করেছি।

—হত্যা করেছেন ? আপনি ?

- —ইঁয়া, ওই অক্রের মত। এমনি কামার্ড এবং বীভংস হরে আক্রমণ করেছিল মোহিনীকে। আমার উপস্থিতি আমার নিষেধও তার জ্ঞান ফিরিরে আনতে পারে নি। আমাকেও আক্রমণ করতে এসেছিল, আমি তাকে হত্যা করেছি।
 - -- গুরু মহারাজ!
- —রথ চলতে শুরু করেছে কেশবানন্দ, কংসারির রথ। কী করব? তিনি করিরেছেন, আমি করেছি। আজ আমি তাঁর ম্থকমলে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি।

তাঁর সে কণ্ঠস্বর আশ্চর্য। অলজ্যনীয়। বর্ধার মেঘগর্জনের মত গাঢ় গন্তীর।

সমস্ত সেবক-মণ্ডলী বিশ্বরে হতবাক হয়ে গেল। কংসারির মুখকমলে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে, গুরু মহারাজ দেখেছেন! শুধু চিৎকারে বিদীর্ণ হয়ে গেল একটি কর্কশ কণ্ঠ। কয়োর কর্কশ কাতর কঠম্বর। কয়ো সকলের পিছনে অন্ধকারে হতাশায় নির্বাক হয়ে বসে ছিল এতক্ষণ। মোহিনীর নাম শুনে সে চিৎকার করে উঠেছে।

- —গোসাই! মোহিনী কোথা? মোহিনী?
- **কয়ো** ?
- —তাকেও কেটেছ ?
- —কাটাই উচিত ছিল, কিন্তু নারী-হত্যা করি নি। দেখ ওই অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুয়ে ছিল। মৃতিমতী পাপ।
 - —কই ? কোথায় ? গোসাঁই, কেউ নাই তো!
 - তা হলে জানি না। খুঁজে দেখ।
- —মোহিনী! মোহিনী! কয়ের কর্ষণ কাতর কণ্ঠসরে রাত্রির শেষপ্রহর ক্ষণে ক্ষণে যেন চমকিত হয়ে উঠল। ওদিকে বাত্রা শুরু হয়ে গেল সয়্যাদীদলের।

মাধবানন্দ নিঃশব্দে চলেছেন বরেল গাড়ির উপর। মনে পড়ছে এবং মনে মনে অন্তব করছেন, মহাভারতের কথা। জভুগৃহে গভীর রাজে অগ্নি সংযোগ করে পাগুবেরা যেমন নিঃশব্দে বারণাবভ ত্যাগ করেছিলেন, এ যাত্রাও তেমনি। নিরাপত্তার জন্ম নয়, কুরুক্ষেত্রের জন্ম। আশ্চর্য ভাবে এই নিঃশব্দ গোপন যাত্রা চলেছে কুরুক্ষেত্রের দিকে। নৃতন কুরুক্ষেত্র। আশ্চর্য অনিবার্য গতি! ওঃ! জীবনে সিদ্ধির প্রসাদকে মাধবানন্দ যেন অহুভব করছেন। হোক এটা ঘোর কলি; এগারো শো সাল; সিদ্ধি এখনও আছে, হাা, আছে।

পিছনে এখনও কয়োর তাক শোনা যাচ্ছে, মো-হি-নী!
আঃ! মেস্টোর নাম শুনেও তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠছে।
তিনি গঙ্গর গাড়ির উপর বসেই ধ্যানম্ব হতে চেষ্টা করলেন।

হে চৈতন্তমর সন্তার চিনার আত্মাপুরুষ, তুমি জ্যোতিমান হয়ে অন্তর্গপ্রত হও। মাধবানন্দের বস্তজগৎময় দেহসন্তার সকল স্পাদন বস্তজগতের সকল আকর্ষণের স্পর্শকাতরতা শুরু করে দাও, চৈতন্তমহিমাকে জাগ্রত কর।

বনপথে গাড়ি চলেছে, চাকার শব্দ উঠছে।

অজ্ঞারে ঘাটের নৌকাগুলির দড়ি কেটে দেওরা হয়েছে। যাক ভেসে। লোকে সর্বপ্রথম নৌকার সন্ধানই করবে। তথনও বর্ষণ চলছে। ঝর-ঝর— ঝর-ঝর—ঝর-ঝর।

মাধবানন্দ তারই মধ্যে সিন্ধির আসনে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারছেন রথ চলেছে কুরুকেক্তার দিকে।

॥ शक्षमण शतिरुक्त ॥

ভামাম হিন্দুন্তান ছারখার হয়ে গেল। দিল্লীর বাদশাহী খতম বললেই হয়। সারা ভারত জুড়ে অধর্মের তাগুব চলছে। তুর্ঘোধন তুঃশাষণের জনম এবার এক নয়, তুই নয়, হাজার, তু হাজার। কুরুক্ষেত্রের ইশারা ঝলসাচ্ছে। উচ্ছোগপর্ব শেষ। এ সময়ে আপনি—

গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কেশবানন্দ কথাটা শেষ করলেন না, কিছু অমুযোগ প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠন্বরে।

বোল বৎসর পর গুরুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শ্রামরূপার গড় পরিত্যাগের পর বোল বৎসর চলে গেছে।

মাধবানন্দ অস্থান্থের মত নিরতিশয় ক্লান্তিতে আধশোরা অবস্থায় আকাশের দিকে চেরে ছিলেন। বিষপ্ত হেসে মাধবানন্দ বললেন, কী করব কেশবানন্দ, এর উপর তো আমার হাস্ত নেই। আমি কিছুতেই আঅসম্বরণ করতে পারি না; আমার জ্ঞান বৃদ্ধি বিচার সব আচ্ছন্ন হয়ে যায়; মনে হয় হুংথের আমার আর পারাপার নাই। মনে হয় সব আঁধিয়ার, সব আঁধিয়ার। তুনিয়াতে তৃঃথ ছাড়া কিছু নাই। বিলকুল ঝুট। সব মিথ্যে। ভগবান কংসারির মুথের দিকে চেন্নে মনে হয় প্রভুর মুথমণ্ডলন্ড মান। তাঁর চোথও যেন ছলছল করে। কান্না আপনি আসে কেশবানন্দ, বৃক্ ফেটে বেরিয়ে আসে। কাঁদি, তাই যেন দম ফেলতে পারি, নয়তো দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম।

কমুইয়ে ভর দিরে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন মাধবানন্দ, বোধ করি আবেগে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন; বললেন, কেশবানন্দ, গীতা আওড়াই, মনে করি প্রভূর বাণী—

ক্ষৈব্যং মাম্মগমঃ পার্থ নৈতওয়াপপছতে। ক্ষুদ্রং হাদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোতিন্ত পরস্কপ ॥

তাতেও মন নাড়া খার না, সাড়া দের না। কী করব আমি, কী করব? এ যার না হয়েছে সে বুঝতে পারবে না।

বলতে বলতেই তৃটি বিশীর্ণ জলধারা চোখের কোণ থেকে নেমে এল। আবার তিনি হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিখাস ফেলে কেশবানন্দ বললেন, তা হলে কি কুম্ভ-স্নানে যাত্রার দন স্থগিত রাথব ?

এবার চমকে উঠলেন মাধবাননা। কুন্তুস্নানে যাত্রার দিন হাগিত ? ওঃ, কথাটা তাঁর মনে ছিল না। এবার প্রয়াগে পূর্ণকুন্তুস্নান। অবশ্য বিশ্বস্থ আছে, এখন সবে কার্তিক মাস। কিন্তু সংকল্প ছিল কার্তিক মাসে বের হয়ে ব্রহ্মগুল থেকে দিল্লী পর্যন্ত মূলুকের অবস্থাটা দেখে আসবেন। সন্তবপর হলে জালামুখী পর্যন্ত, মূলুক পাঞ্জাবও স্বচক্ষে দেখা হয়ে যাবে। যাত্রার দিন কার্তিকী শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে। আজ বোধ হয় অষ্টম; কিন্তু আজ তিন দিন তাঁর বিচিত্র পূরাতন ব্যাধি উঠেছে। তিন দিন এই ভাবে হুর হয়ে আছেন; অনাহার চলছে, জল এবং সামাক্ত ত্বধ ছাড়া কিছু খাছেন না। রিক্ত সর্বস্থহারার মত শোকার্ত দৃষ্টিতে আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছেন; কথনও মন্দিরের মধ্যে গিয়ে বিগ্রহের সমূথে আসনে বসে অনর্গল কাঁদছেন। ধারা বেয়ে চোথের জল নামছে। পৃথিবীর সঙ্গে সমন্ত যোগস্ত্র যেন নিঃশেষে কেটে গেছে, স্বতো-কাটা ঘূড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে নিক্ষদেশে ভেসে চলেছেন। কাক্ষর কোন কথা কোনও জিজ্ঞাসাই যেন কানে যায় না; গেলেও অর্থ বোধ হয় না। বিষয় দৃষ্টিতে ঘাড় নাড়েন, যার অর্থ 'না'। হয়তো তার অর্থ 'কী বলছ ব্রুতে পারছি না' অথবা 'এখন নয়' অথবা 'জানি না'।

এ অবশ্য তাঁর নতুন নয়। মধ্যে মধ্যে এমন তাঁর হয়। বোল বংসর
পূর্বে শ্রামরূপার গড় ইছাই ঘোষের দেউল ত্যাগ করেছেন, তার মধ্যে বারো
বংসর ধরে মধ্যে মধ্যে এই অবস্থার ব্যাধিগ্রন্তের মত আক্রাস্ত হরে আসছেন।
ব্যাধির মত লক্ষণও কিছু কিছু আছে। কথনও দেহের উত্তাপ বাড়ে;
কথনও কমে যার; হাত পায়ের আঙুলগুলি ঠাগু হয়। প্রথম, ব্যাধি আশহা

করে কেশবানন্দ করেকজন প্রাসিদ্ধ কবিরাজকে ভেকেছিলেন। তাঁরা কেউই কিছ তাঁর দেহে কোন ব্যাধির সন্ধান পান নি, শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন, আধ্যাত্মিক সাধনার এ কোন বিচিত্র আক্ষেপ।

এক অবধৃত সন্ন্যাসী অবধৌতিক মতে চিকিৎসা করেন, তিনি বলেছেন, কোন একটা নৃতন সিদ্ধি আসতে আসতে আসছে না। এ বিচিত্র অবস্থা কথনও এক পক্ষ, কথনও এক মাস, কথনও তু মাস পর্যন্ত চলে। শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে যান, ঝড়ে ভগ্নশীর্ষ বনস্পতির মতই মনে হয় তাঁকে দেখে।

এবার মাত্র তিন দিন আক্রমণ হয়েছে, স্থতরাং কেশবানন্দ যাত্র। ছিগিতের কথা না বলে পারলেন না। এই অবস্থায় স্থদূর পথে যাত্রা তো উচিত হবে না।

মাধবানন্দ চমকে উঠলেন।

তামাম হিন্দুস্থান ছারখার হয়ে গেল। পাপের তাগুবে পৃথিবীর কেঁপে ওঠার শক্তিও বিল্পু হয়ে গেছে। এত অনাচারেও ভূমিকম্প হয় না। "ধরতি পখল হো গয়ি"—কেশবানন্দ বলেন; মা ধরিত্রী পাষাণ হয়ে গেছেন।

বাংলা দেশের একেবারে উত্তর-পশ্চিম দীমাস্তে রাজমহলের কাছাকাছি ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে পাহাড়ঘেরা একটি নিভৃত অঞ্চলে নতুন আশ্রমের মন্দিরচন্দ্রবে শুয়ে ছিলেন মাধবানন্দ। সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেশবানন্দ।

ষোল বংসর পূর্বে সেই রাত্রে গড়জন্বল ত্যাগ করে এখানে এসে
নৃতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। যোল বংসরে আশ্রম এখন স্থপ্রতিষ্ঠিত
বছবিস্তৃত, সংঘশক্তিও বিপুল এবং স্থদ্ট। গদার পরপারে মালদহ গৌড়
এবং আরও উত্তরে বনবহল অঞ্চলে এক দিকে পূর্ণিয়া, অন্ত দিকে কুচবিহার
পর্যন্ত নানা স্থানে আশ্রমের ছোট বড় মাঝারি শাখা, মঠ ও মন্দির গড়ে
উঠেছে। এ সব মঠের মন্দিরের দেবতা একক কংসারি নন, তাঁর সঙ্গে
কন্ত-ভৈরব-শিবলিদ্ধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আদিষ্ট হয়েই করেছেন মাধবানন্দ।
সেদিন রাত্রে সেই ছর্যোগের মধ্যে বনের ভিতর দিয়ে চলবার সময়
মাধবানন্দ বিচিত্র অভিক্রতা অর্জন করেছিলেন। গোপালানন্দ এবং
অক্রুরকে হত্যা করে গাড়ির উপর গুরু হয়েই বসে ছিলেন। বড় বড়

বরেল ত্টো বিপুল শক্তিতে বর্ষণিসিক্ত লাল মাটির উচ্ নিচ্ পথ ভেঙে চলেছিল বাদশাহী সড়কের দিকে। গস্তব্যস্থল বর্ধমান। তারপর স্থির করবার কথা ছিল কোথায় হবে গস্তব্যস্থল। দামোদর পার হয়ে গড় মান্দার হয়ে পথ পুরী গিরেছে সে পথ ধরবেন অথবা কাটোয়া গিরে ভাগীরথীর ধারা ধরে উত্তর-ভারতের দিকে চলবেন—তা স্থির করবার সময় ছিল না। তাঁর তো ছিলই না। তিনি তথন ভয়-ভাবনার সীমারেগা পার হয়ে অন্ত এক রাজ্যে যেন বিচরণ করছেন। মানসলোকে এক সিংহ্ছার খুলে গেছে যেন।

অনাদি মধ্যাস্তমনস্তবীর্ষমনস্তবাহুং শশিস্থনৈত্রম্। পশামি স্বাং দীপ্তহতাশবক্তাং স্বতেঙ্গদা বিশ্বমিদং তপস্তম ॥

গীতার একাদশ অধ্যায় তাঁর অস্তরলোকে গন্তীর সঙ্গীতধ্বনি আপনা আপনি ধ্বনিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে আজকের রাত্রের এই অন্ধকারের ঠিক ওপারেই কংসারি বিশ্বরূপে প্রকট হয়ে দাঁড়িরে আছেন তাঁরই জন্ম। "দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি, দৃষ্টেব কালানলসন্ধিভানি"—সে প্রলয়হর ভয়হরতম রূপের আভাস মাধবানন্দ আজ মুহুর্তে মুহুর্তে অন্তভব করেছেন, বোধ করি তাঁর বাণীও ভনেছেন—"মরৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।" গোপালানন এবং অক্রকে তিনিই হত করে রেখেছিলেন, নইলে তিনি হত্যা করতে পারতেন না। তিনি তো ওদের থেকে দৈহিক শক্তিতে স্বল ছিলেন না, পাশবিক উগ্রতার প্রচণ্ড ছিলেন না। তাঁর ভর হত, তুর্বলভায় হাত কাঁপত, নরহত্যার পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্ম তিনি ইডন্তত করতেন। তিনি নিশ্চয়ই তথন অন্তরের অন্তন্তনে তাঁর বাণী শুনেছেন। এই তো বেশ অস্কুভব করছেন যে তাঁর রথকে তিনি চালিয়ে নিয়ে চলেছেন কুরুক্তেরে পথে। এরই মধ্যে রাত্রি অবসান হল এক সমন্ত্র, কলরব করে পাখি ডেকে উঠল। আকাশে তথনও মেঘ, তারই মধ্যে আলো ফুটল। কেশবানন্দ গাড়ি থামালেন। এতক্ষণে মাধবানন্দের সন্থিত ফিরল। —গাডি থামালে কেশবানন্দ ?

—এক বেলা বিশ্রাম করব। অপেক্ষারও প্রয়োজন আছে। যদি তারা অফুসরণ করে থাকে, সেটা বুঝতে পারব। পথ ছেড়ে বনের গভীর অভ্যন্তরে গিয়ে ঢুকেছিলেন তাঁরা। ভাগ্যক্রমে পেয়েও ছিলেন একটি অপেক্ষাক্বত পরিচ্ছয় স্থান, বড় বড় পাথর ইতন্তত ছড়িয়ে পড়ে ছিল এবং কিছু কিছু মাটির ভিতর থেকে যেন উকি মারছিল। বোধ করি বছ প্রাচীন কোন-কিছুর ভগ্নাবশেষ; অদূরবর্তী রাঢ়েখর-শিবের মন্দিরের পাথরের মতই এ পাথরগুলি। গতদিনের প্রবল বর্ষণে মাটি ধুয়ে গিয়ে নীচের পাথরগুলি বিশ্রামের জন্ত যেন পরিচ্ছয় হয়েই প্রতীক্ষা করছিল। কাছেই একটি প্রাচীনকালের মজা পুকুর। একটি পাথরের উপার আসন করে তিনি বসে ছিলেন। শিশ্র-সেবকেরা প্রাত্যঃকৃত্য সেরে ইপ্রশ্বরণ করে চিঁড়া ভিজিয়ে আহারের উত্যোগ করছিল। নীরবে কাজ করে চলেছিল, কেশবানন্দের নির্দেশে।

সেইখানে তাঁর আসনের ঠিক পাশেই একটি কষ্টিপাথরের খানিকটা আংশ হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ পাথরগুলি বেলেপাথরের, এটি কষ্টিপাথর। একটা তুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে যেন টেনেছিল। তিনি থাকতে পারেন নি, খুঁড়ে বের করেছিলেন পাথরটিকে। পাথর নয়, শিবলিক। শিবলিকটিকে সামনে রেখে তিনি সবিশ্ময়ে ভাবছিলেন, মাটর তলা থেকে দেবতা উঠবার জক্মই তাঁকে যেন এখানে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন। কতকাল মাটির অভ্যন্তরে প্রহুপ্ত ছিলেন, কত লোক গিয়ছে এসেছে এই অদ্বের পথ দিয়ে, কতজন হয়তো এসে এখানে এমনি করেই বসেছে। কিছ্ক দেবতা দেখা দেন নি, তারা দেখেও দেখে নি। তাঁর জক্মই যেন অপেক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে কথন তজ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরই মধ্যে কিবন তারই হয়ে পড়েছিলেন। তারই মধ্যে কিবন তারই হয়ে পড়েছিলেন। তারই মধ্যে কিবন তারই হয়ে পড়েছিলেন। তারই মধ্যে কিবন তারই নিজের নির্দেশ ভূলে জিরে ধবনি দিয়ে উঠেছিলেন। কেশবানক্ষ সমস্ত শুনে নিজেই নিজের নির্দেশ ভূলে গিয়ে ধবনি দিয়ে উঠেছিলেন, জয় শঙ্কর।

মঠে মঠে কংসারির সেবার সঙ্গে রুদ্রের আরাধনাও প্রচলন করেছেন তথন থেকে। তার ফলে সেবকদের মধ্যে শৈবনাগা-সম্প্রদায়ের জীবনসাধন-পদ্ধতির কিছুটা আচার নিয়ম প্রবর্তিত হরেছে। বিশেষ করে যারা শ্রামানন্দ-গোকুলানন্দদের মত, তারা জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। নাগাদের মতই তারা যোগচর্চার সক্ষে তন বৈঠক দের, কুন্তি করে, গায়ে তত্ম মাথে, ব্রহ্মচর্ষ পালন করে আর প্রাণভরে হরি-হরকে ডাকে। হরি-হর একসক্ষে কংসারি এবং রুদ্রের উপাসনা। কল্পনাটা কেশবানন্দের। তিনিই বলেছিলেন, ভগবান পথ দেখালেন গুরু মহার জ; এ পথে স্বকীয়া-পরকীয়ার জ্ঞাটিলতা নাই। তার উপর স্বরং রুদ্র আদেশ করে আবিভূতি হয়েছেন। এ পথ গ্রহণ করতে হিধা করবেন না।

কেশবানন্দই এই স্থানে বাংলার ও বিহারের সীমাস্ত প্রদেশে চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা এই স্থানটির কথা মনে করে এইখানে এসে আশ্রম স্থাপন করেছেন। মাধবানন্দের তথনও আছের ভাব। বর্ধমানে এসে কেশবানন্দ বলেছিলেন, পুরীর পথ যে অঞ্চল দিয়ে গিয়েছে সে অঞ্চল ছর্গম বটে, কিন্ধ এ অঞ্চল মুরশিদাবাদ এবং দিল্লী থেকে অনেক দ্র। তা ছাড়া এই পথ মহাপ্রভুর পারের ধুলোমাখা পথ। এ দিকে 'রাধা'-নির্বাসনতত্ব নেবে তোনা-ই, উপরস্ক কঠিন শক্রতা করবে। এখানকার মান্তবেরা বড় উগ্র, এরা জন্দল-মহলের দেহাতি।

ওদিকে তথন দামোদরের প্রবল বহা। সংবাদ পেয়েছেন অজমও তেনেছে। এই বহার জহাই বোধ হর ইলামবাজ্ঞারের দে-সরকারের ক্ষোভ, হাতেমপুরের কৌজদার রাজনগরের রাজার কোতোরালী পেয়াদা কি তাদের অস্তসরণ করতে পারে নি। জয় দামোদর, জয় অজয়! কিছাদামোদর-অজয়ের প্রকৃতি মহাদেবের মত; রোষে যথন আত্মপ্রকাশ করেন তথন প্রলয়য়র। কিছাদেবের মত; রোষে যথন আত্মপ্রকাশ করেন তথন প্রলয়য়র। কিছাদেবের মত; রোষে যথন আত্মপ্রকাশ করেন তথন প্রলয়য়র। কিছাদেবের মান। বহা থাকে না। বহা থাকতে থাকতে বেরিয়ে যেতে হবে। দামোদর পার হয়ে পুরীর পথ। দামোদর বহার সংকেতে নিষেধ করছেন। বলছেন, এ পথে নয়। দক্ষিণে নয়, উত্তরে চল, উত্তরে চল। বর্ধমান থেকে কাটোরা পর্যন্ত সড়ক ধরে যাত্রা তর্ক হয়েছিল। কাটোরার পথেই এই স্থানে আত্রম স্থাপনের কয়নার জয়। মাধবানন্দের পিতৃবংশের কয়েকথানি তালুক আছে এখানে। এবং কংসারির সেবার জহা নানান স্থানে যে নিজয় জমি আছে তার একটা আংশ এই তালুকের মধ্যে। ভাগীরথী ধরে নৌকাষোগে গড়জকল আসবার সময় তাঁরা এখানে

নৌকা বেঁধে একদিন বিশ্রাম করেছিলেন, এবং সেই অবসরে এখানকার প্রজাদের সঙ্গে দেথা-সাক্ষাৎ করে তাদের আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। স্থানটি বড় হৃন্দর। গদার ধারা এখানে প্রান্থ পাহাড় কেটে গতিপথ করে নিয়েছে। উত্তরে রাজ্মহল, দক্ষিণে গঙ্গার ওপারে মুরশিদাবাদ, অবারিত পূর্বে ক্রোশ-খানেক দুরেই গঙ্গা, পশ্চিমে ক্রমশ উত্তর দিকে বিস্তৃত পাহাড়ের পর পাহাড়। এরই মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাংলা দেশের এক স্প্রাচীন সংযোগ-পথ। উত্তরে এই পথের উপরেই গিরিসংকটের মধ্যে উধুরানালার তুর্গ। গলার ওপারে জিলা মালদহ এবং রাজশাহী। কয়েক **ट्यांग प्रक्रि**श्चर घितिया श्रास्त्रत। এই পথে অনেক অভিযান এসেছে, शिरह्राह ; এ পথে অনেক তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীর দল যায় আসে। এখানে আসবার এক বংসরের মধ্যে বাংলার মসনদের অধিকারী বদল হরে গেল এই ঘিরিয়ার প্রান্তরে। আলিবর্দী থাঁ নবাব সরফরাজ থাঁকে হত্যা করে, মুরশিদাবাদে নবাব হয়ে বদল। আলিবদী থা তার পন্টন নিয়ে তাঁর চোঝের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। তিনি ওই পাহাড়টার মাথার উপর भाषित्य (मर्थरहन । क्नियानमरक यलहिन, এक शक्त शत्रदरे क्नियानम, এবং হারবে সরফরাজ। যার হারেমে হাজারের উপর উপপত্নী, সে কখনও ব্রিতবে না। সে মরেই আছে। তুমি সেবকদের প্রস্তুত রাখ, যে পক 🌉 হারবে তাদের অস্ত্র আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

লোকে বলে, আলিবর্দী বিশ্বাসঘাতকতা করে ইটের উপর ক্রমাল জড়িরে কোরান বলে পাঠিয়ে, আরুগতোর শপথ জানিয়ে সমর সংগ্রহ করে সরফরাজকে পরাজিত করেছে। সরফরাজ থা বীরের মত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছে। বলুক। সরফরাজের পরাজয় এবং মৃত্যু অবধারিতই ছিল। তিনি যুজের বিবরণ শুনে এতটুকু বিচলিত হন নি। পরাজিত নবাবপক্ষের সৈশুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে-আনা, মৃত সৈনিকদের পড়ে-থাকা অস্ত্র সংগ্রহের জগুই উৎস্থক হয়েছিলেন। শ্রামরূপা গড়ের গুই শেষ রাজি থেকে তথন তিনি অস্ত্র মারুষ। যেন জলস্ত জীবন। কুরুক্ষেত্রের লয়ের জন্ম অধীর, কুরু-ক্ষেত্রের পথের যাজী। এ আশ্রম কুরুক্ষেত্রের পথের ধারে শিবির।

এই শিবিরে বঙ্গে দিল্লীতে নাদিরশাহের নাদিরশাহির বিবরণ শুনেছেন।

এখানে এসেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্ম তিনি কেশবানন্দকে দিলী পাঠিয়েছিলেন। সে বিবরণ শুনতে শুনতে তিনি চিৎকার করে উঠেছেন, হে কংসারি, হে রুন্ত, পাধর ফাটিয়ে জাগো। জাগো। আমাকে বল দাও।

স্বোদ্যের পর বেলা ছ দণ্ড থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত সে এক জ্বাধ হত্যাকাণ্ড। চাদনীচৌক, দরিয়াবাজার, পাহাড়গঞ্জ রজে ভেসে গিয়েছে। মান্ত্র ত্ প্রহরে একটা বন ঘিরে এত জানোয়ার মারতে পারে না। মারাঠারা বলে তিন-চার লক্ষ মাত্রুষ, কেউ বলে এক লক্ষ। মেয়েদের ধরে নিরে গেছে জাল-পেতে-ধরা মাঠ-চড়ইরের ঝাঁকের মত। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মর্যাদাবানেরা বাড়ির শিশু-নারীদের নিজের হাতে কেটে আত্মহত্যা করেছে অথবা লড়াই করে মরেছে। নিবীর্থ কাপুরুষদের মেয়েদের মধ্যে তেজ্বিনীরা কুরোতে ঝাঁপিরে পড়ে বেঁচেছে, হতভাগিনীরা করুণ আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করে নরকের অন্ধকারে ডুবেছে; তাতেও অব্যাহতি পায় নি, ক্রীতদাসী হয়ে পারসিক সৈক্তাবাসে বন্দিনী হরেছে। বছজন আতঙ্কে, অনেকজন অপমানে বিষ খেরেছে, নিজের হাতে গলা কেটেছে, দড়ি গলার দিয়ে মরে পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রকাশ্ত দরবারে অর্থের জক্ত আমীরদের কান কেটে দিয়েছে, চৈত্রের রোল্রে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। আশী-নব্ই ক্রোড় টাকা মৃল্যের ধনসম্পদ লুঠ করে নিয়ে গেছে। কোহিম্বর গেছে, ময়ুরতক্ত গেছে; হিন্দুস্থানের রাজকোষ শৃত্ত করে, রাজলন্দীকে ভিখারিণীর বেশে নামিয়ে দিয়ে গেছে পথে। হায় রে হার, আব কসবী-নাচনেওয়ালী নুরবাঈকে চার হাজার রূপেয়া দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শাহের অফুরোধে ছেড়ে দিয়ে গেছে। হা রে বাদশা, হা! মৃত্টা হেঁট করে সেলাম বাজিরে রাখলি . হিন্দুখানের তক্ত, আর ওই কস্বী নুরবাই! তক্ত নর তক্তা, কাঠের চৌकि; आत्र नचीरक পথে ভिक्का का नामित्य नित्य वैक्रिन नृत्रवाकेरक ? পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর সেলামি দিয়েছে নাদিরশাহকে। হা রে হা!

তিন দিন ধরে এমনি করে হা-রে-হা, হা-রে-হা বলে মধ্যে মধ্যে চিৎকার করেছিলেন তিনি। তৃতীয় দিন এক অত্যাচারীর মাথা কেটে তবে শাস্ত হয়েছিলেন। রাজশাহীর জায়গীরদাবের পাইকর্সদার, একদল পাইক নিরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল এ অঞ্চলের কয়েকজন প্রজা এবং তাদের যথাসর্বন্থ।
এই সামনের পথ দিয়েই যাচ্ছিল। মাধবানন্দ পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন,
তিনি চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, কৌন হায় তু? নাদের শা?
বাঁধকে লে যাতা? আর ওই প্রজাদের বলেছিলেন, তুলোক ক্যা হায়,
ভেড়ি হার?

পাইকসর্দার রহিম উদ্ধত হয়ে তাঁকে মারতে এসেছিল, আরে কাফের, ফকির—

মাধবানন্দ চিৎকার করেছিলেন, জাগো কংসারি, শহর ! হরি-হর ! হরি-হর !

তারপর হয়েছিল একটি খণ্ডযুদ্ধ। পাইকদের একজ্বনও অব্যাহতি পার নি.
আহত রহিম সর্দারের মাথা কেটে নিয়েছিলেন মাধবানন্দ। রাজশাহী
ফিরে গিরে সংবাদ দেবার লোকও অবশিষ্ট ছিল না।

প্রজারা প্রণাম করে জয়ধ্বনি দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল। মাধবানন্দ শাস্ত হয়েছিলেন।

তথন সরফরাজ থাঁর নবাবী আমল। প্রথম দিন থেকেই উদ্ধীর হাজি আহমদের সঙ্গে বিবাদে পঙ্গু শাসনের আমল। কিন্তু শাসনের ভয় তথন মাধবানন্দের ছিল না। তিনি তথন তিন দৈবী শক্তিতে বলীয়ান। তাঁর চোথের সম্মুখে ভবিশ্বং ভাসে—তিনি দেখতে পান রক্তাক্ত পৃথিবী। বে দৃশ্য তিনি এক গভীর নিশীথে গড়জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন—সেই দৃশ্য ব্যাপক এবং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে। দিবারাত্রি অহরহই প্রার গীতার শেষ শ্লোকটি আর্ত্তি করতেন—

নষ্টো মোহ: শ্বতিৰ্ণন্ধা তৎ প্ৰসাদান্ময়াচ্যুতে। স্থিতোশ্বি গতসন্দেহ: করিয়ে বচনং তব ॥

ক্খনও কখনও আবৃত্তি করতেন—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বন্না ক্র্যাকেশ ক্রদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোন্মি তথা করোমি।

পরের দিন থেকেই আশ্রম গঠনের কাজ স্থগিত রেখে নতুন কল্পনা করে গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। সম্মুথের মন্দির এবং ঘর্ত্বারগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে পিছনে পাহাড়ের আড়ালে গোপন দেবস্থল, আশ্রম্বল, ভাণ্ডার, অন্ত্রাগারগুলিকে বড় করে তোলা হয়েছিল। অর্থের অভাব হয় নি। যে অর্থ সঙ্গে এনেছিলেন সে অর্থ কম ছিল না, তার নিজের অর্থ এবং দে-সরকারের বাড়ির অর্থ যোগ করে পরিমাণে হয়েছিল অনেক। তারপরও অর্থ সংগ্রহ করেছেন কেশবানন। জায়গীবদার, জমিদার এবং বড় বড় বণিকদের অনেক নৌকা রাজমহলের ওপার থেকে এপারে করেক ক্রোশব্যাপী গন্ধার মধ্যে লুক্তিত হয়েছে। কেশবানন বাধা দেন নি। কী পাপে যে এই অর্থ সংগ্রহ করে এরা, তা তিনি কেশবানন্দের মতই ভাল करत जात्न। मूत्रनिमातात देवकूर्ल अभिमात जायगीतमातता भए, जायगीतमात জমিদারদের বাড়িতে বৈকুঠের বদলে যা আছে তাকে অংশ্রুট কৈলাস বলা ষায়। বড় বড় বণিকেরা বড় বড় দে-সরকার। অনেক রুঞ্চাসীর আশ্রেদাতা। হাজার হাজার টাকা দিয়ে দিলী, লক্ষে), কাশ থেকে কসবীর মেয়ে কিনে এনে পোষে। কাশী যার বিশ্বনাথ দর্শন করতে নর, বাঈজীর পান ভনতে। ভোবার ছোট মাছের সায়রে এসে সারা অঙ্গে লাল রঙ ধরিয়ে, উল্লাসে-জল-তোলপাড-করে-বেড়ানোর সরলা মোহিনীরা, পলীগ্রাম থেকে কাঁদতে কাঁদতে এই সব বণিকদের বাগান-বাভিতে এসে অল্পদিনের মধ্যেই নাচের আসর মাতিয়ে তোলে। এদের সকলকে ধ্বংস করতে হবে --কেশবানন ঠিক করছেন। কুককেত্রের বিরাট আরোজন সম্প্রে। মহাযজ্ঞের জন্ত বিপুল সমিধের প্রয়োজন। যে বিশাল বনস্পতির কোটরে কোটরে সরীস্পের বাস, যার অন্ধকার তলদেশ পাপাস্টানের লীলাভূমি, তার পল্লব-শোভা দেখে ভূলো না, তার ছায়া দেখে মোহগ্রন্ত হরে। না, তাকেই কেটে थान, मुलाटक्ष करत्र कर्छ थान।

এক বৎসর পর যেদিন আলিবর্দী থাঁ পণ্টন নিয়ে বাজনা বাজিরে এই পথ ধরে ঘিরিয়া প্রাস্তরের দিকে গেল, সেদিন আশ্রমের গোপন সংগঠন প্রায় সম্পূর্ণ। বাইরের প্রকাশ্য মঠ-মন্দির নিতান্তই সাধারণ; তা দেখে কারও সন্দেহ হর না। আশ্রমের সেবকসংখ্যা এক শোর উপর।
পাহাড়ের চূড়ার দাঁড়িয়ে মাধবানন্দ আলিবর্দীর পণ্টন এবং অস্ত্রসম্ভার দেখে
বলেছিলেন—এমনই আয়োজন চাই কেশবানন্দ, প্রস্তুত হও। এক পক্ষ
হারবেই। হারবে সরফরাজ। কাম্ক, সে মৃত। আলিবর্দী উপলক্ষ।
সরফরাজের ছত্রভক্ষ সিপাহীদের অস্ত্র আমার চাই।

অনেক অন্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল।

অন্তর্গনি এনে এক জায়গায় জমা করা হলে, সেগুলি দেখে খুনী হয়ে বলেছিলেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাদের সময় অন্তর্গনি বৃদ্ধা মায়ের শব বলে শাশানে শিম্লগাছের ডালে টাভিয়ে রেখেছিলেন। এগুলি সম্ভে কাফনবন্দী করে কবর দাও।

গুহাগহ্বরে রেথে দেবার নির্দেশ।

তারপর এল বর্গীর প্লাবন।

বার বার—পাঁচবার। আলিবর্দী মসনদে বসবার পর-বৎসরেই প্রথম বর্গী এল। ভাস্কর পণ্ডিত আর উড়িয়াফেরত আলিবর্দী বর্ধমান থেকে লড়াই করতে করতে এল কাটোয়া পর্যস্ত। আলিবর্দী বাঁচল এবং শেষ পর্যস্ত জিতল, হুর্গা-নবমীর দিন, হুর্গাপূজা-নিযুক্ত ভাস্করকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হারিয়ে দিলে। ভাস্কর ফিরে গেল। পর-বছরই এক দিক থেকে এল রঘুজী ভোঁসলে, অন্থ দিক থেকে এল পেশোয়া বালাজী রাও। পর-বছর আবার। আবার এল ভাস্কর পণ্ডিত। ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা দেশে চুকেই ছকুম দিলে—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সন্ধ্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, নারী—কোন বিচার নাই। কাটো।

দেশ শাশান করে দিলে। সেই চিরাচরিত বর্গীর অত্যাচার। নবাব এবার কৌশলে কার্যোদ্ধার করলে। সদ্ধি করবার ছলে ভাস্কর পণ্ডিতকে শিবিরে নিমন্ত্রণ করে এনে অত্তবিতে তাকে হত্যা করলে। বর্গীরা পালাল।

আবার এল বর্গী। শোধ নিতে এল রঘুজী ভোঁসলে।

মাধবানন্দ স্থির হয়ে বসে দেখছিলেন। লয় গণনা করছিলেন। ওদিকে
দিল্লীতে বাদশাহী পোকায়-শিকড়-কাটা প্রাচীন অখখের মত শুকিরে আসছে।
বড় বড় শাখাগুলির প্রশাখা শুকিরেছে। হরিছার গোকুল প্ররাগ প্রভৃতি

স্থানের মঠে মঠে তিনি কয়েকবার ঘুরে এলেন। সন্ন্যাসীরাও সর্বত্র শক্তি
সঞ্চয় করছে। রাজেন্দর গিরি গোসাঁই অযোধ্যার নবাবকে আপ্রায় করে
সারা হিন্দুছানের মধ্যে একজন শক্তিমান হরে উঠেছে। ভাগীরথীর ওপারে
মালদহ থেকে রঙপুর কোচবিহার পর্যন্ত কয়েকটি মঠের সলে যোগাযোগ
স্থাপন করলেন। তিনি চোঝে ভবিশ্বং দেখতে পাছেন। আসছে, শেষ
লগ্ন আসছে। রাত্রে তিনি স্থপ্ন দেখেন। ঠিক এই সময় এল, এক নতুন
অবস্থা। অবধৃত সন্ন্যাসী বলেছেন, কোন নৃতন সিদ্ধি আসতে আসতে
আসতে না।

কেশবানন্দ স্থামানন্দ জানে, এ অভ্রাস্ত সত্য। তারা চোখে দেখেছে বে!

ঘটনাটা ঘটে যেবার রঘুজী ভোঁদলে এল ভাস্করের হত্যার শোধ নিতে।
সেইবার বর্গীদের স্থযোগ করে দিয়েছিল মৃন্ডাফা থাঁ। আলিবদীর বিশ্লুছে
বিদ্রোহ করে এই সামনের পথ ধরেই মৃরশিদাবাদ থেকে পাটনার দিকে
ছুটল। পাটনা আক্রমণ করে দখল করবে। পথে রাজমহল লুঠ করলে।
আলিবদী অহুসরণ করলেন তাকে। ওদিকে মৃন্ডাফার নিয়ন্ত্রণে রঘুলী
ভোঁসলে চুকে বসল বাংলার। মেদিনীপুরের পথে বর্ধমান। মাধবানন্দ
স্থির হয়ে বসে সংবাদ শুনতেন। কেশবানন্দ সংবাদ সংগ্রহের স্থনিপুণ
ব্যবস্থা করেছিলেন। নিত্য সংবাদ আসত। ঠিক ছ দিন তিন দিনে নিভুল
সংবাদ এসে পৌছত। বর্ধার মেঘের মত থমথমে হয়ে থাকতেন মাধবানন্দ।
বিগ্রহের সন্মুথে বসে গভীর কঠে গীতার চতুর্থাধ্যার পাঠ করতেন—

"যদা যদা হি ধর্মশু গ্লানির্কাত ভারত। অভ্যথানমধর্মশু তদাহত্মনং স্কাম্যহম্॥"

কথনও মনে মনে কথনও উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করতেন, কবে ? কবে ? কবে ?

হিন্দু হরে মহারাজ শিবাজীর পতাকা—সাক্ষাং শিবতুলা রামদাস স্বামীর
উত্তরীয়-পতাকা বহন করে শুধু অর্থলালসায় গ্রাম নগর অত্যাচারে অত্যাচার
উৎসর করে দিলে, পাপের উপর পাপ জমা হরে আকাশ স্পর্শ করলে, বায়
দ্বিত হল, জল কলুবিত হল, তবু সময় হল না ? তিনি মনশ্চকে দেখতেন,
গ্রাম জলছে, বগীদের চিৎকারে অট্টান্ডে আকাশ বাতাস চমকে উঠছে।

মাহবের ঘরের মেঝে শুপকরা মাটির ঢিপিতে পরিণত হয়েছে, হাত-পাকাটা মাহ্রম অস্তিম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; কান-নাক-কাটা মেয়েরা এসে
তাঁর সম্পুথে দাঁড়িয়ে বুকের রক্তাক্ত কাপড়খানা সরিয়ে দিছে। হে ভগবান!
ন্তন নেই, পাশবিক অত্যাচারের পর শুন কেটে ছেড়ে দিয়েছে তাদের।
এক-একদিন অধীর হয়ে বিভ্রান্তের মত সারা দিনরাত্রি পারচারি করতেন।
ইচ্ছাও মধ্যে মধ্যে হয়েছে, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন।
নির্ত্ত করেছেন কেশবানন্দ। প্রশ্ন করেছেন, কাকে বাঁচাবেন? মাহ্র্যকে,
না নবাবকে? তাতেই কি অধর্মের উচ্ছেদ হবে? আলিবর্দী অবশ্র সরক্রান্তের মত ব্যাভিচারী নয়, সে শক্তিমান, কৌশলী আর বিচক্ষণও
বটে। কিল্ক তারপর? নবাবের দৌহিত্র ভাবী নবাবের চরিত্রের কথা
তো জানেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন মাধবানন্দ, যার মধ্যে অকল্মাৎ মনে পড়ে যাওয়ার অর্থ স্থাপ্টে।

হাঁ। মনে করিয়ে দিয়েছে কেশবানক। তিনি জানেন, শুনেছেন, সিরাক্সউদ্দোলার কথা। অত্যের কাছে শুনেছেন এবং নবাবদৌহিত্রের দারা অত্যাচারিতের অবস্থা চোথে দেখেছেন। নিতান্তই বালক—এখনও বোল বছর বয়সও পূর্ণ হয় নি। এখন থেকেই তার ভবিশুং স্বরূপ স্কাষ্ট। মুরশিদাবাদ চৌকবাজার তার ভরে সম্বন্ত। উদ্ধৃত দান্তিক নির্চ্বই শুধু নয়, এরই মধ্যে অনাচার, দেহলালসার কথাও শোনা যায়। নবাব আলিবর্দী পর্যন্ত তার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সংসারে ধর্মের জন্ম যুদ্ধ করে প্রাণদান করে যারা গাজী হন, তাঁরা জানেন না সংসার-সংগ্রামে স্নেহের অত্যাচারের সলে যায়া যুদ্ধ করে জর্জবিত ক্ষত্তবিক্ষত, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বীর। একজন শক্রর হাতে মরে, অন্যন্তন অসহায় ভাবে মরে, স্বেহাম্পদের হাতে। নবাব আলিবর্দী শুধু বর্তমানের কথাই লেখেন নি, ভবিশ্বং নবাব-গৌরবের কথাও বলেছেন।

ঠিক বলেছেন কেশবানন্দ। পাপ নিজের ঘাতে সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে ভেঙে পদ্ধুক। তথন তাঁর শক্তিতে যতটুকু সম্ভব আঘাত হানবেন। আহক, আগে ভগবানের অমোঘ নিয়মে পরিণাম আহক। রবুজী ভোঁসলে বর্ধমানে চুকে ন লক্ষ টাকা আদার করলে এক মাসে।

হঠাৎ একদিন সংবাদ এল, বর্গী ছাউনি তুলে কাটোয়ার পথে না-হেঁটে বীরভূম চুকেছে। ছাউনি গেড়েছে উত্তর বীরভূমে কেন্দুরার ডাঙায়। পথে গ্রামে প্রামে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে। কেন্দুয়ার আশপাশের কয়েক-খানা গ্রাম তিন দিনে মুছে দিয়েছে। সম্ভবত এই পথ ধরে বিহারে গিয়ে চুকবে। নবাবের সঙ্গে মুখোমুখী হবে না।

কদিন পর সংবাদ এল, বর্গীরা হাতেমপুব আক্রমণ করে লুঠতরাজ করেছে। ফৌজদার হাফেজ থাঁ মারা গেছে।

হাফেজ থাঁ মারা গেছে? বর্গী হাতেমপুর লুঠ করেছে? মাধবানন্দের মনে পড়ে গিরেছিল, গড়জঙ্গলে কয়ে। একটি নীলা কুড়িরে পেরেছিল। করো বলেছিল হাফেজ থাঁর বেগমের কথা। বড় ভাল। তার কী হরেছে?

শুধু হাতেমপুর নয়, হাতেমপুর থেকে ইলামবাজার, দেখান থেকে স্পুর পর্বস্ত বর্গীরা আক্রমণ করেছে। ইলামবাজারে দে-সরকারের বাড়ি শেষ। ঠেকেছে শুধু স্থপুরে। আর অজয় পার হয়ে ইছাই ঘোষের দেউলের চারি পাশের গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিরেছে। নিষ্কুরতম অত্যাচার করেছে ইলামবাজারের বৈরাগীপাড়ায়।

মাধবানন্দ বিক্ষারিত দৃষ্টিতে কেশবানন্দের দিকে তাকিলে বলগেন, কেশবানন্দ!

কেশবানন্দ তার অর্থ ব্ঝেছিলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব অবশ্রই নর। এ সেই সন্মাসী-ছন্মবেশী বর্গী সেনাপতি, প্রতিশোধ নিয়েছে, এমন নিশ্চরই হতে পারে। আবার তাই যে নিশ্চিত সভ্য এমন মনে করারও কোন কারণ নেই?

বৈরাগীপাড়ার অত্যাচারের কথা, দে-সরকার বাড়ি ধ্বংস করার কথা, এপারে আমাদের আশ্রমের চারিপাশের গ্রামের উপর অত্যাচারের কথার পরেও কারণ নেই?

কেশবানন বললেন, আমি বিন্তারিত খবরের জন্ম লোক পাঠাচ্ছি।

মাধবানন্দ আর কথা বললেন না, উঠে গিয়ে মন্দিরে চুকলেন। ইলাম-বাজার, হাতেমপুর অঞ্লের ঘটনা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করতে আসনে বসলেন। প্রথমেই দেখলেন, আগুন জলছে, বৈরাগীদের কুটির জলছে।
আর্জ চিৎকার উঠছে নারীকঠে। চেনা কণ্ঠস্বর, কিন্ধ বর্গী সিপাহীর
আউহাসির রোলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কার কর্কশ কণ্ঠের আর্তনাদ।
এ তো সেই উচ্ছিষ্টভোজী বৈরাগী কয়ো। হাা, ওই তো দেখা যাচ্ছে,
হাত-পা-কাটা কয়ো পথের পাশে পড়ে চেঁচাচ্ছে। কী বলে চেঁচাচ্ছে?
মোহিনী! মোহিনী! ওঃ, ওই যে চেনা নারীকণ্ঠ, ও-কণ্ঠ মোহিনীর!

—নবীন গোসাঁই! বাঁচাও। বাঁচাও। বলতে বলতে মোহিনী ছুটে আসছে। মোহিনীর বক্ষবাস রক্তে ভেসে গেছে।

ছি—ছি—ছि! टांथ थ्लालन गांधवानन ! ছि—ছि—ছि! পরক্ষণেই দৃ । इत्त्रन ।

এ-পারের অসহায় গ্রামগুলির লোকের কী হল ? ও:, একাস্ত অমুগত সেই বীর বাগদী, ওই যে তার বুকে একথানা বর্শা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে ! ও:—

বিস্তারিত সংবাদ এল পনের দিন পর। জরদেব কেন্দুলীর মহাস্ত মহারাজের কাছ থেকে চিঠি এল। তখন রঘূজী ভোঁসলে বীরভূম পিছনে রেখে দক্ষিণ বিহারে গিয়ে ঢুকেছে।

বিশারকর বিবরণ। মাধবানন্দকেই মহাস্ত লিখেছেন—"কবিরাজ গোস্বামী জরদেব প্রভুর আরাধ্য দেবতার আনীর্বাদে এবং তদীয় তপস্থার পুণ্যে আত্র কেন্দুলী রক্ষা পাইয়াছে। আমরা বিগ্রহ লইরা নিরাপদে অগ্রত্র সরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু এতদঞ্চলে যে হামলা ও অত্যাচার হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। এ অত্যাচার, ইলামবাজার প্রভৃতি স্থানে যাহা হইয়াছে, তাহা করিয়াছে সেই ছন্মবেশী বর্গী সন্ধ্যাসী, যাহাকে আপনি খেদাইরা দিরাছিলেন। এতদিন পর শোধ লইল। আপনার পড়ো আত্রমটি ক্রমশ পড়িয়াই যাইতেছিল, যতটুকু খাড়া ছিল তাহা ধ্বংস করিয়া জালাইয়া দিরাছে। পাশের গ্রামগুলিকেও ছাই করিরা ছাড়িরাছে। ইলামবাজারের বৈরাগীপাড়াও ধ্বংস। দে-সরকারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জন জামির দিরা বধিরাছে। সরকার-বাটির কাহাকেও বাতি দিতে রাখে নাই। পায়ণ্ড

উচিতমত শান্তি পাইয়াছে। এই পাষ্ট্রই একরূপ হাতেমপুরে বর্গীদের ভাকিরা আনিরাছে। ফৌজদার ক্যারপরায়ণ হাফেজ থার সর্বনাশ করিয়াছে। তাঁহার পত্নী সাধনী শেরিনা বেগম আত্মহত্যা করিয়া জুড়াইয়াছেন। সে এক অপরূপ উপাধ্যান। অমাবস্থার রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদরের মতই অপরূপ। বেগম শেরিনা থোদ পাতশাহের ভাইঝি। পাতশাহের এক ভাইপো শান্ত হসেনের সহ সাদীর কথা হইয়াছিল।

সে-কথা মাধবানন্দ জানেন। মনে পড়ে গেল ছসেনকে। মছপ উচ্চ আল যুবক নেশায় আরক্তম্থ অলিতপদক্ষেপে তাঁর নৌকায় উঠে জড়িত কঠে উদ্ধৃত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল, হিন্দু ফকিরের কি এলেম আছে? এক বেশরমী আওরত ফেরার হয়েছে, তার নাম আমিনা, বহুত হ্রত তার, রঙ গুলাবের মন্ত; চোথ হরিণের মত।

সে এক কাব্যের রূপ বর্ণনা করে বলেছিল, সে এক বেইমান ছোট ঘরের বাচ্চা, উসমান তার নাম, তার সঙ্গে ফেরার হয়েছে। ঋড়ি পেতে সে কোন্ দিকে কোন্ মূলুকে গিয়েছে বলতে পারলে বকশিশ দেবে। কেশবানন্দ অপূর্ব চাতুর্যে তার নিজের অন্তমানের কথাগুলি জেনে নিয়ে তাই বলে খুনী করে ফিরিয়েছিলেন। মাধবানন্দ মনে মনে সেই আমিনার কচির প্রশংসা করেছিলেন; এই লোকটির পদমর্যাদা, দেহের বাদশাহী রক্তনগৌরব সমন্ত সত্ত্বেও তার কুৎসিত প্রকৃতিকে ঘুণা করে উপেক্ষা করেছে।

আমিনা এবং উসমান পরম্পরকে ভালবেসে গোপনে বিবাহ করে সমস্ত বিপদ মাথা পেতে নিরে মৃক্ত পৃথিবীর বৃকে বেরিয়ে পড়েছিল। যা হবার হবে। দশ দিকে শত শত পথ, সহস্র সহস্র হয়ে কোথায় চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত শেরসাহী সড়ক ধরে স্থামরূপার গড়জনলে উপন্থিত হরে ও-পারে হাতেমপুরে হাতেম থাঁরের নতুন গড়ের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে চাকরি নিয়েছিল। আমিনা এবং উসমান হরেছিল শেরিনা ও হাফেন্স। পুত্রহীন হাতেম থাঁ তাঁর অস্তিমে হাফেন্সকে পুত্রস্থেহে গ্রহণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সর্বন্থ এবং রাজনগরের নবাবকে অন্তরোধ করেছিলেন ফৌন্সারি দেবার জন্তা।

উদার স্তায়পরারণ হাফেন্ধ থা। করোর হাতে মাধবানন্দের পত্তে অসহায়।

মোহিনীর বিবরণ ভানে দে-সরকারের মত শেঠকে এবং তাঁর বর্বর পুত্রটাকে গ্রেপ্তার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

দে-সরকার চাতুরী খেলে ফৌজদারের হাত থেকে মুক্তি পেলে। কিছু অক্রের পাপের ভার তথন পূর্ব হরেছে, ভগবানের রোষ নেমে এল, তাঁর সেবক মাধবানন্দের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে। কংসারির সেবকেরা তার দীর্ঘদিনের পাপপথে সঞ্চিত ধন কেড়ে নিলে। অক্রের বলির পশুর মত নিহত হল।

দে-সরকার কিন্তু পাথরে-গড়া মান্তবের মত সব সহু করলে। আবার বিবাহ করলে, আবার ধীরে ধীরে ব্যবসায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে। গড়জকলের আশ্রমের সন্মাসীরা চলে গেছে, তাদের সন্ধান সে পার নি। তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল হাফেজ থাঁর উপর। তার সন্দেহ ছিল আশ্রমের সন্মাসীদের এই ডাকাতির পিছনে হাফেজ থাঁর গোপন প্রশ্রম আছে। সাপের আক্রোশের মত সে এই আক্রোশকে প্রতিটি দীর্ঘনিশাসের মধ্যে পোষণ করত।

হুবোগ এল।

একদিন ইলামবাজারের ঘাটে এল এক নৌকো। নামল হুসেন।

পরিচয় হতে দেরি হল না। সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী দে-সরকার, তার গদিতে এল হুসেন: এক মোকাম চাই। আচ্ছা মোকাম। সে শুনেছে বড়া শেঠের বেটার এক বাগিচাওরালা কোঠি আছে। আর শুনেছে, এখানে খুব ভাল বই,মী আছে, শেঠ ইচ্ছে করলে দিতে পারে। সব তার একতিরারের অন্দর। আর চাই টাকা। তার কাছে আছে জহরত। কিছু সন্দেহের কারণ নাই। তার কাছে বাদশাহী ফরমান আছে। বলেই সে কয়েকটা মুক্তা এবং একটা হীরে বের করে দিয়েছিল। তার পর হুসেনের সমাদর হতে দেরি হয় নি। এবং প্রথম দিন রাত্রেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমিনা আর কুত্তার বাচ্চা উসমানকে সে জানে কি না! নিখুত বর্ণনা দিয়েছিল সে আমিনা উসমানের।

দে-সরকার স্বচত্র। চেহারার বর্ণনা এবং তাদের নিরুদ্দেশ হওয়ার সন তারিখ শুনে মনে মনে হিসেব করে মিলিয়ে সন্দেহ হতে তার দেরি হয় নি। কিন্তু সে-দিন কিছু বলে নি। পরের দিন ভাল করে জেনে শুনে হুসেনকে নিয়ে গিয়ে দ্র থেকে ফৌজদারকে দেখিয়েছিল: দেখিয়ে শাহজাদা, উয়ো আদমী আপকা উসমান হায় কি নহি!

- ওহি। ওহি। ওহি। নিমকহারাম কুত্তা—
- চূপ কর শাহজাদা। এ তোমার দিল্লী নয়। দিল্লীর তোমার সে
 দিন নাই। তোমাকে চিনতে পারলে তোমাকে কোতল করে নিশ্চিস্তি
 হয়ে যাবে। আমারও এবার জান নিয়ে ছাড়বে। সব্র কর। ফিরে চল
 এখন। ছাঁশিরার, কারুর কাছে এ কথা বলো না। বলবে না তোমার নাম
 হসেন। বলবে, তুমি সওদাগর। গালার খেলনা সওদা করতে এসেছ।

ছদেন বলেছিল, ঠিক বলেছ। বহুত এলেম তোমার। কালট আমি লোক পাঠাব মুরশিদাবাদ নবাবের কাছে।

- —নবাব এখন এক দিকে মৃন্তাফা থাঁর কামড়ে, অন্ত দিকে বগীঁর থাবার থোঁচায় ছটফট করছে। তোমার আমিনাকে উদ্ধার করবার এখন ফুরসত কোথায় ?
 - —তব্? বহুত আচ্ছা, ওর সঙ্গে আমি লড়াই করব। ও আর আমি।
- —না। এক কাজ কর। বর্গীরা ছাউনি করেছে কেন্দুরার ডাঙায়।
 তুমি তাদের কাছে যাও। তোমার কাছে জহরত ররেছে, ঘুষ দাও, বন,
 হাতেমপুরে চড়াও হোক। সোনা-রূপা জহরত তাদের, আমিনা তোমার।
 হাতেমপুরের পথঘাট, হালহদিস আমি সব জানি। আয়নার মত সাফা
 করে আমি সব বাতলে দেব। আমার আক্রোশ মিটবে।

রযুজীর সঙ্গে ছিল মীর হাবিব। নিমকের গুণ, নিজের জাত, ধর্মের দাম তার কাছে কিছুই নাই। একছড়া মুক্তোর হার নিয়ে সে যোগাযোগ করে দিলে। কেন্দুয়ার ডাঙা থেকে বিহারের পথে যাওয়া স্থগিত রেপে ঘুরল বর্গীরা। রাত্রে বাঁপিয়ে পড়ল হাতেমপুরের গড়ের উপর। হাফেজ থা অপ্রস্তুত ছিলেন না। কিন্ধু রঘুজীর বর্গীর দলে চোদ্দ হাজার সওয়ার আর হাতেমপুরের গড়ে সবে হাজার তিনিক পর্দল আর সওয়ার। তার উপর বিশাস্থাতক দে-সরকারের গোপন পথ-দেখানো। কেন্দুয়া থেকে আসবার

সড়ক-পথের উপর লক্ষ্য রেখে হাফেজ্র খাঁ পন্টন সাজিরেছিলেন। দে-সরকার অক্স পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথে এসে তারা গড় বিরে মশাল জেলে আত্মপ্রকাশ করলে। আশ্চর্য ভাগ্যের থেলা! নিয়তি! ওদিকে তথন শেরিনা বেগম প্রথম সস্তান প্রসব করে স্তিকাগারে। হাফেজ্র খাঁ অকন্মাৎ এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্র হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শেরিনা বসে আল্লাকে ভাক্ছেন।

- —বিদায় নিতে এসেছি।
- -- विमात्र ?
- —হাা, বিদার। অসংখ্য বর্গী পণ্টন। তার উপর—
- —কী তার উপর **?**
- ভূসেন। মশালের আলোয় ভূসেনকে দেখলাম।
- —হসেন! চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চমকে উঠে দাড়াল শেরিনা বেগম।
 - —সে এথান পর্যন্ত এসেছে। আমার ভাবনা শেরিনা—
- —সব ভাবনা আমাকে দিরে তুমি নিশ্চিম্ভ হরে বাও। লড়াই কর। বিশ্বাস রাথ আমার উপর। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ। দাও, আমাকে শেব চুম্বন দাও।

শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে হাফেজ থাঁ চলে গেলেন। শেরিনা বেগম বসে সইলেন। আকাশম্পর্শী কোলাহল। রক্তাক্ততার মত অন্ধকারের বুকে মশালের আলোর ছটা নাচছে। মূহুর্ছ বন্দুক এবং বারুদ-ফাটার শব্দ। ওদিকে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ উঠল। ভাঙল ফটক। শেরিনা বিবি স্থির থাকতে পারলেন না। বাঁদীর কোলে শিশুসন্তানকে দিয়ে একখানা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মূখে।

একটা সমবেত ভয়ার্ড ধ্বনি উঠল, ফৌজদার-

হাফেজ থাঁ গুলির আঘাতে আহত হরে পড়েছেন ঘোড়া থেকে। গড়ের পণ্টনেরা পালাচ্ছে। হুসেন এসে তার তরোয়ালখানা হাফেজের বুকে বি'ধে দিলে। চিৎকার করে বারেকের জ্ঞা নিজের তরোয়ালখানা উন্থত করে হাঁকলেন শেরিনা বিবি, পালিরো না। রোখো। ওই দোজ্থের কুন্তাকে রোখো। কিন্তু পর-মূহুর্তে তরোয়ালখানা নামিরে ঘূরলেন। কী হবে ? হাফেজ, তার প্রিয়তম নাই, তিনি বেঁচে কী করবেন ? তিনিও মরবেন। হঠাৎ বাঁদীটা সামনে এসে কোলের শিশুকে তাঁর হাতে দিরে বললে, নাও বেগম সাহেবা। তোমার ছেলে নাও। তাঁর কোলে ছেলেটিকে দিরে পালাল ছুটে। শিশুর স্পর্শে চমকে উঠলেন শেরিনা বেগম। তাই তো! এর উপায় কী হবে ? একে হত্যা করে তার পর মরবেন ? না, তা পারবেন না। নিজের সন্তানের বুকে—। না। না। তার চেয়ে—। গাঢ় স্বেহে বুকে চেপে ধরলেন তাকে।

— আমিনা। এইবার ? বিপুল উল্লাসে 'আ মেরি পিরারি' বলে কে হি-হি করে হেলে উঠল! কে আবার ? ছলেন।—কিছু ভয় নেই, আমি তোমাকে দিল্লী নিয়ে যাব। বাদশ হব। শের থাঁকে মেরে জাঁহাদীর মেহেরউল্লিসাকে ন্রজাঁহা করেছিলেন। আমি হব হুসরা জাঁহাদীর, তুমি হবে হুসরি ন্রজাঁহা। পিয়ারী! শেরিনা!

বেগম হাসলেন বিচিত্র হাসি। উঠতে লাগলেন উপরে।

- —আমিনা !—হসেনও উঠতে লাগল।
- ---এস।
- --আমিনা!
- —এস।
- —কোথায় ?
- এস। ভার কেন ? উঠতে লাগলেন শেরিনা। উঠলেন ছাদে। এবার হুসেন নিশ্চিস্ত হুয়েছে। যাবে কোথায় স্থার ?

শেরিনা বেগম আলসের উপর উঠলেন—বুকে তাঁর শিশু। দেখ, কোধায় যাবে। আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওখানে। যেখানে হাফেজ গিয়েছে। যেখানে তোমার মত পাপী কোন কালে যেতে পারবে না। পার তো এস। এস।

-আমিনা! আমিনা!

উত্তরে জলতরক্ষের মত সঙ্গীতমর হাসি সেই বীভংসতার মধ্যে ধ্বনিত হরে উঠল। তারপরই আরু শেরিনা বেগমকে দেখা গেল না। মূহুর্ত পরে নীচের প্রাসাদ-সরোবরের বৃক্তের জলে সশব্দ আলোড়ন উঠল। সম্ভানতে বৃক্তে নিয়ে মাতাপুত্রে ঝাঁপ থেরে নিশ্চিম্ত হয়েছেন।

"এ উপাখ্যান লইয়া এ দেশে ইহার মধ্যে লোকে গীত রচিয়া গান করিতেছে মাধ্বানন্দজী। শেরিনা বিবির কবরে নিভ্য সন্ধ্যার চেরাগের সারি জালার। গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করে। হিন্দু মুসলমান নাই। হিন্দু মেরেরা সিন্দুর দেঃ। বলে, তোমার মত যেন সতী হয়ে যেতে পারি। এখন ইলামবাজারের কথা জানাই। এই বর্গীর দলে ছিল সেই সাধু ছ্লাবেশী বর্গী মনস্বদার।"

সে হাতেমপুর আক্রমণের সময় একদল বর্গী নিয়ে আসে ইলামবাজার।
গতবার সে যথন লাঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়, তথন অক্রের পরিচয় জেনে
গিয়েছিল। ক্রফদাসীর পরিচয়, ওপারের সয়্যাসীদের পরিচয়—সবই সংগ্রহ
করে নিয়ে গিয়েছিল। অক্রেরের বাপের ধনসম্পত্তির কথাও জেনেছিল।
স্বতরাং সর্বাগ্রে আক্রমণ করেছিল দে-সরকারের বাড়ি। খুঁজেছিল
অক্রেকে। অক্রে মরেছে শুনে বলেছিল, তবে আন্ ওর বাপকে,
আর আন্ যে যেখানে আছে তাদের। কেটে ফেল্। ঘরের মেঝে খুঁড়ে
ফেল্। তারপর জালিয়ে দেঘর।

দে-সরকার নিশ্চিম্ন ছিল। তার বাড়ি মেন কোন মারাঠা আক্রমণ না করে—এই মর্মে এক আদেশপত্র সে সংগ্রহ করে রেখেছিল মীর হবিবের কাছ থেকে। কিন্ধু প্রতিহিংসাপরায়ণ বর্গী সেনাপতি সেটা টুকরো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর থুতু ফেলে টুকরোগুলোর উপর নিজের ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিয়ে বলেছিল, কুন্তা, সে কুন্তাই। সে কারও পোঘাই হোক আর রাম্ভারই হোক। ওরে কুন্তা, তোর বেটা কুন্তা আমাকে কামড়াতে এসেছিল, তার শোধে তোদের সব কুন্তাকে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব। এমনি করে, এমনি করে, এমনি করে। নিয়ে আয় রে মন জামির, দে ওর কাটায় কাটায় ছিটিয়ে।

সেখান থেকে গিয়েছিল বৈরাগীপাড়া। কাঁহা হ্যায় উ হনো লৌগু?

কাহা আর? জ্বালিরে দে, গোটা বল্তি জ্বালিরে দে। বের করে আন্। নাক কান হাত পা কেটে দে।

বৈরাগীপাড়া জলে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোন্তু বৈরাগীকে পান্ধ নি। তারা তার আগেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল স্থপুরে—ডাকিনীসিদ্ধ আনন্দস্কন্দর চাকুরের গড়ের মধ্যে। প্রেমদাস বৈরাগীর ঋণ চাকুর ভোলেন নি।

বর্গীরা ছুটে গিয়েছিল স্থপুরের দিকে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে।

কেন্দুলীর মহাস্ত মহারাজ লিখেছেন, গোস্থামীজী, লোকে বলছে চার ফটকে একসঙ্গে বর্গীরা আক্রমণ আরম্ভ করলে, আনন্দস্থনর তাঁর অলোকিক শক্তি প্রকাশ করেন; একই সময়ে বর্গীরা এক আনন্দস্থনরকে সাদা ঘোড়ার উপর আরত্ হয়ে চার ফটকেই উপস্থিত দেখে ভীত হয়ে ফিরে গিয়েছে।

কেউ কেউ বলছে, বৰ্গীরা সংখ্যায় ছিল একশো-দেড়ণো; আনন্দ-ফুল্র তাঁর গড়ের মধ্যে হাজার ছ হাজার জোয়ান জমায়েত করে ছুদান্ত সাহসের সঙ্গে বাধা দিয়েছিলেন। বন্দুক-পিস্তলও তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই কারণেই বর্গীরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এবং তাদের সময়ও ছিল না। যাই হোক মাধবানন্দজী, বৈরাগীপাড়া পুড়ে ভসম হয়ে গেছে; কিন্তু আনন্দস্থনর ঠাকুর বীরও বটে সাধকও বটে, তার জন্ম নিরীহ বৈরাগীরা রক্ষা পেরেছে। তার পরই তারা ওপারে গিরে আপনার পরিতাক্ত আশ্রম জালিয়ে ধ্বংস করে পার্শ্ববর্তী গৌরাঙ্গপুর, লোহাগড়ি, গড় গোয়াল-পাড়া, কোটালপুকুরে আগুন দের; কিন্তু এগানকার অধিবাসীরা তার আগেই গভীর বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কারও কোন অনিষ্ট হয় নাই। শেষ লিখেছেন, "বর্গীরা এই ঘটনার পরদিনট বিহার-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দেশ শ্রশান হইরাছে। স্বয়ং নবাব আলিবদী বৰ্ণীর সঙ্গে লড়াই দিতে বাহির হইয়া ভূজা চানা চাউল আটা ছই টাকা সের কিনিয়া জান বাঁচাইয়াছে। আর কেন্দুলী বাঁচিরাছে কবিরাজ গোস্বামীর দৈব্যামুগ্রহে। দক্ষিণ অঞ্চলে কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন শ্রীমন্ত্রাগণত তুল্য পবিত্র এবং প্রিয়। বর্গীরা যাওয়া-আসার পথে নাকি বার বার প্রণান করিয়া গিয়াছে। স্থানাস্তরে নিরাপদে থাকিয়া পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, সমন্তই অটুট আছে, একটি ইটও খনে নাই। সমন্ত গ্রামের মধ্যে একটি লোক ছাড়া লোক ছিল না। সে আপনার সেই কউরা বৈরাগী। সে বছকাল হইতেই কদমখণ্ডীর বটগাছের ডালের উপর বাসা বাঁধিরাছে। গাছের শীর্বদেশে বসিয়া 'মোহিনী' বালিয়া চিৎকার করে। সে কিন্তু বর্গীর ভয়েও স্থানত্যাগ করে নাই। সে বলে, জরদেব ঠাকুর নাকি নিজে কেন্দুলীকে বন্ধা করিরাছেন। গাছের মাথা হইতে সিদ্ধাসনে সে তাঁহার দিবাম্তি দেখিরাছে।"

পত্র শেষ হলে মাধবানন্দ দীর্ঘক্ষণ —পূর্ণ অন্তপ্রহর শুদ্ধ হয়ে সেই একই স্থানে বসে ছিলেন। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, বৈরাগীপাড়া পুড়েছে, কিন্তু বৈরাগীরা বেঁচেছে ? কারুর কিছু হয় নি ?

কেশবানন্দ সারা পত্রথানির উপর আবার একবার চোখ বৃলিয়ে দেখে বলেছিলেন, হাঁা, তাই লিখেছেন মহাস্ত মহারাজ। স্থপুরের আনন্দস্কর গোস্থামী তাদের আশ্রম দিয়ে বাঁচিয়েছেন।

আবার কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করেছিলেন, করে। বৈরাগী কেন্দুলীর কদমখণ্ডীর ঘাটের বটগাছের ভালে—

- —হাঁা, সারা কেন্দুলীর মধ্যে একা কয়োই তার বটগাছের ডালের বাসা ত্যাগ করে নি। সে সিদ্ধাসনের উপর কবিরাজ গোস্বামীর দিব্য-মূর্তি দেখেছে।
 - —তার কোনও অনিষ্ট হয় নি ? অক্ষত দেহেই আছে ?
 - —মনে তো তাই হয়। অবশ্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু লেখেন নি তিনি।
 - --করো গাছের মাথার উপর বসে চিৎকার করে, লিখেছেন না ?
- —হাঁ। 'মোহিনী' 'মোহিনী' বলে চিৎকার করে। মোহিনী সেই মেয়েট, যাকে উদ্ধারের জন্ম—

হাত তুলে ইন্ধিতে চুপ করতে বলেছিলেন মাধবানন্দ। কেশবানন্দ নীরব হয়ে কিছুক্ষণ নৃতন প্রশ্ন বা কথার প্রভীক্ষা করে অবশেষে অন্তত্ত্ব চলে গিয়েছিলেন। মাধবানন্দ সেই হাত তুলে শৃত্ত দৃষ্টিতে সন্মুখের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন মাটির ষ্তির মত। বছক্ষণ পর একটা দীর্ঘ-নিশাস ফেলে বোধ করি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলেন, তবে ?

কিছুক্ষণ পর আবার বলেছিলেন, আমি যে ম্পষ্ট দেখলাম। আরও অনেকক্ষণ পর আবার বলেছিলেন, সব ভ্রান্তি ?

মনে পড়ে গেল অথবা আবার তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন, হাত-পা-কাটা কয়ো চিৎকার করছে—মোহিনী! মোহিনী!

নাক-কান-কাটা মোহিনী ভরে ছুটে পালাচ্ছে, ভরে যন্ত্রণার উন্নাদিনীর মত ছুটে চলে আসছে, তার বক্ষাঞ্চল রক্তসিক্ত, সে ডাকছে—বাঁচাও। ওগো নবীন গোসাঁই! ও—গো—

এ দর্শন তা হলে ভ্রান্তি?

সন্ধ্যা তথনও আসন্ধ। মন্দিরে প্রদীপ জ্বছে। কাঁসর-ঘটার ধ্বনি উঠছে, দামামার ঘা পড়ছে, আরতি হবে; মাধবানন্দ উঠে হাতম্থ ধুতে ধুতেই ডেকেছিলেন, কেশবানন্দ!

কেশবানন্দ কাছেই ছিলেন। গুরুর মানসিক অবস্থাস্তরে শক্ষিত হয়ে-ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, গুরুজী!

—আমি একবার কেন্দুলী যাব। কাল বা পরশুর মধ্যে। তুমি আয়োজন কর। সঙ্গে অর্থ নাও। গৌরাঙ্গপুর লোহাগড়ি গ্রামগুলির লোকেদের যা ক্ষতি হয়েছে, তা পুরণ না করলে ধর্মে পতিত হতে হবে।

কেন্দুলী গিয়েছিলেন মাধবাননা। মহাস্তের অতিথি হয়েছিলেন।
কাটোয়া হয়ে অজয়ে চুকে যে ভাবে প্রথমবার শ্রামরূপার গড়ে গিয়েছিলেন
সেই ভাবেই। সেই ভাবেই তিনি নৌকার ছইয়ের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বর্গীদের
অত্যাচারের পৈশাচিক দৃশ্য দেখতে দেখতে গিয়েছিলেন। পোড়া প্রাম,
গ্রামের পর গ্রাম; পড়ো প্রাস্তরের মত তৃণশৃত্য কঠিন শশ্রক্তের, হাত-পাকাটা মান্ত্র, নাক-কান-কাটা কর্তিতত্তন নারী—বীভংস দৃশ্য। একদিন
রাত্রে একটি ঘাটে নৌকা বেধেছিলেন, সেখানে গান শুনেছিলেন, দল
ব্রেধে পালাবন্দী গান—

উপায় কি কৰি বল, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান—
কিমতে কও বাঁচে জান মান ?
বরগীরা আইল ভাশে, হাজারে হাজারে, যমদ্তের সমান—
কিষ্টো কালী শিবো ভগবান গ

মাহ্ব হইলে যম, সাক্ষাৎ যমের বাড়া দেবতারে মানে যম, মাহ্ব-যমে ডরে দেবতারা— মাহ্বে ঘর ছাড়তে নারে, দেবতারা আগেভাগে পালান— কিন্তো কালী শিবো ভগবান!

কবি গঙ্গারামে বলে, দেবতার কেনে ত্ব ?
অন্তর খুঁজিয়া দেখ, কত পাপ পুষ।
ওরে মান্ত্রে থেকা পাপ বেশী জড়ো কৈলে বিদ্ধপর্বত সমান—
কি করিবে, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

ওরে তবে শুন বিবরণ—

রাধারুষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা রাত্রদিন ক্রীড়া কর পরস্ত্রী লইঞা। শৃঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্বক্ষণ হেন নাহি জানে সেই কি হবে কক্ষণ! পরহিংসা পরনিন্দা রাত্রি দিনমান— জর্জর পৃথিবী, পাপ বিদ্ধপর্বত সমান— কলির ঠ্যাঙায় ধর্ম ব্যেয় যায় যায় শেষ পদথান— রুষ্ট হইল কিষ্টো কালী শিব ভগবান!

अन अन विवत्र ।-

এত যদি পাপ হইল গৃথিবী উপরে—
পাপের কারণে গৃথিবী ভার সহিতে নারে—
তবে পৃথিবী চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর—
কান্দিতে লাগিলা পৃথী ব্রহ্মা বরাবর।
পাপের ভারায় ভেঙে বুঝি যার বা বক্ষথান—
কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

দীর্ঘ গান। মূর্থ গঙ্গারাম কল্পনা করেছে, এই পাপের প্রতিবিধানের জন্ত শিব নন্দীকে পাঠালেন শাহরাজার মধ্যে অধিষ্ঠান হতে।

এতেক শুনিরা নন্দী গেলা শীগ্রগতি উপনীত হইলা গিয়া শাহরাজা প্রতি। শাহরাজা বাহু মেলি তোলে তলোয়ার থান জর কিটো কালী শিবো ভগবান!

তবে হাঁা, এ তাগুৰ প্রেততাগুৰ বটে। সেখানে গন্ধানাম ভূল করে নি। ওঃ, অসহ। মাধবানন্দ অধীর হয়ে বলেছিলেন, কেশবানন্দ, নৌকা খোল, এগিয়ে চল, এ শুনতে আমি আর পারছি না।

ওরা তথন গাইছিল, বামূন পালাচ্ছে, অর্থণিক পালাচ্ছে, গন্ধ্বণিক কামার কুমার বৈভ কায়ত্ব, ধনী দরিত্র, বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী পালাচ্ছে। বর্গী আসতে—

ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলোয়ারের ধ্বনি—
তলোয়ার ফেলাইঞা তারা পলার এমনি।
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল—
বরগির নাম শুইনা সব পালাইল।
গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে।
দার্রুণ বেদনা পেয়ে প্রস্বিছে পথে।
গাছতলাতে কান্দে নারী কোলেতে সস্তান—
রাথো. কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে—
আচন্বিতে বরগী ঘেরিল আইসা সাথে—
কাক্ন হাত কাটে কাক্ন কাটে নাক কান—
একই চোটে কাক্ন বা বধএ পরাণ।
মোহিনী বমণী বাছি ধইরা লইয়া বাএ—
অক্তে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।
একজনে ছাড়ে আর অক্সন্তনা ধরে।
রমণের ভয়ে তারা আহি শব্দ ছাড়ে।

আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দিছে পাষাণ— রাখো কিষ্টো কানী শিবো ভগবান।

নৌকা খোলো—নৌকা খোলো—এই মৃহুর্তে। উন্মন্তের মত চিৎকার করে উঠেছিলেন মাধবানন্দ।

কেন্দুলীতে এসে করোকে দেখে বিশ্বরের সীমা ছিল না। কয়োর হাত পা কাটা যার নি বটে, কিন্ধ তার হাত পা ভেঙে সে পঙ্গু হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ঘোর উন্নাদ। শুধু চিৎকার করে, মোহিনী, মোহিনী, মোহিনী! মো—হি—নী!

মোহিনী হারিয়ে গেছে। সেই রাত্রে। সেই ভরক্ষর বর্ষণমুখর রাত্রে মাধবানন্দ যে তাকে বলেছিলেন, সাক্ষাৎ পাপ। তোমার মুখদর্শনও পাপ। কাল ভোর হতে হতে তুমি চলে যাবে, আর যেন তোমার মুখদর্শন করতে আমাকে না হয়!

সেই কথা শুনে, সেই রাত্রেই সে সেই ছুর্ঘোগের রাত্রে বর্ষণোল্লাসিত শাল-অরণ্যের মধ্যে কোথায় সন্ধানহার। হয়ে হারিয়ে গেছে।

কয়ে। সেই দিন থেকেই ডেকে ডেকে ফিরছে। অবশেষে গাছে বাসা বেঁধে গাছের মাথায় বসে দিগ্দিগস্তের দিকে চেয়ে তার সন্ধান করেছে আর ডেকেছে—মো-হি-নী!

এর পর গিয়েছিলেন শেরিনা বিবির কবর দেখতে। হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে কবরে প্রণাম করে সন্ধ্যার প্রদীপ সাজ্জিয়ে দেয়; হিন্দুরা সিঁত্র দেয়—তাদেরও প্রেম যেন এমনি গভীর হয়। এমনিভাবে যেন তারাও মরতে পারে।

মাধবানন্দের চোথ থেকে অশ্রের বক্তা নেমে এসেছিল সেদিন সন্ধ্যায়। কেঁদেছিলেন সারা রাজি সারা দিন।

সেই দিন সেই মূহুর্ত থেকে এই বিচিত্র ব্যাধির স্বত্রপাত। তন্ধ হয়ে ছিলেন ক্রমান্বরে সাত দিন। বিষয়তার আচ্ছন্ন অভিভূতের মত বসে ছিলেন। চৈতক্ত যেন কোন্ দুরলোকে আকাশের গায়ে স্থতোকাটা ঘুড়ির মত

কাঁপতে কাঁপতে নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে—হারিয়ে যাচছে। অসীম অনম্ভের মধ্যে নিরালম্ব, নিরাশ্রায়, দিক নাই, দিগন্ত নাই; মাটির বুকে নামার উপায় নাই; বন্ধন নাই; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ক্লেহ থেকেও যেন বঞ্চিত হয়েছেন তিনি।

শাত দিন পর শেবার স্কৃত্ব হয়েছিলেন। পৃথিবীর বুকে নেমেছিলেন বজ্রের বেগে। কাটা ঘুড়ি অকমাৎ ইন্দ্রদেবতার বজ্র হয়ে নেমেছিল মাটির বুকের এক উদ্ধৃত পাপপরায়ণের উপর—ধর্মের বিচারে অভিশপ্ত জনের মাথায়।

ফেরার পথে মুরশিদাবাদের পরেই বাল্চরের সামনে গঙ্গার ঘাটে একখানা ছোট প্রমোদ-তরণী বাঁধা ছিল, তরঙ্গদোলায় অলসবিলাসে যেন হলছিল। ছাদের উপর বসে ছিল এক বিলাসী শেঠের ছেলে; সন্ধ্যা তথনও হর নি, দিনের আলো মান হলেও সমন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। সেই স্পষ্ট আলোকে পবিত্র গঙ্গার বুকে সে এক নটীকে কোলে নিয়ে তার মুখ চুম্বন করছিল। বার বার। মিথ্নলীলায় মগ্র পশু এবং পশুনারীর মতই লক্ষ্যা সম্পর্কে জ্রাক্ষেপহীন।

বিষয় বিমর্থ মাধবানন্দ মূহুর্তে বজ্ঞের মত জবলে উঠেছিলেন। পর-মূহুর্তেই আকস্মিক বিপদের জন্ম প্রস্তুত করে রাখা ফিরিক্সীদের তৈরী বন্দুক একটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলেছিলেন—খাড়া কর নৌকা। অলজ্ঞানীয় সেক্ঠিমর এবং আদেশ। নৌকার গতি স্থির হতেই বন্দুক গর্জে উঠেছিল বজ্ঞের মত। হতভাগ্য শেঠ যুবক পড়ে গিয়েছিল, নটাটার কী হয়েছিল কে জ্ঞানে! নৌকার সমস্ত দাঁড়গুলি তথন একসক্ষে পড়তে আরম্ভ করেছে।

আরও বারো বংসর এই ধারার চলছে। ক্রমণ বাড়ছে। সাত দিন থেকে দশ দিন পনের দিন, ক্রমে এখন তিন মাস পর্যন্ত ওই অবস্থার মূছমান হয়ে থাকেন মাধবানন। প্রয়াগে এবার পূর্বকৃত্ত। পূর্বকৃত্তসানের জন্ত যাত্রার আরোজন প্রায় সম্পূর্ণ। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেবী-পক্ষের ক্রয়োদশী তিথি, ব্ধবার। দিনটি চিরকালই প্রশন্ত, শুক্ত। এবার আরও করেকটি বিশেষ যোগাযোগে পূণ্য এবং কল্যাণকর হয়ে উঠেছে; ওই তারিখেই যাত্রার কথা, কিছু অক্সাৎ আজ তিন দিন মাধবানন্দ এই বিচিত্র বিষপ্তভার তিমিত তত্ত্ব

হয়ে গেছেন। প্রথম ছ দিন কেশবানন্দ কিছু বলেন নি। আজ কথাটা নিবেদন না করে পারলেন না।

—তা হলে যাত্রার আয়োজন এখন স্থগিত থাক।

যাত্রার আয়োজন স্থগিত থাকবে? প্রয়াগযাত্রার আয়োজন? চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। গভীর মগ্নতার মধ্যে ডুবে-যাওয়া মনও সকল শক্তি এক করে সম্ভাগ হরে উঠল। যাত্রা স্থগিত থাকবে?

পূর্ণকুম্ভ বারো বংসর পর আবার আসবে। নবগ্রহ, ছাদশ রাশি, তিথি বার স্ষষ্টিচক্রের অপরিবর্তিত নিয়মে বারো বংসর পর পর এই সমাবেশে আসবে; রবিবারে পূর্ণিমা-তিথিতে স্থ্ বৃহস্পতি মকররাশিস্থ হবে। কিন্তু এবার মহাযোগ। স্পানবোগের সঙ্গে মহাদর্শনযোগ যক্ত হরেছে।

যে-যে গ্রহ রাশি নক্ষত্ত তিথি বার সমাবেশে কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছিল, দে সমাবেশ তারপর আবারও এসেছে, এর পর আবারও আসবে, সেই যোগে কুরুক্ষেত্রতীর্থ দর্শনে স্নানে স্নায়ীর কোটা জন্মের পাপমোক্ষণও হবে; কিন্তু যে-বৎসর কুরুক্তেত যুদ্ধ হয়েছিল, সে-বৎসর সেই ষোগে সমস্ত পৃথিবীর পাপ মোক্ষণ হরেছিল। সে যোগ মহাযোগ, এক-সঙ্গে স্থানযোগ ও দর্শনযোগ। রক্তাক্ত কুরুক্ষেত্র, রথ রথী গজ অশ্বের শব-সমাকীৰ্ণ কুৰুক্ষেত্ৰ, বিগতশক্তি নি:শেষিততেজ সিদ্ধ মহান্ত্ৰ-আকীৰ্ণ কুরুক্ষেত্র; কুরুকুল এবং পাণ্ডবকুলের পুরনারীদের অঞ্চ-অভিষিক্ত কুরুক্ষেত্র; পাঞ্জন্ত-মহাশন্থধানি এবং গীতার মহাসন্ধীতের রেশঝক্বত কুরুক্তেত্র সেই वरमबरे कालब मान काल शिष्ट स्रोत स्रोत मि। এ वरमब य मारे মহাবোগ। সমগ্র আর্ঘাবর্ত জুড়ে মহাধ্বংসলীলার শেষ পর্ব এখনও আসে নি, কিছু অর্ধেক শেষ। সমুখে আসছে অপরার্ধ। শেষ পর্বে তাঁরা উঠবেন; তার আগে অজুনের বিশ্বরূপদর্শনের মহাকালের রুক্তরূপ দর্শন না করলে দিব্যজ্ঞান মহাশক্তি আসবে কী করে? রক্তন্তোতে তুফান উঠুক, অন্তরাত্মা ছমার দিয়ে উঠুন। বিষয় সন্ন্যাসীর চিত্রলোকে মহাভারতের শব্দ বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল হিন্দুস্থানের বর্তমান চিত্র।

বাংলা দেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই বিরাট ক্ষেত্রে এই বোল বছরে যে

যুদ্ধ চলেছে, তার কথা কুরুকেত্র খেকে কম কি বেশী তিনি বুঝডে পারছেন না। মনে হচ্ছে যেন বেশী। কলির কুরুক্তের। বাংলা দেশে সরফরাজের ধ্বংস হল ঘিরিয়ার প্রাক্তরে। এই তো কয়েক ক্রোশ দ্রে। হুতির নালা থেকে চড়কা বালিঘাটা পর্যস্ত তু পক্ষের কামান বসাবার জারগাগুলো পর্যন্ত চিহ্নিত করা রয়েছে। আলিবদী ওগুলো পাকা করে কারেমি করতে চেয়েছিল। ভবিশ্বতে যুদ্ধ হবে এ কথা সে জানত। কিন্ত জানত না যে, ঘিরিরার হবে না, হবে মারাঠাদের সঙ্গে বাংলা-বিহার জুড়ে নানান স্থানে। মারাঠার। বাংলা দেশকে বার বার চারবার জালিয়ে লুঠে মেরে কেটে নারীধর্ণ করে ছারধার করে দিয়ে উত্তব-ভারতের দিকে মূথ ফেরালে। আলিবর্দী ভেবেছিল—বাস্, নিশ্চিস্ক, এইবার আর-একটা যুক হলেই শেষ। দ্বৈপায়ন হ্রদের তুর্বোধনের মত হাতসর্বস্থ দিল্লীর বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে, অথবা ভগ্ন-উরু তুর্ঘোধনের শেষ সেনাপতি অখখামার মত व्यायाधात नवात्वत्र मान अविशे नाष्ट्री हत्नहे त्या । जात्रहे क्या तम বিরিয়া এবং আরও উত্তরে রাজমহলের ওপারে উধুয়ানালায় ঘাঁটি তৈরি করেছিল। ভাবে নি তার বংশ ধ্বংস হবে মুরশিদাবাদের উত্তরে নয়---দক্ষিণে, পলাশীর আমবাগানে। তিন মাসও পূর্ণ হয় নি এখনও, পলাশীতে উচ্ছ, अन অম্বরচিত্ত নবাব সিরাজউদৌল্লা শেষ হরেছে। আলিবর্দী বিশাস-ঘাতকতা করে সর্জরাজকে ধ্বংস করে নবাব হয়েছিল। মীরজাফর বিশাস্থাতকতা করে ফিরিকী ইংরেজের মুঠোখানেক পণ্টনের হাতে मित्राक्षिप्रकोक्षात भत्राक्षत्र घिटा फितिकीरक पूर मिरक नवाव श्राह्म। এই তো বর্ষার সময় প্রাবণ মাসে হতভাগ্য মীরজাফরও যাবে। ওদিকে সারা উত্তর-হিন্দুস্থান শাশান, দিল্লীর অবস্থা দ্বৈপায়ন হ্রদের ত্র্ণোধনের মত।

নাদিরশাহী মহা হুর্ষোগের পর আবদালশাহী হুর্যোগ। নাদিরশা মরেছে—মরেছে তার তুর্কী-মনসবদারের হাতে। গভীর রাত্তে তুর্কীরা তার তাঁবুতে চুকে, একসঙ্গে তেরোজন মনসবদার তেরোটা তলোরার দিয়ে কোপ মেরেছিল। নাদিরের আফগান মুন্ত্রকে শাহ হরে বসেছে আহমদ-শাহ আবদালী। হুটো কান কাটা, নাকে কুঠরোগের বিকৃতি, তেমনি নিষ্ঠুর কুটিলপ্রকৃতি আহমদশাহ আবদালী। এর মধ্যে চার-চারবার সে হিন্দুহান চুকেছে মহামারীর মত, আশ্বিনী ঝড়ের মত, বৈশাৰী অগ্নিদাহের মত সমস্ত দেশকে বিপর্যন্ত করে দিরে গেছে। গতবার সে এসেছিল মথুরা বুন্দাবন গোকুল পর্যস্ত। গোটা হিন্দুস্থান শ্রাশান। সাত দিন ধরে মথ্রা তাদের দেওয়া আগুনে পুড়েছে। মথ্রার রাজপথ গলিপথ কাটা মৃত্ আব লাদে ছরলাপ। মাটি কাদা হরেছে রক্তে। যমুনার জলে শুধু মড়া---মড়া আর মড়া। কুরোগুলো জেনানার লাসে ভতি। দেবমৃতি ভেঙে বান্তায় তাবা গেণ্ডুরা থেলেছে। হাজারে হাজারে—দশ বিশ জিশ হাজার যুবতী মেয়ে আর জোয়ান ধরে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে দড়ি দিরে ভেড়ীর মত এক এক মুঠো দামড়ির দামে বেচে গিরেছে। পথের হু ধারে থালা কাঁসা তামার ভাঙা বাসন ছড়িয়ে পড়ে আছে—কুড়িয়ে নেবার লোক **त्मरे। जातमानी निष्क निर्द्य रशह** ताम्यार घरत्र मारुकामी। मरुक्रम শাহের বেটী—বাদশাহী রঙমহলের ফুটস্ত গোলাপ—তার কুঠরোগাক্রাস্ত নাকে দিয়ে ভোগ করবার জন্ম টেনে ছিঁডে নিয়ে গিয়েছে। আরও নিয়ে গেছে আয়ুফতউন্নিসাকে। হার রে নদীবের খেল, আরুফতউন্নিদা—ঔরংজীব বাদশার সাক্ষাৎ প্রণোত্রী, দেওয়ার বক্সের বেটী। তার বেটা তাইমুর নিয়ে গেছে ত্সরা আলমগীর বাদশার বেটা গৌহরউল্লিসাকে। দিল্লী-হারামের আরও যোল-যোলটি বছ বা বেটাকে নিয়ে গেছে। দিল্লীর আমীরদের বাড়ির স্থন্দরী বহু বেটী লুঠে নিয়ে গেছে আবদালীর পাঠান मनमन्तराहित्या। मिल्ली थ्याटक कार्न পर्यस्व भाषत भारत भारत भारत कहान, আর আছে ভাঙা বাসন কোসন। আরও আছে, তা খুঁজতে হর-মাটির সঙ্গে মিশে আছে লবণাক্তস্থাদ, চোথের পানির, আর স্থাদ আছে বক্ষেব।

গোটা হিন্দুস্থানের মধ্যে তু জায়গা ছাড়া কোথাও তলোয়ার ওঠে নি।
রক্তমগুলে চৌমুহার জাঠেরা লড়েছে ব্রজনাথের জন্ম। হিন্দুপাদ-পাদশাহীর
নামে মিথো গৈরিক ধ্বজা বয়ে বেড়ার আর লুঠতরাজ অত্যাচার করে বেড়ায়
যে মারাঠা সে মারাঠা হঠে গিরে দুরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, আর আট হাজার
জাঠ চাষী এসে রুখল আফগানের পথ। জাঠদের দেহ মাড়িয়ে তবে চুকতে

হবে ব্রজমণ্ডলের রাজধানী। ওদিক থেকে এল বিশ হাজার আফগান আর রোহিলা সিপাহী। সঙ্গে কামান শিভল বন্দুক— বন্দুক। সকালবেলা থেকে প্রা ন ঘড়ি বিশ্রামহীন লড়াই। বন্দুক-কামানের শন্ধ, তার সঙ্গে চিংকার, বারুদের ধোঁয়ার সঙ্গে রক্তের গন্ধ। ন ঘড়ির পর শবাকীর চৌমুহার প্রান্তর থেকে হাজার কয়েক জাঠ ফিরল মাথা হেঁট করে। আফগান চুকল কিপ্ত নেকড়ের মত। বারো হাজার মুর্দায় আছেন্ন তথন চৌমুহার প্রান্তরে জাঠ পাঁচ হাজার, আফগান সাত হাজার। আফগানী সওয়ারের ঘোড়া হুঁচোট থেলে মুর্দার উপর।

ওই চৌম্হার প্রাস্তবের মাটিতে প্রণাম করতে হবে, রক্তের গদ্ধ স্বাদ থাকতে থাকতে ওই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে।

আর মহাপুণ্যতীরথ—গোকুল।

গোকুলে আবদালী পন্টন হঠেছে—হেরেছে। হঠেছে, হেরেছে সন্থাসীর কাছে। রাজা নয়, সেনাপতি নয়, পন্টন নয়, বৈঞ্ব সন্থাসী। দেহে বর্ম নাই, চড়বার জন্ম ঘোড়া নাই; আফগান আসছে শুনে ভন্মনাথা কৌপীনসার পাঁচ হাজার বীর সন্থাসী তলোয়ার তীর ধয়ক—কিছু বন্দুক আর চিমটা ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়াল। নাকাড়া বাজল, শিঙা বাজল, ধ্বনি উঠল:গোকুলনাথ-কি—! পাঁচ হাজার গলায় আওয়াজ উঠল—জয়।

তারপর এক ভীষণ সংঘাত। তুটো পাহাড় যেন জীবস্ত হয়ে উঠে মহা আক্রোশে পরম্পরের দিকে ছুটে গিয়ে পরম্পরকে আঘাত করল।

পড়ল আড়াই হাজার গোস্বামী, ওদিকে আড়াই হাজারের বেশী আফগান।
কিন্তু শুন্তিত হয়ে গেল আফগান; মরণোল্লাসের এমন হন্ধার তারা শোনে নি;
সমুদ্রের তেউয়ের পাহাড়ের উপর আছড়ে-পড়ার মত এমন আছড়ে-পড়ে
লড়াই দেওয়া কাজাকস্তান, খোরাসান, আফগানেতান—বছ স্থানে তারা
লড়েছে; কিন্তু কোথাও দেখে নি।

আবদালী নিজে ফিরিরে নিয়েছে ফৌজ, ছোড় দো। চালার থাকে, পরনে কৌপীন, গায়ে ছাই, ওদের কাছে কী থাকবে, ওরা বাউরার দল, ওদের ছেড়ে দিরে ঘোরো, সব ঘোরো। পণ্টনে মহামারী লেগেছে তখন। কৃতকর্মের ফল, যুমুনার জলে হাজার হাজার লাস তখন পচে উঠে জল বিষাক্ত করে তুলেছে। তার পশ্চাতে আছে দেবরোষ। হার স্বীকার করেই আফগান গোকুল থেকে ফিরে গেছে। জয় গোকুলনাথি — ! বৈষ্ণব সয়াসী মরেছে, কিন্তু গোকুলনাথ সেই আত্মোৎসর্গে হাসছেন। তিনি জেগেছেন। তিনি জেগেছেন। তিনি জেগেছেন। তিনি জেগেছেন। তিনি জেগেছেন। তিনি জেগেছেন। তাকুলনাথকে প্রপ্রামা করে ওই হাসি দেখে আসতে হবে। ওই গোস্বামীদের বারা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছে জেনে আসতে হবে, শেষ লগনের দেরি কত? তার আগে কী নিদেশি? অজ্ঞাতবাসের মত আত্মগোপনের কালের আর কত বাকি! 'তামাম হিন্দুস্থানের সয়্যাসী এক হো যাও'—এ ফতোরা জারি হবে কবে?

লগন আ গরা-লগন আ গয়া-নিদ মগন রহনা নহি হায়।

তিনি নিজেই রচনা করে দিয়েছেন আশ্রমের সেবকদের জন্ম। যাত্রা স্থগিত রাখলে তো চলবে না।

— জ্বর কংসারি! জ্বয় গোকুলনাথ! না কেশবানন্দ, যাত্রা স্থগিত থাকবে না। এই অবস্থাতেই আমাকে নিয়ে চল। দেহাস্তই যদি ঘটে, তবে গোকুলে সংকার করে। আমার। ওই দেবীপক্ষের ত্রয়োদশীর দিনই যাত্রা স্থির। ওর আর অস্থির হবে না।

দ্বে গ্রামে-গ্রামান্তরে বোধনের ঢাক বাজছে। অকালে নুমহাশক্তির আবাহন। দশভূজার পূজা। সন্ধ্যার প্রাকাল। বাঁকা এক ফালি চাঁদ গাঢ় নীল আকাশের পশ্চিম দিগন্ত ঘেঁষে গলা রূপার দীপ্তিতে দীপ্যমান, তার অনতিদ্রেই শুক্রাচার্য মণিখণ্ডের মত ঝলমল। যেন মহাকালের ললাটপট দেখলেন মাধবাননা

व्यवमाम क्टिं याद्व। हन। हन।

रति-रत ! रति-रत ! रति-रत ! कः माति चात कख ।

আবেগময় গন্তীর কণ্ঠস্বরের ডাক গন্ধার ছুই তীরে প্রতিহত হয়ে ফিবে আসছিল। হরি-হর! হরি-হর! ক্লান্তি হোক অবসাদ হোক, যা হোক— দুরে যাক। নৃতন সিদ্ধি চাই না, যদি তা না-আসে। সম্প্রে বেন মনোলোকের পথের মধ্যথানে একটা রুদ্ধ সিংহছার গতিরোধ করে দাঁড়ায় মাধ্যানন্দের। তথন আশপাশ চারিদিকে তাকিরে অক্তরত করেন, এক পাও সম্প্রের দিকে অগ্রসর হন নি। একটা দিক্সান্থির মধ্যে ওই রুদ্ধ সিংহছারের এক পাশেই একটা চক্রাকার পথে পাক থেরেছেন এতদিন। ছ্রার থোলে না। আঘাত করতে গেলে ওই ছারের অভিত্ব অক্তর্য করা যায় না; মনে হয় শুধু গাঢ়তম অন্ধকার দিয়ে গড়া, কোন বস্তময় লক্ষাই নেই; আঘাত করতে গেলে আঘাত কিছুকে স্পর্শ করে না, অন্ধকারের ভয় উপেক্ষা করে পা বাড়াতে গেলে তাও যায় না, যেখানে কোন-কিছুই নেই সেখানে পদস্থাপন করবেন কোথায়? শৃত্যে পা বাড়ালে নাক্র্য পড়ে; পড়বার জক্তও স্থানের প্রেয়ান্ধন; এ যে স্থানই নেই। আলোহীন বায়ুহীন এমন কি ব্যোমসন্তাহীন নান্তিত্ব শুধু। ভয়ে? না এ তো ভয় নয়। আর-কিছু। শৃত্যতার মত একটা কিছু তাঁকে মৃহত্বে গ্রাস করে নেয়। কিছু নাই; কেউ নাই; নিজেও হারিয়ে যাচ্ছেন, ধরতে কিছু নেই, ধরবার কেউ নেই।

সব হারাচ্ছে, নিজে হারাচ্ছেন, শুধু বেদনা হারাচ্ছে না। নিজেকে মুহুর্তে মুহুর্তে অন্থত করবার একমাত্র উপায় নিজের বৃকটা চাপড়ানো। আলো তো নেই যে নিজের ছায়া দেখেও নিজের অন্তিত্ব অন্থতন করবেন। পিছনের দিকে তাকিয়ে সান্ধনা খুঁজতে যান, দেখতে পান, পিছনটা তৃণহীন পুশুহীন প্রান্ধরের মত থাঁ-থাঁ করছে। সেখানেও কেউ নেই। তাঁর এই চলে-আসা পথের দিকে কোন ঘটি চোথ তাকিরে নেই। ফেলে-আসা কোন ঘরের চিহু নেই, নিজের হাতে পোঁতা গাছ নেই, কোন নিশানা নেই কোথাও। নিজের ঝুলি থোঁজেন, সেখানে শুধু মুঠো মুঠো ছাই; যে যা জীবনে তাঁকে দিয়েছে তিনি যে তার স্বই পুড়িরে নিংশেষ করে দিয়েছেন—সেই ছাই। সব মিথ্যা। সব মিথ্যা হরে গেছে। কিছুই পান নি তিনি। মনে শান্ধি নেই, সান্ধনা নেই; সারা দেহে রাজি, উদরে ক্র্ধা, কণ্ঠে তৃষ্ণা, জীবনে এক বিচিত্র অশ্বন্থি—যেন জালা। সব মিথ্যা। কোথার সে চৈতন্তাময়? তার বস্তময় দেহকে নিংড়ে তার সকল হবিকে নিংশেষিত করে চৈতন্তোর প্রদীপ জালিয়েছিলেন, সে প্রদীপ-

শিখা নান্তিখের মধ্যে হারিয়ে যাচেছ। কোথার জ্যোতিলোঁক ? কোথার প্রাণময় উষ্ণমণ্ডল ? তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন পিছনে ফেরবার জন্ম। কিন্তু তা তো পারেন না। পঙ্গুর মত অসাড় হয়ে পড়ে থাকেন। সে অমুভূতি-অমুভবও নান্তিখের মত। ব্যক্ত করতে যেন পারা যায় না। বার বার তাই পুনরার্ত্তি করে নিজেই যেন বুঝতে চেষ্টা করেন।

তারপর একদিন বাস্তবে ফেরেন। কখনও ত্রস্ক কোধে ফেরেন, কখনও দৈহিক আঘাত পেয়ে ফেরেন; কখনও গান শুনে ফেরেন। কখনও কখনও ফেরবার জন্ম নিজের দেহে নিজে অস্ত্র দিয়ে ক্ষত স্টে করেন, কিন্তু তাতে ফল হয় না। আবার আকস্মিক ভাবে কোন পাধরে হোঁচট খেয়ে অল্প আঘাতেই সচেতনতায় ফিরে আসেন। করেক দিনের মধ্যেই মোহ কাটিয়ে প্রবলতর উত্যমে কর্মে নিজেকে ভূবিরে দেন। উৎসব জুড়ে দেন।

ष्यद्रब्दे रालन, ष्यानम् त्राद्यः। ष्यानम् त्राद्यः।

বন্দুক নিয়ে চাঁদমারি করেন। সমস্ত অস্ত্র বের করিরে নিজের সামনে সাফ করান। শিশুদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন। কুন্তির আথড়ায় মাটি মাথেন। তারপর গঙ্গার জলে স্নান করতে নেমে সাঁতার কেটে চলে যান গঙ্গার মাঝখানে। তারপর একদিন কেশবানন্দকে ডেকে বলেন, তলব এসেছে কেশবানন্দ। এর অর্থ কেশবানন্দ জানেন। কংসারির থাজনাখানায় থাজনা বাকি পড়েছে।

স্থাদেশে মাধবানন্দ কংসারির, ভাণ্ডারে এক থাস তছবিল খুলেছেন। বংসরে সেথানে সোনায় রূপায় নগদে বিশ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। সেই টাকা জমেই আসছে। কুরুক্তেরে আয়োজন ছাড়া এ তহবিল থেকে থরচ হয় না। ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ কুঠির যে সব কর্মচারী নিজেরা গোপন ব্যবসা করে, তাদের মারফত বন্দুক বারুদ কেনা হয়। দালালি করে আরমানী বানিয়ারা। ওদিকে পটিনায়, এদিকে চন্দন-লগর ছগলীতে মাধবানন্দের গৃহী শিশ্যেরা কিনে পাঠায়। ছগলী কলকাতা অঞ্চলের বৈষ্ণব বণিকদের, বাংলার রুকুনপুর মালদহ রঙপুর জেমো বাঘভাঙার জমিদার থেকে বিহারের পালোয়ান সিং স্বেতাব রায়, এমন কি রাজা রামনারায়ণ রায় প্রভৃতি বিশিষ্টদের ঘরেও মাধবানন্দের পরিচয় এবং প্রভাব পৌছেছে। তারা ভক্তি করে। সাহায্য করে। বিশেষ করে পূর্ণিয়ার শক্তিশালী রাজকর্মচারী অচল সিং। শুধু ধর্মজীবনেই নয়, কর্ম-জীবনেও সম্পর্ক আছে পরস্পরের মধ্যে। উত্তর-ভারতে অযোধাার নবাবের রাজ্যে রাজেন্দর গিরি মহারাজ যেমন নবাব সাহেবের সকল অভিযানে ডান হাত, পাশে থেকে যেমন যুদ্ধ করেন, ততথানি ঘনিষ্ঠভাবে না-হলেও অনেকটা সেই ভাবেই মাধবানন্দজী এঁদের ছ-তিনজনের সঙ্গে জড়িরে গেছেন। এঁদের প্রতিঘন্দী জায়গীরদার এবং জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে মাধবানন্দ তাঁর শিশুদের নিয়ে অস্ত্রধারণও করে থাকেন। এর জন্ম যে টাকা প্রণামী পান, তাই জমা হর কংসারির থাজাঞ্চিথানার। বংসরাস্তে হিসাবে এই জমার পরিমাণ বিশ হাজারের কম হলে সে টাকা পূরণ করতে হর এবং পূরণ হর ব্যবসারী বা জমিদার বা জোতদারদের কাছ থেকে। এর জন্ম এক পৃথক সেরেস্তা আছে কংসারির কাছারিতে। এই এলাকার জিমিদার জোতদার এবং বানিয়াদের অস্তায় জনরদন্তির থতিয়ান থাকে। সেই থতিয়ান দেখে তাদের উপর জরিমানা হয়। এবং একদিন সশিশ্ব থেরিয়ে পড়েন এই জরিমানা আদারের জন্ম।

'হরি-হর' 'হরি-হর' ধ্বনি ওঠে। ধ্বজা ওড়ে, পতাকা ওড়ে, ঘোড়া বরেল গাড়ি সাজসরঞ্জাম নিয়ে বের হন। দণ্ডিত জমিদার জায়গীরদারের এলাকায় গিয়ে বসেন। সাধারণ প্রজা গৃহস্থদের বাদ দিয়ে তহলীল কাছারি অধিকার করে তহবিল বাজেয়াপ্ত করেন। সাধারণ লোককে দিতে হয় সিধা—চাল-আটা-ঘি-সবজী-তৃধ। যেথানে যে-কদিন তাঁর পড়ে সে-কদিন গ্রামের সমস্ত ঘরে অরন্ধন; ভাগুরা খুলে দেন মাধবানন্দ্জী। মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ হলে জরিমানার পরিমাণ বাড়ে। মাধবানন্দ আজও কোন ঠাই থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরেন নি। ফিরে এসে মাধবানন্দ ল্টিয়ে পড়েন কংসারি এবং ফল্রের সম্মুথে।

জানামি ধর্মং ন চ নে প্রবৃত্তিং জানামাধর্মং ন চ মে নির্ত্তিং।
ত্বা হ্বীকেশ হাদিছিতেন যথা নিযুক্তোহন্মি তথা করোমি।
জয় হ্বীকেশ ! আনন্দ রাথো। আনন্দ রাথো।
কেশবানন্দকে তেকে বলেন, খুলে দাও ভাগোরা। ভাগোরা গোলা হয়।

ঢেঁড়া পড়ে—ভাণ্ডারা! কংসারির প্রসাদ নেবে এস। অবারিত দার। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। পরিতৃথ্যি করে খেয়ে তারা ধ্বনি দের, জয় হরি-হর! জর কংসারি! জর শুরু মহারাজ!

— আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! বলে হাত তুলে মাধবানন্দ গ্রহণমূক্ত স্থর্বের মত প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন। এই বারো বছর এমনি ভাবে জীবনে চলেছে গ্রহণ এবং গ্রহণমূক্তি। আবার লাগে গ্রহণ।

নৌকায় ছইয়ের মধ্যে শুরু হয়ে বলে ছিলেন মাধবানন্দ। হাতে একথানা ছুরি। বৃকে একটা দত্ত ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেদনায় যন্ত্রণায় অনেক সময় এই অবস্থায় কাটে, তাই নিজের হাতেই ক্ষতটার স্ষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও জাগ্রত চৈত্ত ফিরছে না। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সং মিথ্যা, সব মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, তপস্থা মিথ্যা, সিদ্ধি মিথ্যা— সব মিথ্যা। নান্তিত্বের মধ্যে সব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই আঘাতের যন্ত্রণাতেও মন জাগ্রত হচ্ছে না। অতি কটে চোধ ফেলছেন, সে চোধ আবার বন্ধ হয়ে আসছে। ছেলেবেলায় এক সাপের ওঝার কাছে এই পদ্ধতি শিখেছিলেন। তাকে গোখুরায় কামড়েছিল। সে নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছিল। দেখেছিলেন সামনে একটা জ্বলস্ত অঙ্গারের কড়াই রেথে কতকগুলো আধখানা-করা কেলেকোঁডা ফল শিকে বিঁধিয়ে তেল মাথিয়ে ওই আগুনে গ্রম করে তাই দিয়ে বুকে ছাাক। নিচ্ছিল। বিষের আচ্ছয়তায় চেতনা নিবে-আসা প্রদীপের মত ন্তিমিত হয়ে আসতে আসতে আবার যেন জবেল উঠছে। ওই ছ্যাকার যন্ত্রণায় চমকে উঠে আবার কিছুক্ষণের জন্ম বিষের প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করছে। সে বেঁচে ছিল এতে। মাধবানন্দও তাই করেন। ফলও পান কিছু। কিছু এবার যেন এ বিষের প্রভাবে মৃত্যুর গাঢ়তা। যন্ত্রণাও তার মনকে চেতনাকে চকিত করতে পারছে না। অন্তর চিৎকার করছে, এ গ্রহণ থেকে মৃক্তি দাও। নর, মৃত্যু দাও।

নৌকা চলেছে, আখিনশেষের ভরা গলা। ছুপাশের তীরভূমি বর্গান্তে মহালন্দ্রীর সম্বেহ অঞ্চলের মত পুষ্পে ফলে পল্লবে পত্তে সমৃদ্ধ; বর্ণ তার কিছু বর্ণবর্ণ, বাকীটা ঘন সবুজ। আভ ধাত্যের ক্ষেতগুলি সোনার বরন পাকা ফসলে ভবা; হৈমন্তী ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দিগন্ত পর্যন্ত গাঢ় সব্দ্র ধানের শীষগুলি সন্ত সন্ত বের হচ্ছে; ওরই উপর দিয়ে বয়ে আসছে বাতাস, ধানগুলি তরঙ্গারিত সম্দ্রের মত দোলা থাছে; বাতাসের সর্বান্ধে ধানের শীষে বা শেতকণিকার মত ধাত্যপূষ্প তারই গন্ধ; বাসমতী, গোবিক্ষান্তাস, কনকচ্র, খুদিখাসা প্রভৃতি হুপদ্ধি ধানের চাষ যেখানে, সেধানে বাতাস যেন নারারণ-মন্দিরে অর্য্যবাহিনী লক্ষীর অর্য্যথালিকা-বাহিকা সহচরীর মত মধুর পবিত্র। তটে তটে দিয়ারাভূমি জাগতে শুরু করেছে। গন্ধার জল শুল, এখনও স্বচ্ছ হর নি। বহর চলেছে কখনও পাল তুলে, কখনও গুল টেনে। উজানে যাত্রা। কোন নৌকায় সেবকেরা জন্ধন গাইছে। কোন নৌকায় শাস্থপাঠ হচ্ছে। কোন নৌকায় দেশতার পূজালাইছে। কোন নৌকায় দেশতার পূজালাকার আব্যোজন চলছে। একটি নৌকার কেশবানন্দ শুমানন্দ প্রভৃতি প্রধানেরা আলোচনা করছেন। মাধবানন্দের নৌকায় মাধবানন্দ বসে আছেন জন হরে; তাঁর সেবার জন্ম তুজন সেবক বাইরে বসে আছে। দীর্য ধনজন্দতে ধবজা উড়ছে; ধ্বজনও ধরে দাঁডিয়ে আছে এবজন প্রব্যক্ষক।

গঙ্গান্ধ এই সময় থেকেই নৌকার ভিড় বেশী। বর্ধার প্রবল শ্রোভ বক্সা ঝড় প্রভৃতির কাল চলে গেল। এইবার ভীমাভয়রনী হবেন বরদা প্রসন্ধময়ী। প্রচীনযুগে এই সময়েই নদীপথে রাজারা বের হতেন দিখিজ্ঞয়ে, আজ দিখিজ্ঞয়ের দিন নেই কিন্তু বণিকেরা আজ বের হয় বাণিজ্ঞা; পুণাকামীরা বের হয় তীর্থদর্শনে। এই সময় থেকেই শুরু হয় মেলার। এই তো শোনপুর হরিহরছত্তে রাস-পূর্ণিমান্ন মেলার আরস্ত, মেলা শেষ আয়াতে রথবাত্তান্থ নীলাচলে। কিন্তু এবার গঙ্গার বুকে নৌকার ভিড় নেই। ঘাটগুলি ফাঁকা। স্থানীয় এ-ঘাট ও-ঘাট, এপার-ওপার যাওয়ার নৌকা ছাড়া লম্বাপাড়ির নৌকা বড় দেখা যায় না। লগ্নপাড়ির নৌকার একটা আলাদা গড়ন আছে, যাওয়ার ভলির মধ্যেও বিশেষ তও আছে। লম্বাণাড়ির নৌকার মধ্যে তু-তিন দফার ইংরেজ ফিরিলীদের নৌকা এবং এক দফা নবাবী নৌকার ছোট বহর ছাড়া আর কোনগু বহর দেখা যায় নি।

পলানীর যুদ্ধের পর এখনও চার মাস পুরো পার হর নি। পলানীয

পাপের জেবই এখনও মেটে নি। মীরন এখনও অবাধে হত্যাকাও চালিরে ৰাচ্ছে। নানান স্থানে নানান আরোজনের গুজব বাতাসে তেসে বেড়াচ্ছে। উংকণ্ঠায় মীরজাফর আফিংয়ের মাত্রা চড়িয়েছে। থাস মুরশিদাবাদ শহরে রাজা হুর্লভরাম নাকি হিন্দু আমীরদের নিয়ে জোট পাকাচ্ছে। আলিবর্দী-বেগম সিরাজের ভাতৃষ্পুত্র বালক মির্জা মেহেদীকে খাড়া করে মসনদ দথলের চেষ্টায় আছেন। ঢাকায় এক দল নবাব সরফরাজের দ্বিতীয় পুত্র আমানী থাকে নবাব করবার জল্পনা-কল্পনা করছে। পাটনার রাজা রামনারায়ণ রায় আজও মীরজাফরের বশুতা স্বীকার করেন নি। ফরাসী জাদরেল মদিয়ে ল' বাংলায় আদতে আদতে পলাশীর থবর পেয়ে পথ থেকে ফিরে গিয়ে অযোধাার নবাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ক্লাইভের ছকুমে গোরা দিপাই আর তেলেদী পণ্টন আজ এথানে কাল ওথানে ছুটোছুটি করছে। পূর্ণিয়ার অচল সিং নবাবী প্রভূত অস্বীকার করে মাথা চাড়া দেবার আয়োজন করছে। গোটা দেশটায় যেন থমথমে ভাব। কেউ ঘর থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। গন্ধাই শুধু ভার আপন গতিতে চিরকালের ধারায় যেমন চলেন তেমনি চলেছেন। কিন্তু কল-क त्वारम कि तम है अक है कथा ? ना, अन्न कथा वन हिन ? माध्यान तम मतन হচ্ছে, সেই একই কথা বলছেন। কথাই নয়, অর্থহীন ধ্বনি শুধু গতিশীৰ জনস্রোতের শব্দ। ভাবতে ভাবতে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি। ধ্বনিময়ী গতিমরী গঙ্গাও যেন ওই অন্ধকার নান্তিত্বের মধ্যে মিশে যাচ্ছেন। অর্থহীন— সব অর্থহীন।

অকস্মাৎ নৌকার গতি মন্থর হল। বাইরে কেশবানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা যাছে। সম্ভবত বিশ্রামের জন্ম পূর্বনিদিষ্ট কোন ঘাট এসেছে— কোন গঞ্জ। এখানে একদিন বিশ্রাম করে আবার যাত্রা শুরু হবে। এখানে মঠের শিশ্র সেবক ভক্ত আছে। তারা আসবে, প্রণামী দেবে। প্রণাম করবে। কিন্তু কোন্ ঘাট ? রাজমহল, শকরিগলিঘাট পার হয়ে এসেছে নৌকা। তারপর বিশ্রামের কথা স্থলতানগঞ্জে। গৈবীনাথ দর্শন করে মুদ্দেরে গিরে বিশ্রাম। তা হলে স্থলতানগঞ্জ এল ?

ঠিক এই মুহুর্তেই শিঙা বেজে উঠল।

শিঙাধনিতে সংকেত জানানো হচ্ছে, নৌকার গতি সংষ্ঠ কর। হাশিরার, রোখ্না হায়। রোখ্না হায়! না, তা হলে রাজমহল নয়। কোন নৌকাতে কোন একটা কিছু হ্বটনা ঘটেছে। এ সংকেত তীরে ভিড়াবার নয়; এ সংকেত হ্বটনার জন্ম নৌকাগুলিকে হাশিয়ারের সজে গতিরোধ করবার সংকেত। হ্বটনা! কী হ্বটনা? হয়তো কেউ জলে পড়েছে। হয়তো কোন নৌকা বিপল্ল হয়েছে। হলেই হল। অর্থহীন ধ্বংস স্প্রের নিয়ম। একটু বিষয় হাসি তার মুধে দেখা দিল। কিছু সেহাসি পর-মুহুর্তেই বিলুপ্ত হয়ে গেল, নৌকাখানা অকমাৎ হলে উঠল—কেউ বা কিছু লাক দিয়ে যেন পড়ল নৌকার উপর। অসতর্ক মাধবানন্দ নৌকার ছইয়ের গায়ে আছড়ে পড়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আক্মিক আঘাতে তিনি বিরক্তি এবং ক্রোধে চিংকার করে উঠলেন, আঃ।

— কে মূর্থ ? কৌন্ম্রথ ? বলে উন্নত কোধে উঠে দাঁডালেন।
সেই মূ্ছ্র্তেই বাইরে উদ্ধৃত ক্রুদ্ধ কঠন্বরে কে বলে উঠল, রোখো নায়।
কাঁহা হায় উ বেইমান কাফের ফ্কির ?

মৃহুর্তে মাধবানন্দের ক্রুদ্ধ অন্তরাত্মা উর্ধ্ব আকাশে উদাস পরিক্রমান্ধ সক্ষরমাণ চিলের পাথা গুটিয়ে পৃথিনীর বৃক্তে এক মৃহুর্তে নেমে পড়ার মত ছোঁ দিরে নেমে এল। তিনি তুলে নিলেন পাশে-রাথা তরে দ্বালানা। দরজার মৃথে সেই ক্ষণটিতেই দেখা দিল এক দীর্ঘকায় পাঠান। সেই মৃহুর্তেই আবার নৌকাথানা ছলে উঠল, আবার কেউ লাফিয়ে পড়েছে নৌকার উপর। সেই দোলায় দবজার মৃথে পা হড়েক পাঠান পড়ে গেল। মাধবানন্দ ফিরেছেন, তুরস্ক ক্রোধে দৃঢ় হরে দাড়িয়েছেন। তিনি স্থাবার উপর। করলেন না। লাফ দিরে তার বৃক্তের উপর পড়েত তরোয়ালের অগ্রভাগ সজোরে বিদ্ধ করে দিলেন। বাইরে বন্দুক পর্চ্চে উঠল। কেউ একজন পড়ল নৌকার পাটাতনের উপর। মাধবানন্দ বলে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, পাশেই একখানাছিল। ছিপ থেকে নবাবী কোতোয়ালী জ্মাদার চৌকিদার নৌকার উঠবার চেটা করছে। কিছু দ্বে আরও তুগানা ছিপ। এপাশে তাঁর নৌকার বহুরের তুথানার উপর সারি দিয়ে দাড়িয়েছে সন্ধ্যাসীর দল, হাতে বন্দুক

তীর ধন্ত্ব সড়কি। নেতৃত্ব করছেন কেশবানন্দ। পাটাতনের উপর গুলি থেয়ে পড়েছে তাঁরই একজন সেবক। মাধবানন্দ জ্বলে উঠলেন বৈশাথের আগুনের মত। ছিপে নবাবী সিপাহীদের একজন বন্দৃক গাদছে, একজন তুলছে; মুহুর্তে তিনি চিৎকার করে তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাশের ছিপটার। হরি-হর! হরি-হর! লগন আ গয়া।

ই্যা, লগ্ন এবার সত্যই এসেছে। নবাবী শক্তির সঙ্গে এই প্রথম সংঘর্ষ। সামনের জমাদারটার মাথার উপর পড়ল তাঁর উগ্নত তরবারি। কিছু সেই মূহুর্তে একটা নিষ্ঠুর আঘাত অন্তত্তব করলেন। বন্দুকের গুলি! আঃ! সেই নান্তিছ, মানসলোক-দর্শন-করা সেই বিচিত্র সন্তা আজ বাস্তবে দিবালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে আসছে। এক রুফ্-অবগুঠনারতা রহস্তমন্ত্রী—তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু নিদারুণ হতাশার আতক্ষের মন্ত ঝাপসা,—তার আঁচল দিয়ে সব কিছু মূছে দিছে। ত্যুলোক ভূলোক ভূলছে, উল্টে যাছে।

টলে তিনি জলে পড়ে গেলেন। বন্দুকের শব্দ উঠল, বছদ্রের যুদ্ধক্ষেত্রের শব্দের মত।

গন্ধার জলস্রোতের মধ্যে সেই রহস্তময়ী যেন কারা গ্রহণ করছে—বর্ণহীন গন্ধহীন শব্দহীন গতিহীন নান্তিত্ব। স্পর্শন্ত নেই। গন্ধার জলের শীতলতাও নেই; স্পর্শাতীত হয়ে বিলুপ্তিতে মিশিয়ে যাচ্ছে।

না, তারপরও তো রয়েছে। অমৃতলোক।

কাঁসর-ঘন্টার শব্দ উঠছে। তাঁকে ঘিরে মৃত্ প্রসন্ন প্রদীপের আলো এবং মধুর ধৃপগন্ধ। তারই সঙ্গে ললাটে একটি স্নিম্ন কোমল শীতল স্পর্শন্ত অহ্নত্তব করলেন। মাথার শিয়রের দিকে চেয়ে তিনি শিউরে উঠলেন, ঠিক তাঁর কল্পনার মত একটি মৃতি। কালো-কাপড়-পরা একটি মৃতি তাঁর ম্থের দিকে ঝুঁকে তাকিরে রয়েছে, কিন্তু সে মৃথ ঘন এলোচুলের রাশিতে ঢাকা। কালো চুলের ভগাগুলি তাঁর কপালের উপর ঝুলছে, যেন স্পর্শন্ত করছে। এ কি সেই ?

এ সবই যেন স্বল্ল কয়টি মূহুর্তের জ্ঞা। কয়েক মূহুর্ত পরেই স্থাবার

সেই নান্তিত তাঁকে চারিদিক থেকে বৃত্তাকারে ঘিরে চৈতক্তমগুলের কেন্দ্র-বিন্তুতে এসে নিরন্ধু হয়ে মিলিত হল।

নীলাম্বরী-পরা রূপসী একটি মাধবানন্দের শিয়রে বসে ছিল। সে-ই ঝুঁকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল একাগ্র দৃষ্টিতে। বারেকের জ্বস্থ মাধবানন্দের চোখ-মেলে-চাওয়া তার একাগ্র দৃষ্টি এড়ায় নি। মাধবানন্দ আবার চোখ বুজতেই সে ধীরে ধীরে মাধবানন্দের হাতথানি টেনে নিম্নে নাড়ী পরীক্ষা করলে। তারপর হাতথানি সম্ভর্পণে নামিয়ে রেখে পাশের ব্রিপদী থেকে খলমুড়ি ওম্ধ নিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে আঙুল দিয়ে জিডেলাগিয়ে দিলে। তারপর কয়েক ঝিয়ক ছ্ধ কোঁটা কোঁটা করে ধাইয়ে দিয়ে উঠে দাঁডাল।

এতক্ষণে যেন মেয়েটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হল। বসে ছিল, মুখের উপর চুলের ছায়া পড়েছিল তাই আকারে অবরবে অনবগুঠিত মুখের মাধুর্য ও ব্যশ্বনা যেন অর্ধ-অপ্রকাশিত ছিল।

মেয়েট অপরপা। কিশোরী অথবা যুবতী বুঝা যার না। কৈশোরযৌবনের সঙ্গমে স্থান করে উঠেছে যেন; এ মেয়ে সেই মেরে, যারা চিরকিশোরী চিরযুবতী একাধারে ত্ই। মুথে আশ্চর্য একটি ত্যুতি! স্থকোমল
সারল্যের মাধুর্য, বর্ষাসন্ধ্যার অর্ধবিকশিত জুইফুলে-ভরা জুইলতার মত
ভ্রুল নিম্বন্যতায় প্রসন্ন এবং পবিত্ত।

মেয়েট উঠে লঘুপদক্ষেপে ঘরের বাইরে এল। বাইরে বসে ছিল মাধবানন্দেরই সেবক প্রোঢ় গোকুলানন্দ। তাকে বললে, এখন তুমি গিয়ে বোস। ভাল আছেন। আমি ঘুমের ওষ্ধ দিয়েছি। অঘোরে ঘুমে আছিল থাকবেন। সেচলে গেল। গোকুলানন্দ শিয়বে গিয়ে বসল।

মাধবানন্দ আহত হয়ে জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সংশ সেও ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। উত্তর-ভারতে যমূনার তটভূমির এক গ্রামে তার জন্ম; তাদের বংশগত পেশা নৌকা চালনা। আগ্রার উত্তরে গাঁওঘাটে থেয়া নৌকা চালাত। গাঁওঘাট বিখ্যাত খেয়াঘাট।

বাদশা মহম্মদ শার সিপাহীরা তার বাপকে খুড়োকে কেটেছিল। মহম্মদ শা তথন বাদশা নয়, তথন ছিল শাজাদা রৌশন আথতার, আসছিল

वामना इत्छ। मिल्ली प्यत्क वस्त्रवा नित्य चामहिन क्रत्छभूत्रमिक्की। পুরনো বাদশাকে সৈরদ উদ্ধীর আর ভার ভাই খুন করে ভার লাশ গায়েব করে রেখেছে। নতুন বাদশা তক্তে বসিয়ে তবে ঢেঁড়া দেবে, পুরনো বাদশার ইস্তেকাল হয়েছে। তর সইছে না। বাদশাহী বজরার সামনে পড়েছিল ভার বাপের নৌকা। পথ ছাড়তে দেরি হয়েছিল। वामगारी कामार्थाम निभारी छनि ठानिएव त्नोरका पुविष्यरे काछ रव नि, তার বাপ এবং খুড়ো ভেমে উঠে সাঁতার দিতে শুরু করলে তাদেরও গুলি করে মেরেছিল। সে নৌকোতে গোকুলানন্দও ছিল; সে তথন বিশ বছরের নওজোয়ান। তার দম ছিল বহুত। ছেলেবেলা থেকে যমুনায় গাঁওঘাট থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত যেখানে কেউ একটা দামডি ফেলেছে জলে, সেইখানে তুব মেরে সে দামড়ি তুলে এনেছে। সে তুব-সাঁতার কেটে অনেক দূর গিয়ে উঠেছিল এক গাঁয়ে। সেখান থেকে কয়েক দিন পর ঘরে ফিরে আর ঘর পায় নি। তথু ঘর নয়, মা বহিন তার স্থা-সাদী-করা বহু কাউকে পার নি। সেই থেকে সে বেরিয়েছে পথে। খুঁজতে বেরিরেছিল সকল খেরামাঝির সেরা সর্দার মাঝিকে, যে সারা ছনিয়ার বাদশা থেকে ফ্কির-তামাম লোককে এপার থেকে ওপারে পার করে।

কত জনকে গুরু ধরে কত মঠ ঘুরে শেষে এসেছিল মাধবানন্দের আশ্রার। মাধবানন্দের সাধনা, তাঁর সিদ্ধি, তাঁর শক্তি দেখে সে নিশ্চিত আশাস পেয়েছে—সে পাবে, যাকে খুঁজছে তাকে সে পাবে। গুধু তাই নয়, গরিবের উপর অত্যাচার, আমীর-ওমরাদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে মাধবানন্দের লড়াই দেখে আশস্ত হয়েছিল, একদিন-না-একদিন যে কালাপোশ ত্জন গুলি ছুঁড়ে তার বাপ-খুড়োকে মেরেছে তাদের এবং যে বাদশার জন্ত তার বাপ খুড়ো নৌকো ঘর বাড়ি মা বহিন বহু সব গিয়েছে তারও সক্ষে একদিন মুখোমুখী দাঁড়াতে পারবে। সেই দিন-ত্নিয়ার খেয়ামাঝির বাদশাহের দরবারে সে দিন সে ফরিয়াদ করবে। গুরু তার উকিল। সে সেই গুরুকে পড়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে খাঁপিয়ে পড়ে তাঁর অচেতন দেহখানা নিয়ে জলের তলেই উজানের বদলে ভাটির টানের সক্ষে সাঁতারের টান মিলিয়ে বন্দুকের এলাকার বাইরে গিয়ে ভেসে উঠে

কিনারার পৌছেছে। তারপর কংসারির দয়া, গুরু মহারাজের অসীম পুণ্য-বল, সেই ঘাটেই সন্ধ্যায় স্নান করতে এসেছিলেন এই ভক্তিমতী বাশরী-গুরালী প্যারেবাঈ। লোকে বলে, বাশরীওয়ালী প্যারেবাঈ বাশরী বাজার আর বৈকুঠধামে নন্দলালা আকুল হয়ে গুঠেন। নেমে আগতে হয় তাঁকে।

আরও ধবর মিলেছে। প্যারেবাঈ সব ধবর যোগাড় করেছে। মঠের নৌকাগুলোর তিন-চারগানা ভূবেছে। বাকী সব ভেসে চলে গেছে ভাটিতে। নবাবী ছিপ একখানা ফিরেছে, বাকী কথানা গতম। সন্ন্যাসীরা नवावी हिल इंग्रिय किनाबाब डिटर्ड लोटका छएछ निरंव नवन्त नाहाछ-জঙ্গলের পথে লুকিয়ে পড়েছে। তারা কোন্ মুখে কোন্ পথে চলেছে তার খবর ঠিক মেলে নি, কিন্তু তারা গঙ্গার কিনারা ধরে হাঁটছে না এটা বিলকুল ঠিক। কেশবানলজী বেয়কুক নন। সামনে মৃঙ্গের পর্যস্ত এবং পিছনে রাজমহল পর্যন্ত প্রত্যেক নবাবী থানা-ঘাটি ছালিয়াবী নজর রেখেছে গলার বুকের উপর এবং গলার তুই পারের পথঘাটের উপর। কংসারির সেবকদের পাকড়াও করবার হুকুম জারি হয়েছে। আশ্রম ছেড়ে যাত্রা করে উজান ঠেলে এই পর্যন্ত আসতে যে সময় লেগেছে তারই মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। থবর তাঁরা পান নি। পৃণিয়ার অচল সিং গুরু মহারাজের ভক্ত শিষ্য। তিন-চার দফায় অচল সিংয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে ওক মহারাজ পূর্ণিয়ার আশপাণের জায়গীরদার জমিদারদের 'পাপ করমে'র জন্ম জারমানা আদায় করে ভগবানের খাজাঞীখানায় খাজনা দাগিল করেছেন। এই ধবর ছাপি त्नहे। किन्क ज्थन नवावी मत्रवादा थाकना माथिन कन्नत्नहे अव भिटि গেছে। এবার অচল দিং গুরুর তুকুম অমাতা করে 'হঠকরা'ব কাজ করে নিজে ডুবেছে গুরুকে গুরুবে ডুবিয়েছে। মীরকাফরের বিরুদ্ধে চারিদিকে নানান গুজব। অসম্ভোষ সারা বাংলা জুড়ে। সব থেকে অসহ হয়েছে নৃতন নণাবজাদা মীরনের অত্যাচার। অচল সিং গুরুর আদেশ অমাতা করে হাজির আলি মনসবদারতে নিয়ে পূণিয়ার নতুন ফৌজদার মীরজাফরের দলের লোক মোহন সিংল্লের বেটা সোহন সিংকে হটিলে ফৌজদার হলে বলে ফভোলা

আরি করেছে –থাজনা দেবে সে তাকেই, যে বাদশাহের কাছে স্থবেদারী क्त्रमान भारत। ज्यानिवर्धी-व्याप्त तानक मिर्का प्याट्मीत ज्ञा क्राप्तमानत ८६ क्षा कत्रहरून- এ अक्व ठाविनित्क छिएएयछ। अनित्क भाष्ट्रनात्र बाका রামনারায়ণের হাবভাব ভাল নর। অযোধ্যার নবাব নাকি আসছে মসিয়ে ব'কে নিমে বিহার দখল করতে। মীরজাফর আর থাকতে পারেন নি। এসে হাজির হরেছেন রাজমহলে। ওদিকে মীরন বাচ্চা-ছেলে মীর্জা মেহেদীকে খুন করেছে। কেউ বলছে, দিরাজ-নবাবের মা আমেনা বেগমকে নৌকা সমেত জলে ডুবিয়েছে। ক্লাইভ আসছে কলকাতা থেকে। মীরজাফরের সক্ষে যাবে বেহার। রাজমহলে নবাব মীরজাফর তার পেয়ারের লোক थाराम रहारमनरक भूनियात रमोक्रमाति मिरय अठन मिश्रत्यत विकृत्स भाठिरयटह । ব্রাজমহল থেকে শকরিগলিঘাটে পৌছে খাদেম হোসেন পাকড়াও করে অচল সিংরের এক লোককে। এই লোককে অচল সিং পাঠিয়েছিল গুরু মহারাজের কাছে। সে অমুনয় করেছিল গুরুকে। এ সময় কুন্তে না গিয়ে তার এই লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্ম আরজি করেছিল। হুর্ভাগ্য অচল সিংরের, এবং শিশ্তের হর্ভাগ্যে গুরুর হর্ভাগ্য। লোক পথে অহস্ত হরে দেরি করেছে, মাধবানন্দ শকরিগলি আসবার সময় বরাবর পৌছতে পারে নি। মঠের নৌকা শকরিগলি ছাড়বার চার দিন পর এসে পৌছেছে। विठि পড়েছে খাদেম হোসেনের হাতে। খাদেম হোসেন সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছিল ছিপ। খাদেম হোসেনের ছকুম ছিল বরাবর মূঙ্গের যাবার। সেখানে কেল্লা থেকে লোক লম্বর পণ্টন নিয়ে চারিপাশে ঘিরে এই হিন্দু ফ্কিরদের গ্রেপ্তার করে নবাবজাদা মীরনের কাছে পাঠাবে। না পার. ভামাম ফ্কিরকে গুলি করে মেরে রান্ডার গাছে লটকে রাথবে। কিছ দারোগা বাহাতুরি আর ইনাম পাবার লোভে পথের মধ্যে নিরন্ত সল্লাসী দেখে আক্রমণ করবার লোভ সামলাতে পারে নি।

বক্ষা করেছেন দিনত্নিয়ার মালিক, সকল রাজার রাজা, সব বাদশাহের বাদশাহ ভগবান কংসারি আর গুরু মহারাজের তপস্থা। ব্রজনাথ, নন্দলাল, কিষণলালার সাক্ষাৎ সেবিকার মত এই বাশরীওরালী প্যারে গোসাইন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির ছিল গুরু গোসাইয়ের জক্ষ। গোকুলানন্দ

ছানে, বাঁশরীওয়ালী মুখে স্বীকার করুক আর নাই করুক, এর জন্ম ইশারা দে পেয়েছিল, সে সাক্ষাতেই হোক আর স্বপ্লেই হোক।

মান্দারে মধুস্দন। সেই মান্দার পাহাড়ে বাঁশরীওরালী প্যারের রাধা-গোবিন্দজীর মঠ।

পৌষ-সংক্রান্তিতে মান্দারে মধুস্দনজীর বাৎসরিক পর্ব। সামনে রাসপূর্ণিমায় রাধাগোবিন্দজীর রাস্যাত্তা। সে সব রেখে এবার সে বের হয়েছিল
তীর্থ-পরিক্রমায়; রাসপূর্ণিমায় শোনপুর গগুক গঙ্গা আর শোনসঙ্গমে
আন করে হরিহরনাথের উপর জল চড়াবে, ভজন শোনাবে, তারপর
যাবে পূর্ণকুন্তে প্রয়াগধাম। সেখানে গঙ্গা-যম্না-সরস্বতী-সঙ্গমে আন করে
সেই জল নিয়ে যাবে বৃন্দাবন গোকুল। তার তপস্থার যোল বছর পূর্ণ
হয়েছে এবার। সেই জন্ম চলেছিল সে ভাগলপুর হয়ে সড়ক ধরে স্থলতানগঞ্জ। সেখানে আন সেরে মুক্সেরে গিয়ে নৌকা নেবার কথা। পথে
সক্ষ্যার মুখে রাত্তের জন্ম ডেরা ফেলে বাঁশরীওয়ালী এসেছিল গঙ্গার ঘাটে
সাব্যের আন করতে। গোকুলানন্দ গুরুর অচেতন দেহ নিয়ে ঘাটের
কাছেই একটা গাছের বেরিয়ে-পড়া শিকড় ধরে হাঁপাচ্ছিল। দাঁড়াবার
ক্ষমতাও ছিল না। বাঁশরীওয়ালী সেই ক্ষণটিতে ডুব দিয়ে উঠেছিল ঠিক
গঙ্গা থেকে ওঠা কোন দেবতার মত। গোকুলানন্দ চিংকার করে উঠেছিল,
বাঁচাও, মাতান্ধী, বাঁচাও।

বাঁশরীওয়ালীর লোকজন ছিল ঘাটের উপরেই। বাঁশরীওয়ালীর ডাকে তারা ছুটে এসে তুলেছিল তাদের তুজনকে। আঃ, বাঁশরীওয়ালী সাক্ষাৎ দেবী। ঘাটের উপর গুরু মহারাজের অচেতন দেহ দেখে সে কী করুণা! ধীরে দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে তার সে কী নিঃশব্ধ রোদন!

"জয় রাধারাণী! জর রাধারাণী! শ্রামপিরারী, তোমার হতুম আর বাঁশরীওয়ালীর নসীব!"

সমস্ত বৃত্তাস্ত শুনে গুরু মহারাজের অবস্থা নিজে পর্থ করে দেখেছিল বাঁশরীওরালী, অনেক ওযুধ জানে, নাড়ী দেখতে জানে। নিজে দেখে ওই পাঁরের কাছের একজন কবিরাজকে ভেকে দেখিরে বলেছিল, কেরো, মুদ্ধের না, চল মান্দার।

সঙ্গেব লোকজন বিশ্বিত হয়েছিল, কিন্তু সে দিকে জ্রাক্ষেপ বাঁশরীওয়ালীর ছিল না। ছকুম রাধারাণীর আর নসীব বাঁশরীওয়ালীর আর গুরু মহারাজের প্রাক্তন—গোকুলানন্দ ভেবে দেখেছে, এ যেন 'তিরবেণী'র টান। লোকের ব্যাবার ক্ষমতা নেই; আর না ব্যো তাদের বিশ্বয় হলেই বা কার কী যায়-আসে, ত্নিয়ারও আসে-যায় না, বাঁশরীওয়ালীর তো নয়ই। এবং বাঁশরীওয়ালীর যা ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কেন, কী জ্ঞা—এ নিয়ে তকরার বাঁশরী-ওয়ালীর লোকজনের মধ্যে নাই।

বাশরীওয়ালী কাঁদে, বাঁশরীওয়ালী বংশী বাজায় রাধা-গোবিন্দজীর সামনে, বাঁশরীওয়ালী ভজন গায়, বাঁশরীওয়ালী নাচে; বাঁশরীওয়ালী ধুলোয় গড়াগড়িদের; বাঁশরীওরালী এক-একদিন ভিথ মাগতে বের হয়, কোনদিন বাঁশরী-ওয়ালী মনোহর সজ্জার সাজে, সে সজ্জা খুলে বিলকুল বিলিয়ে দেয়; কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। জিজ্ঞাসা করলে ছোট্ট এতটুকু একটু হাসি, জোনাকির আলোর মতই জলে উঠে নিবে যার। ওতেই জ্বাব হরে যার। জবাব মানে তো মনের অস্বন্তি অখুশী ভাব, তা ওতেই মন খুশী হরে যার, সব খুঁতখুঁতি মিটে যার। বাঁশরীওয়ালীর সব হয় রাধাগোবিনজীর ইশারায়। ও জিজ্ঞাসা করতে নেই; ও বলতে নেই;

সেই বাত্রেই বাঁশরীওয়ালীর কথামত গুরুকে ডুলিতে চাপিরে পনের কোশ পথ এসে এই মঠে এসেছে। আজ আট দিন। আট দিন গুরু মহারাজ বেছঁশ হরে পড়ে আছেন। পূজার সময় ছাড়া সব সময় মাথার শিয়রে বসে আছে বাঁশরীওয়ালী। শহর থেকে বড় কবিরাজ এসেছিল। ভার কাছ থেকে সব বুঝে নিয়েছে বাঁশরীওয়ালী নিজে।

আজ বাশরীওয়ালী বলে গেল, চোথ মেলে চেয়েছেন, শোর হয়েছিল গুরু মহারাজের। বাশরীওয়ালী আরতির জন্ত গেল। আরতির পর বাশরীওয়ালীর ভঙ্কন। সারা গাঁয়ের লোক বসবে। বাশরীওয়ালী বংশী বাজাবে, ভজন গাইবে, নাচবে বাধারাণী-কিষণলাল মহারাজের সামনে। ওই তো বংশী বাজছে। কাঁদছে, মুরলী কাঁদছে। চোখে জল আসছে গোকুলানন্দের। বাংলা দেশে সে এ হার অনেক শুনেছে। কীর্তন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশাস ফেললেন মাধবানন।

গোকুলানন্দ সম্ভর্পণে একটু ঝুঁকে তাঁর ম্থের দিকে তাকালে। না, জাগেন নি। ঘুমের ঘোরেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। বেহুঁশের মধ্যেও একটা হুঁশ থাকে, সেই হুঁশের কুঠরির ভিতর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে এই বংশীর হার।

শেষ-কার্তিকের হিমেল রাত্রি, ঠাণ্ডা আসছে জানলা দিয়ে। স্থরও আসছে ওই পথে। গোকুলানন্দ উঠে গেল জানলাটা বন্ধ করবার জন্ত । ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বলে দিয়েছে বাঁশরীওয়ালী, কবিরাজও বলে গেছে— এই অবস্থায় ঠাণ্ডাকে সাবধান। সদি হলে বহুত মুশকিল হবে; বুকে সদি বসবে, কাশি হবে, জ্বর আসবে। হুঁশিয়ার!

জানলা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বাঁশরী বন্ধ হরে সারেকী বাজছে, মন্দিরা বাজছে ঠিনি-ঠিনি; এইবার ভজন গাইবে বাঁশরীওয়ালী প্যারে। বাইবে চাঁদনী ঝলমল করছে। সামনে কদিন পরে রাধারাণী আর ব্রজবালাদের নিয়ে কানাহিয়ালালের রাস-দর্বার বসবে; মলমলের ফরাস বিছানো হচ্ছে, মসলিনের ঝালর ঝুলাচ্ছে, নীলমণি দিয়ে মোড়া দর্বারের ছাদটাকে হুধ দিবে মাজাঘ্যা হচ্ছে, চক্রকাস্তমণির বাতির ভোমটাকে মুছে সাফা করছে, আর একদিকের আঙুল-তুই জায়গায় কালি পড়ে আছে, ওইটুকু মোছা হলেই—বাস, স্থগোল হয়ে একটা জ্বলম্ভ নিটোল মুক্রার মত টলমলে হয়ে উঠবে। শীত আসছে; কোক্লি-পাপিয়াগুলোর গলায় সদি জমবে; এই রাস-দর্বারে তারা গীত গেয়ে গোটা শীতের মত গান বন্ধ করবে; সেই রাস-দর্বারের গানের মহুড়া দিচ্ছে। একটা কোক্লি হঠাৎ কু-কু-কু করে ডেকে উঠল।

নাচত নাগররাজ ঝমর ঝমর ঝম; ঝমর ঝমর ঝম; রাসরস-রাহ্মিরা, পীতপট সাজ। হুন্দর শ্রাম, সথিগণ মাঝ। আ। হার । হার । ভজন শুরু করে দিয়েছে বাঁশরীওয়ালী। এইবার কিছুক্ষণ পরে গুঙুর বাজবে, ঝুম-ঝুম-ঝুম। ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম ঝুমু; ঝুমুঝুম।

জানলাটি বন্ধ করতে গিয়েও বন্ধ করা হল না গোকুলানন্দের; আবেশ লাগছে তার; দাঁড়িয়ে সে শুনতেই লাগল—

ঝুমুর ঝুমুর ঝমু নাচত নাগরী—
মুচকি মুচকি মধু হাস—
কিঙ্কিণী কঙ্কণ কিনি-কিনি কন-কন
গাওত সঙ্গীত আধ আধ ভাষ।

একটা আবেশে যেন জ্যোৎস্নালোক নিথর স্পন্দনহীন। আনন্দে পৃথিবী যেন হারিয়ে যাচ্ছে। গোকুলানন্দও আবিষ্ট হয়ে গেছে। সে ভূলে গেল জানলা বন্ধ করতে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, চলল ওই শব্দ লক্ষ্য করে।

গান থেমে গেল, ঘুঙ্র নীরব হল, তবু তার মোহ ভাঙল না। এসে দাঁড়াল রাধাগোবিনজীর মন্দিরের আঙিনার। লোকেরা চলে যাচছে। বাঁশরীওয়ালী আহিরিণীর পোশাকে সেজে নাচছিল, সে যেন মুছিত হয়ে পড়ে আছে বিগ্রহের সামনে, ছটি হাত তার বিগ্রহের দিকে প্রসারিত। কিছু মুছিত তো নয়। সে ফ্লে ফ্লে কাঁদছে।

অকন্মাৎ মাধবানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কেশবানন্দ! ভামানন্দ! চমক ভাঙল গোকুলানন্দের। সে ছুটল: গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দ জেগেছেন। চেতনা ফিরেছে। বাঁশরীওয়ালী প্যারে যে ঘুমের ওযুধ দিয়ে বলেছিল—অঘোরে ঘুমোবেন, সে ওযুধ তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে নি। হয়তো তার ভূল হয়েছিল। কঠোর ব্রন্ধচর্ষ এবং গভীর চিস্তা ও যোগের পথের সাধক মাধবানন্দের যে চৈতন্ত আঘাতের প্রচণ্ডতায় শুন্তিত হয়ে গিয়েছিল, আঘাতের প্রচণ্ডতার প্রতিক্রিয়ার কাল পার হওয়ার

সঙ্গে সজে সে জাগতে শুরু করেছে যখন, তখন সাধারণ মাত্রুষকে যে ওর্ধ যতথানি এবং যতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে বা রাখতে পারে, তাঁকে তা পারে নি। অস্তরের মধ্যে সেই আঘাতের ক্ষণের উৎকণ্ঠাও চৈতন্তের সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে। এবং তাঁকে উৎকৃষ্ঠিত করেই জাগিয়ে তুলেছে। তিনি ডেকে উঠেছেন, কেশবাননা। শ্রামাননা।

তারপর তাকিয়ে দেখছেন চারিদিকের পারিপাখিক। বান্তব জগতে ফেরবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। অপরিচিত পারিপাখিক। এ তিনি কোথার? জাগ্রতোন্মুখ চৈতন্মলোকে ঝক্কত অপরূপ সঙ্গীতধ্বনির রেশ যেন মনের মধ্যে বেজে চলেছে। ক্ষীণ অম্পষ্ট হলেও মনে পড়ছে, শিয়রে সেই এক রহস্তময়ীর মুখ। জীবনের সেই প্রশ্ন যা চিত্তলোকে অফুভব করছেন, তারই যেন সে প্রত্যক্ষ শরীরী রূপ। তার সঙ্গে এই স্বল্পণীপালোকিত, জনহীন, পরিচ্ছন্ন, অনুধ্ব ঘরখানির সম্পর্ক ঠিক আবিদ্ধার করতে পারছেন না। খাপরার চাল। মাটিতে নিকানো দেয়াল, বোধ হর কাঁচা ইটের। তিনি হয়তো মৃত্যুর ওপারের রহস্তপুর থেকেই বিচিত্র ভাবে কিরেছেন; এ গল্প তো অনেক শুনেছেন। এবং এখন তিনি মরজগতে ফিরেছেন এটা নিশ্চিত। কিন্তু এ তিনি কোথায় ?

—গুরু মহারাজ !

হাত জ্বোড় করে গোকুলানন্দ দাঁড়াল।

- -গোকুলানন ?
- —হাঁ পরভু, আপনা দাস সেবক।
- —এ আমি কোথায় গোকুলানন্দ? কেশবানন্দেরাই বা কোথায়? আমি তো গুলি থেয়ে জলে পড়েছিলাম! লড়াইয়ের কী হল? নবাবী কালাপোশেরা এমন করে হামলাই বা করল কেন? আর—

চারিদিক আবার একবার তাকিয়ে দেগে মাধবানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, আমি কোথায় ?

—বাঁচাইলেন বাঁশরীওরালী প্যারেবাঈ। ই আশ্রম উন্কি। রাধা-গোবিনজীর মন্দিল। আশ্রম। ভগবানকে সাথ উনকি বাত্তিত হয়। বাঁশরীওরালী প্যারে সাক্ষাৎ দেবী।

-वांभती खानी भारत्रवांने ?

—হাঁ, মহারাজ, বাঁশরীওয়ালী প্যারে। গোলাঁইন। বড়া ভারি মাতাজী। छक इस्त्र वरम दहेलन माधवानन। গোকুলাनन मव विवद्र वरल গেল। তিনি শুনলেন। মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন, নানান সিদ্ধান্ত, নানান विक्षियं এলোমেলো ভাবে আসছে যাছে। অচল সিং তাঁর উপদেশ অমাক্ত করে বিদ্রোহ করলে। কেন? বার বার তিনি বলেছেন, এখন নয়, লগ্ন আফুক। সে লগ্ন রাজনৈতিক ফ্রোগ সময় নয়, সে লগ্ন দেবতার নির্দেশ। সমস্ত-কিছুর উপর মধ্যে মধ্যে ওই নাস্তিত্বের ছায়া পড়ে মিখ্যা মনে হয়, তবুও তো সবার একসঙ্গে সময় নির্ণয় করে একযোগে অভাখানের একটা মূল্য আছে তবে? সন্দেহ তাঁর বরাবরই ছিল, व्याक त्वां रुप्त निःमत्मर रतन त्य, এर कामगीतनात किमात त्योकनात-এরা ধর্মরাজ্য-হিন্দুধরমশাহী মুধেই চায়, আসলে চায় না। সব চায় নিজের निष्कत स्याग। किनवानत्मत्रा काथाय त्रान ? की कत्रतन ? এता कि कि ? হাঁ, তিনি জানেন, তাঁর সে-জানা সন্দেহাতীত সত্য যে, তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব থেকে মৃক্তি পেলে ওদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে শুধু আক্রোশ, শুধু হিংসা; তার দকে লোভ, তার দকে কাম। ওঃ, গোপালানন্দের সে মূর্তি তাঁর মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বিহাতের মত একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তুনিয়ার জীবনের সমূত্রে যেন একটা তৃফান জেগেছে; कारन कारन जारन; मीर्घकान धरत इनिष्ठात स्थ-इ:थ, धर्म-अधर्म, ভानवामा-হিংসা-কিছু হারার না, একতিলও না; সব জ্বমা হয়, তারপর একদিন তৃফান ওঠে। দিল্লীর তক্ততাউস নিয়ে হানাহানির মধ্যে পাঠান আলাউদ্দিন वामगांत्र थूए एक क्या क्या वाल भारत भारत भारत भारत वाल कार्य थून कदात পाপ चाटह। नामित्रगाही, चावमानगाही, वर्गी हामामा नव এক তৃফানের পরের পরের ঢেউ। গোকুলানন্দ, গোপালানন্দ, কেশবানন্দের কারও জীবনের আগুন নেবে নি। সব আজ বাতাসে ছাই উড়িরে জেগেছে। পাপ-পুণ্য ধরম-অধরম সব একাকার হয়ে গেছে। আজ কিছুর আনে নেই। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কোধায় পাপ, কোধায় পুণা? की धर्म, की अधर्म? जांद नामत्न त्मरे नास्त्रिय, त्मरे किहूरे-ना यथन

এসে দাঁড়ায়, তিনি যথন নিজেই হারিরে যান, তখনকার কথা সামনে এসে দাঁড়াল।

জ্ঞাতুম্—ইচ্ছাই প্রশ্ন, সেই স্থাদম্য ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে গেল, উত্তর ভো মিলল না!

উত্তর নাই? প্রশ্ন জাগলে উত্তর খুঁজে বের করতে হয়, প্রশ্নের পথেই এগিয়ে চলতে হয়; কিন্তু পথ কোথায়? নান্তিত্বের মধ্যে? বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্পানহীন, স্থানহীন, কালহীন নির্থক্তা নান্তিত্ব।

না। না। তিনি যেন তার আকার দেখেছেন। ইা, দেখেছেন। কালো আবরণে ঢাকা অবয়ব, কালো কিছুতে ঢাকা মৃথ তারই মৃথের উপর ভাসছিল। ইা। তারপর যেন সঙ্গীত-ঝঙ্কার শুনেছেন। তা হলে কি তাঁর উত্তর দেবার জন্ম এদে সে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে মৃক দেখে হেদে ফিরে গেছে?

একটা কাতর আক্ষেপ সশবেদ তাঁর বুক যেন ফাটিয়ে বের হয়ে এল: আ:!

গোকুলানন্দ সভরে হু পা পিছিয়ে এসে ডাকলে, গুরু মহারাজ !

বাইরে থেকে এসে চুকল আশ্রমের একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব। মাধার শিয়রে এসে ত্রিপদ থেকে ওষ্ধ নিয়ে খলে মেড়ে সামনে ধরে দেহাতী হিন্দীতে বললে, খেয়ে নিতে মহারাজের ইচ্ছা হোক। মহারাজের শরীর তো এখন বহুত তুর্বল। এখন ঘুম দরকার। খুদ্ বাশরীওয়ালী প্যারেজী বলে দিলেন।

- —वांभवी अयांनी भारतकी ?
- —হাঁ মহারাজ।
- —কোপায় তিনি ?
- जिन यनिन त्य।
- তাঁকে বলো আমি তাঁকে নমো-নারায়ণ জানিয়েছি। দর্শন চাই। এখনি একবার যদি—
- তিনি এখন দেবতাকে শয়ন দিচ্ছেন। রাধার।ণী-গোবিনজীকে শয়ন দিয়ে চরণদেবা ক্রবেন। এখন তো আসতে পারবেন না।

—শয়ন দিচ্ছেন ? চরণসেবা করছেন ?

একটু হাসি দেখা দিল তাঁর মুখে। বিগ্রহের শয়ন, চরণসেবা ? কংসারির মুখের দিকে চোখের দিকে চেয়ে কত বিনিদ্র রাজি তাঁর কেটে গেছে।

— ওষুধ পিরেন গোসাইজী। খলটি সে এগিয়ে ধরলে।

খলটি হাতে নিয়ে মাধবানন বললেন, অবসরমত একবার মেহেরবানি করে আসতে বলো গোসাঁইনকে। আমার কথা আছে।

- —হাঁ। ই বাত আপনি বলবেন, ই তাঁর মালুম ছিল। বলিয়েছেন কী, কহনা—উনকে সামনা যানে কি প্যারেজী কি মানা হায়।
 - —মানা হার ? কার মানা ?
 - উ তো হামি জানে না। আপ শো যাইয়ে। নিদ যাইয়ে।
 - —কিসকে মানা ?

হাঁ, কার মানা? বাঁশরীওরালী প্যারেজী তো সকলের সামনেই মুখ খুলে বের হন, কথা বলেন, বিগ্রহের দরবারে হাজার হাজার লোকের সামনে ভজন গান করেন, নাচেন, তবে আমার সামনে মানা কেন? আপনার ঠাকুরের ? রাধাগোবিনজীর ?

বাঁশরীওয়ালী প্যারেকেই মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন; অবগুঠনারতা হয়ে বাঁশরীওয়ালী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। পরনে ঘাগরা। কাঁচুলির উপর ঘন নীল রঙের ওড়নার দীর্ঘ অবগুঠন। বেশভূষার কাপড় মূল্যবান নয়, সাধারণ দেহাতী তাঁতের। কিন্তু রঙের প্রাচুর্যে ঝলমল করছে। যার মধ্যে দেহাতের ফচি স্থাপট।

এ ঘটনা আরও দশ দিন পরের। এই দশ দিনের মধ্যে মাধবানন্দ অনেকটা সেরে উঠেছেন। শরীরে বল পেয়েছেন—চলে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু সংবাদ পেয়েছেন নবাবী ফৌজ চারিদিকে কংসারি মঠের সয়াসীদের থোঁজ করছে। কারণ কংসারি মঠের সয়াসীরা নৌকা ছেড়ে দিয়ে পাহাড় জবল ভেঙে আজ এখান কাল সেখান করে ফিরছে, তাদের চেষ্টা তারা গজাজী পার হরে ওপারে পূর্ণিয়া-কিষণগঞ্জের দিকে গিয়ে অচল সিংহের ভাঙা দলের সলে মিলিত হবে। পথে ছোটখাটো লুঠতরাজ নিতাই

ঘটছে। বিশেষ করে কয়েকটা সরকারী থানা দুঠ করে আগুন দিয়ে পুড়িরে দিরেছে, নবাবের অহুগত কয়েকজন ছোট জমিদার বড় জোতদারের কাছারী বাড়ি লুঠ করেছে। গিধৌড় থেকে ত্রিকৃট পর্যস্ত অঞ্চলে লুঠভরাঞ্ব করে সম্প্রতি তারা উত্তরমূথে ঘুরে বনের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। করেক**টা** মুসলমান-গ্রাম হাতী দিয়ে সমভূমি করে দিয়েছে। গিধৌড়ের রাজা এবং একজন মুদলমান জমিদারের তিনটে হাতী তারা দুঠ করে নিষেছে। এদিকে মুঙ্গের ওদিকে রাজমহল থেকে নবাবী ফৌজ তাদের পেছন নিম্নে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। তারাও পথে ঘাটে সন্ন্যাসীদের অকারণ গ্রেপ্তার করে জুলুমবাজি চালাচ্ছে। মঠগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি পড়েছে। ওদিকে ঘিরিয়ার কাছে তাঁদের মূল মঠ তল্লাশি করে নবাবী ফৌচ্চ প্রায় দখল করে রেপেছে। এ সময় পথে বের হওয়ার বিপদ আছে। এবং বাশরীওয়ালীও বের হতে দের নি। কিন্তু এখানে ধরা পড়লে বাশরীওয়ালীয় বিপদ আছে। সেই স্থতেই আজ বাশরীওয়ালী দীর্ঘ অবগুঠনে নিজেকে আবৃত করে মাধবানন্দের সঙ্গে কথা বলতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দশ দিন ধরে বাশরীওরালীর অন্তিত্ব তার ব্যক্তিসত্তার আত্মাদ প্রতিমূহর্তেই গ্রহণ করেছেন—তারই চিকিৎসা, তারই শুশ্রাষা, তারই সেবা, তারই হাতের পথ্য পেরেছেন; তার কঠম্বর শুনেছেন, হাসি শুনেছেন, গান শুনেছেন, তার নাচের নুপুরধ্বনি শুনে গভীর রাত্রে হেসেছেন, সাধনার কত বিচিত্র ধারাই মাত্র বের করেছে! জীবনের অপব্যয়কে দানখাতে খরচ লিখলেই আত্মানি থেকে অব্যাহতি। কিন্তু না। ত' ভেবেও নিজে মানিবোধ করেছেন। ওই গানের মধ্যে নাচের মধ্যে একটা কিছু আছে। সঙ্গীতের মাধুর্য ছাড়াও আরও কিছু। নইলে গান ভনে কখন এক সমর অমুভব করেছেন যে, তাঁর চোখে জল এসেছে—এমন হবে কেন? কিছু আছে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সামনে পেয়েও করেন নি। নিত্যই দিনে রাজে ছবার এমনই নীলাম্বরী অবগুঠনে নিজেকে ঢেকে বাঁশরীওয়ালী প্যাবে এসে তাঁকে দেখে নীরবে চলে গেছেন। কপালে কোমল হাতের তালুর স্পর্ণ এবং মণিবছে তার চাঁপার কলির মত আঙ্লগুলির স্পর্শ অম্বত্তব করেছেন। তাকিয়েও দেখেছেন তার গঠন ও সৌনর্ধ। অনার্ত হটি হাতের স্বমাও দেখেছেন।

শীবিশার বোধ করেছেন এই ভেবে যে, এই স্থকুমার তরুণ বয়সে এ সাধনা শান্তব হল কী করে? এ তো যেন কিশোরী কুমারী! অবশ্র প্রতিবারই দেখেছেন কুহেলির মত আলোর মধ্যে। ভোরবেলা স্র্যোদয়ের পূর্বে একটি কোমল শীতল স্পর্শে তার নিলাভঙ্গ হয়। প্রতিদিনই তিনি চমকে উঠেছেন। মনে হয়েছে, তার জীবনের সেই নান্তিত্বের এ যেন অন্তিরূপ। নীলাম্বরীর দীর্ঘ অবগুঠনাবৃতা স্বকুমার নারীমৃতিটি মাথার শিয়রে দাড়িয়ে কপালে হাত রেখে উত্তাপ অন্তত্তব করেছে। সেই স্বল্প আলোকে নীলাম্বরী খনকুঞ্ছাম্বরী বলে ভ্রম হয়েছে।

প্রথম ত্তিন দিন সচকিতভাবে প্রশ্ন করেছেন, কে ? তুমি কে ? অবগুঠনারতা নীরব থেকেছে, অচঞ্চল থেকেছে। পাশ থেকে উত্তর দিয়েছে গোকুলানন : বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী পর্ভু।

ই্যা। তিনি সভ-স্নাতার কেশগন্ধ পেয়েছেন তথন। স্পর্শের শীতলতার শাধুর্বের অর্থ অমুভব করেছেন।

' শেষ দিন হাত চেপে ধরে ত্বার প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কে? গোকুলানন্দের উত্তর শোনার পর আবারও প্রশ্ন করেছিলেন, বল তুমি কে?

মৃতি তেমনি স্থির অচঞ্চল ছিল।

গোকুলানন্দ তাঁকে নাড়া দিয়ে বলেছিল, গুরুজী! বোধ করি সে তাঁকে নিস্তাঘোর-বিভ্রাস্ত ভেবেছিল। তিনি গোকুলানন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই সে মনে করিরে দিয়েছিল, প্যারেজী—বাঁশরীওয়ালী প্যারে আপনার নাড়ী দেখবেন।

তিনি আবার একবার ওই ক্লফাবগুঠনারতা মৃতির দিকে তাকিয়ে দেখে ছাত ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর পর আর কোনদিন কোনও প্রশ্ন করেন নি।
মনের প্রশ্নের নির্ত্তি হয় নি, কিছ্ক নিজেকে সংযত করেছেন। এক-একদিন জ্রোধ হয়েছে, অবগুঠনপ্রাস্ত চেপে ধরে এক মৃহুর্তে টেনে খুলে দিতে ইছা ছয়েছে, কিছ্ক আত্মসম্বরণ করেছেন। সদ্ধার দেবকর্মে যাবার আগে আবার আসে দেখে যায় বাশরীওয়ালীজী। তথন আসে ভজনের আসরের সক্ষায় দেকে। সয়য় কেশ-প্রসাধনে আমলকি ও মসলার গছ্ক পেয়েছেন। হাতের ক্রেজেতা অস্ত্তব করেছেন।

তথন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়েছে—কী পেয়েছ ? কিন্তু তাও করেন নি । সন্ধ্যায় তিনিও থাকেন নীরব স্থির। বোধ করি ওই সন্ধে একটি ছুটি কুঞ্চন-রেখা ফুটে ওঠে ললাটে, কখনও বা একটু ক্ষীণ হাসির রেখা।

আজ বাঁশরীওয়ালী প্যাবেজী নিজেই কথা বলবেন অভিপ্রায় জানিয়েছেন।
আজ সকালেই গোকুলানন্দ সংবাদ এনেছিল, নবানী ফৌজ ত্রিকৃট পাহাজ্ব
থেকে মান্দারের পথে রওনা হয়েছে। সন্ন্যাসীর দল না-কি বনে বনে এই
দিকে এসেছে। ছ্থানা গ্রামে তারা জুলুমবাজি করে সিধা আদায় করেছে—
এ খবরের স্থতার নাগাল পেয়েছে নবানী ফৌজ। মাধবানন্দ গোকুলানন্দকে
তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন, খবর করে। গোকুলানন্দ, দলের খবর করে।
আমি আজই রাত্রে এ আশ্রম ত্যাগ করব। দলের খবর মেলে ভাল, নামেলে আমি পথে বের হয়ে পড়ব। প্যাবেজীর আশ্রমে নবানী ফৌজের
হাতে ধরা পড়ে তাকে বিপন্ন করতে পারব না। গোকুলানন্দ চলে
গোছে। সন্ধ্যার প্যাবেজীর লোক এসে বললে, প্যারেজী আপনার সংশ্বে

- আমার সঙ্গে ?
- হাা। আপনার অমুমতি চাইছেন তিনি।
- কিন্তু কার যে মানা আছে শুনেছি। পরক্ষণেই ভূক কুঁচকে উঠন তাঁর, জিজ্ঞাসা করলেন, কার মানা? এ প্রশ্নটা আজ হঠাৎ যেন জেগে উঠল তাঁর মনে। দরজার মুখেই তথন কৃষ্ণ-অবন্তুঠনারতা মেয়েট চুকছিল; মাধবানন্দের কথা শেষ হতেই সে ঘবের মেঝেতে এসে দাড়িয়ে মৃত্ কর্ছে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলে, কার মানা?

কথা হচ্ছিল দেহাতি হিন্দীতে।

মাধবানন্দ বললেন, হাঁ। কার মানা? বাশরী ভয়ালী প্যারেজী তো সকলের সামনেই মুথ তুলে বের হন, কথা বলেন। বিগ্রহের দরবারে হাজার লোকের সামনে ভজন গান করেন, নাচেন, তবে আমার সামনে মানা কেন? কার মানা? রাধাগোবিনজীর? স্বপ্ন?

অবগুঠনবতীর মাথাটি 'না'র ভঙ্গিতে ছলে উঠক। 'না' অর্থাৎ তাঁদের মানা নয়।

—ভবে ?

- —আমার স্থামের।
- শাম ? গোবিনজী ?
- ি—না। গোবিনজী ভগবান আম আমার আম। আমার গোসাঁই। আমার গুরু।
 - —কিন্তু কেন ?
- আমার মুথ দেখলে আপনার পাপ হবে।
- —তোমার মুখ দেখলে আমার পাপ হবে ? বাঁশরী ওয়ালী প্যারেজী, তোমার সেবার চিকিংসার আশ্রের আমি বেঁচেছি। তুমি না-থাকলে আমাকে নিশ্চিত মরতে হত। তোমার ভক্তি-গদগদ কঠের গান শুনেছি, শুনে কেঁদেছি। তোমার পায়ের নৃপুরের শব্দে আবেশ এসেছে। চোথে দেখি নি, কিন্তু মনে মনে কল্পনা করতে পারি, তার মধ্যে তোমার সে আত্মনিবেদন। আমি শুনেছি এখানকার লোকে ভোমাকে দেবী মনে করে। তবে তোমার মুখ দেখলে আমার পাপ হবে কেন ?
- —সে কথা থাক্ গোসাঁইজী, ভামের দেখা পেলে আমি ভগাব। তবে আমার ভর লাগে গোসাঁইজী কেন জান? কারণ লোকে আমাকে বলে প্যারী, আমার মধ্যে তারা নাকি দেখে রাধাভাবের ছারা; আমার সাধনও সেই রাধাভাবের। তুমি, গোসাঁইজী, মন্ত বড় যোগী, ভারী সাধনা তোমার। তোমার রাগ হলে আগুন জলে যায়; তোমার দিকে কেউ অবুঝ যদি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকার তো আপন কল্যে ডুবে দম বন্ধ হরে মরে। তুমি জানী পণ্ডিত, তোমার ছক্মে রাধারাণীজীকে বনবাসে পাঠিরেছ; গোসাঁই, শামাকে দেখে যদি তোমার রাগ হয়। আমি যে ভন্ম হয়ে থাব মহারাজ।

छक रुख बरेलन माध्यानमञ्जी।

বাঁশরীওয়ালী বললে, ও কথা যাক গোসাঁইজী, যে কথা বলতে আমার
আমের হকুম আমি আধা লজ্মন করেছি, তাই বলি—

া বাধা দিরে মাধবানন বললেন, না। তার আগে আর কয়টা প্রশ্ন করব। লোকে বলে আমারও বিশাস, তুমি সিদ্ধি পেয়েছ।

— সিদ্ধি কাকে বলে জানি না গোসাঁই, তবে আনন্দ পেরেছি। ছু:বে

যথন কাঁদি তথনও অথ পাই। সেও অথ হয়ে ওঠে। সে যদি সিদ্ধি হয় তো পেয়েছি।

- —তুমি ভবিশ্বং দেখতে পাও ?
- —ভাও জানি না গোসাঁই। আমি তো কখনও দেখতে চাই নি।
- --ভগবানের দর্শন ?
- —না গোসাঁই। ভগবানের দর্শন তো আমি মাঙি নাই, আমি চিরদিন চেয়েছি আমার শ্রাম—আমার গুরুর দর্শন। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে গোসাঁই—ষোল বছর। তথন আমার বয়স যোল। আজ আমার বয়স বজিশ। যোল বরিষ আজ আমার যৌবন-রূপের পূর্ণকুন্ত কাঁথে নিয়ে ফিরছি।
- —দেহকামনা নিয়ে তোমার সাধনা প্যারেজী? বিশ্বিত হলেন মাধবানন্দ। এ হতভাগিনী বলে কী? এই নিষ্ঠা যার, তাকে দীকা দিলে কে?

বাঁশরী ওয়ালী হাতজোড় করে বললে, দেহের মধ্যেই যে বেঁচে থাকা।
গোলাঁই। দেহ আমার মূল, পরমাত্মা আমার ফুল। মূলের তিরাস না
মিটলে ফুল ফুটবে কেন মহারাজ? ফুল ফুটলে ভ্রমর আসে গুরু। ভ্রমর
ভগবান। তথন ফল হর। তুমি জ্ঞানী। আমি মূর্থ্ দেহাতী ছোকরী।
অপরাধ হলে নিও না। সংসারে যে ভাল কথা বলে সেই আমার আপনজন,
যাকে বুকে ধরে বুক জুড়ার সেই আমার পরমধন। ধরম কি তা জানি
না গোলাঁই, যে করমে মনে আহলাদ, দেহে আহলাদ, তুমি খুলী তারা
খুলী, তাই আমার ধরম।

অভিভূত হয়ে শুনছিলেন মাধবানন। কথাগুলি ন্তন নয়, এ কথা
আনেকবার আনেকজনের কাছে শুনেছেন, ভণ্ড শতিতের মুথে মুগন্থ বুলির
মত শুনেছেন, কৃট নান্তিকের মুখে তর্কের বক্র ছন্দে শুনেছেন, কিন্তু এমন
বিশাসের সঙ্গে পবিত্র জীবননিপ্তার ক্ষিপাথরে-যাচাই-করা সোনার মত
পরিচর নিরে কথনও কথাগুলি তাঁর সামনে ফুটে ওঠে নি। দেখতে
ইচ্ছে হচ্ছে ওর মুখ—মুখের ছবি।

বাশরী ওরালী একটু থেমেছিল, আবার বললে, আপনি পণ্ডিত, আপনার ধরম আলাদা; কিন্তু গোলাইজী, ধরম আপনার যাই হোক, আপনি ওই স্থন্মর দেহগানি ধরেছেন বলেই তো দে ধরমকে আপনি ধরতে পেরেছেন, আর ধরমও আপনাকে ধরে ধ্বজা তুলেছে। দেহের উপর রাগ কেন গোলাই? সে তো নিজের উপরেই রাগ করা গো! দেহের উপর রাগ করে মরা তো সোজা, কিন্তু তথন দাঁড়াই কোথা? কোথায় মাটি? তিয়াদ মেটে কিনে? কোথায় জল? মাটি নাই, জল নাই, চাঁদস্বয় নাই—

চিৎকার করে উঠলেন মাধবানন। যেন চোখের সম্মুখে সেই নান্ডিছের ক্ষপ। চিৎকার করে উঠলেন, কে তুমি ? কে ? কে ?

দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়ালেন তিনি। ওই অবগুঠন খুলে দেবেন।

হাতজোড় করে পিছিয়ে গেল বাঁশরীওয়ালী: না মহারাজ। তারপরই বললে, আমি কহুর করেছি গোসাঁইজী। আপনার সঙ্গে ধরমের তকরার করেছি। আপনি সিদ্ধপুরুষ, কংসারির সঙ্গে কথা হয় আপনার। আমার মুখ দেখবেন না। এ মুখ দেখে যদি আপনার মুখ অপ্রসন্ন হয়, তবে লক্ষায় যে মরে যাব আমি।

ঠিক এই মূহুর্তটিতেই কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। আরতির সমন্ন হয়েছে। বাঁশরীওয়ালী একটু চঞ্চল হয়ে উঠল; বললে, এ সব কথা থাক্ মহারাজ; আমি দেহাতী মেরে, কিছুই জানি না। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন অহন্ধার হল আমার, আবোল-তাবোল বকেই যাচিছ। প্রাণের আকুলি-বিকুলিতে আদেশ আধা লজ্মন করে যে কথা বলতে এসেছি, তাই বলা হয় নি। আজ যে আমার ডর লাগছে গোসাঁই। নবাবী ফৌজ শুনছি—

মাধবানন্দ চঞ্চল হলেন না, ष्यप्तक्षण ভাবেই বললেন, সে খবর আমি পোয়েছি পারেজী।

— আপনি গোকুলানন্দকে পাঠিয়েছিলেন আপনার শিশুদের সন্ধানে। একজন ভিন গাঁয়ের লোক তাকে ধরিয়ে দিয়েছে নবাবী ফোঁজের ভিত্তি। থবর এসেছে।

—গোকুলানন্দ ধরা পড়েছে? চিস্তাকুল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন

— আমাকে না বলে কেন পাঠালেন মহারাক্ত ? আপনার শিয়রা ওদিকে গাঁরে জুলুমবাজি করছে। পরশু এক গাঁও হাতী দিয়ে ভাঙিরে দিয়েছে। এ লোক সেই গাঁওয়ের। এখন আপনাকে আমি বাঁচাই কী করে, সেই ভাবনার আমি ছুটে এসেছি।

ভাবনা তুমি করো না প্যারেজী। ভয় নাই। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। তোমার সেবা, তোমার স্নেহ, তোমার দেওয়া আনন্দের মন্ত আনন্দ আমার জীবনে কথনও পাই নি। অনেক তাপতা করেছি প্যারেজী, দিন্ধি আমি পাই নি—শুধু কেঁদেছি, ত্বংগ ভোগ করেছি, অনেক ভেবেছি, কিন্তু এ স্থাদ মেলে নি। আমার জন্মে তোমার বিপদ ঘটতে দেব না, আমি চলে যাব।

—রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী! কাতর স্ববে যেন কেঁদে উঠন বাঁশরী ওয়ালী: না, না, না গোসাঁই, না। আমার বিপদের কথা আমি ভাবি নি গোসাঁই। আপনার জন্তে আমাব বিপদ ঘটলে সেই বিপদেই ভগবান আসবেন, আমার সিদ্ধি হবে। আমার বিপদের জন্তে নয় গোসাঁই; কথাটা আপনাকে জানাতে এসেছি। আমি মনে মনে জেনেছি, আপনি চলে যাবার মতলব করেছেন। তাই হাতজোড করে আপনার চবণ ধরে—

বাঁশরী ওয়ালী যেন ভেঙে পড়ে গেল, নতজান্ত হয়ে বদে তাঁর পা হটি জড়িয়ে ধরে আবেগরুদ্ধ কঠে বললে, এমন কাজ আপনি করবেন না। আপনি বেরবেন না। আপনি আমার পরম ধন।

বিষণ্ণ ক্লান্ত কঠে উপরের দিকে চেয়ে মাধবানন্দ বললেন, বাঁশরী ওয়ালী, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি যাব না। বলেই তিনি ব্যবেন, সেই বিষণ্ণ তায় আবার যেন ভূবে যাচ্ছেন।

কিন্তু সে কথা তাঁর সম্পূর্ণ হল না, মেঘের ডাকের মতই আক্ষিকভাবে একটা প্রচণ্ড গর্জনধ্বনি যেন কেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার লোকের চিৎকার একসঙ্গে।

মৃহতে জলের-স্রোতের-টানে-পড়ে-বেঁকে-যাওরা বেতের লতা যেন স্রোতের টান থেকে মৃক্ত হরে ছিটকে দোজা হয়ে দীড়াল; দীর্গ নীলাবরীর অবগুঠনখানা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে বাঁশরীওয়ালী ছুটে বেরিয়ে পেল, ্রিবিটের বেনটো হলে উঠল। অপরূপ কোমল লাবণ্যের চকিত একটা বলক থেলে গেল; দরজার মূথে বারেকের জন্ত মূথ ফিরিয়ে লে বললে, আমি আসছি।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। বাইরে চিৎকার উঠছে; হয়তো নবাবী কৌন্দের কিংবা সন্মাসী দলের। কিন্তু সে প্রশ্ন তাঁর মনে ছিল না। ছিল একটি প্রশ্ন—

—কে ? ও কে ? আকাশপাতালের অসীম শৃত্ততায় হারানো একটি ভারা আৰু অক্সাং জলে উঠেছে।

— বন্ধ করো। ফটক সব বন্ধ করো। নাকাড়ার ঘা মারো।—নীচে কেউ আদেশ দিচছে।

মাধবনানন্দ উঠে দাড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন : কে ?

কতক্ষণ কে জানে? মাধবানন্দ ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

তীবনের অন্ধকার বিষয়তার যবনিকার যেন আগুন লেগেছে। ধোঁয়াছে।

তালে উঠবে। বাইরের কোলাহল কানে গিয়েও যাছে না। দরজার ওপারে

অন্ধকার পার হরে ক্রতপদে ঘরে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল

বাঁশরীওয়ালী প্যারে। অবগুঠনহীন মৃথ, ওড়নাথানা মেঝের উপর পড়ে আছে।

হাঁশাছে সে। সন্ধ্যার আরতির সাজসজ্জা এই অল্পকালের মধ্যে বিশ্রম্ভ

হরে গেছে। ভারী ভারী ফটক ছটো বন্ধ করিয়ে উঠানের চারিপাশের ঘন

আমবাগানের তল দিয়ে ছটোছুটি করবার সময় বাধার জ্ঞান ছিল না। মাধার

চুল উকােখ্কো হয়ে গেছে, সিঁথির ধুকধুকিটা একপাশে এসে পড়েছে।

কাচুলির কাঁধটা ছিঁড়ে গেছে। মুধথানি রাঙা হয়ে উঠেছে, চোথ ছটি

ত্বাভাবিক

মাধবানন্দের চোধ হটিও বিক্ষারিত হরে উঠেছে: কে ?

—আমি মোহিনী! ওগো গোসাঁই, আমি মোহিনী। তুমি তোমার চরবি ছাড়িরে নিয়েছিলে, তোমার চরণের ঘারে আমার ঠোঁট কেটে গিয়েছিল; এই বেখ সেই দাগ। তুমি মুখ দেখাতে বারণ করেছিলে। কী করব গোসাঁই—আমার ভাম—আমি সাধ করে দেখাই নি। পাশের গাঁরে নবাবী ফৌজ

আনেছে, সীয়ের ওপাশে তোমার সন্ন্যাসীর দল। আমার ছঁশ ছিল না।
আমার অপরাধ নিয়ো না গোসাঁই। তোমার সেবা করেছি; আমার
সাধন সফল হরেছে। আমার সাধনের শিক্ষাগুরু বলেছিলেন, তোর রূপবৌবনের পূর্ণকুন্ত কাঁথে নিয়ে রাধান্তামের ভজন গেয়ে পথ চল্—তাকে
পাবি, ওই কুন্তের জলে তার অভিষেক হবে, আমার আশীর্বাদ রইল।
গোসাঁই, আমি আমার কুন্তের জল তোমার পায়ে তেলে দিয়ে ধয় হয়েছি।
ভূমি রেগো না গোসাঁই।

হেমন্তের রাস-পূর্ণিমার আগের রাত্রি আর প্রাবণের ঝুলন-পূর্ণিমার আগের রাত্রি যেন এক হয়ে গেছে। যোল বছর আগের সেই গড় জঙ্গলের রাত্রি বেন ফিরে এসেছে। মেঘ আকাশে নেই; কিন্তু মাধবানন্দের দেহে মনে যোল বছর ধরে যে গুমটের মত আচ্ছন্নতা নিরস্তর ঘনিয়ে ঘনিয়ে ওঠে, সেই আচ্ছন্নতাকে আজ বিদীর্ণ করে যেন বিহাৎ বিক্রিত হয়ে বর্ষণ নেমেছে, ঝড় উঠেছে; ঝড়ে ঝাপটায় বর্ষণে বিহাতে মাতামাতি লেগেছে জীবনে।

আজ জীবন এই বর্ষণে ধুয়ে ধুয়ে অমলিন অবারিত সত্যে প্রকাশিত হচছে। আজীবন নিবারিত জীবনসত্যের এ কী মহাপ্রকাশ! আঃ! জীবনের সেই মর্মান্তিক নান্তিত আনন্দে আশার হথে চৃংথে সাধনার কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃফাবগুঠন-খসা মোহিনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ধর প্র করে কাঁপছে। তার বোল বছর ধরে কাঁথে-বওরা রূপযৌবনের পূর্ণকৃত্ত থেকে অমৃত উথলে উঠছে। সেবার অমৃত, স্নেহের অমৃত, সান্ধনার অমৃত, শুক্রবার অমৃত অঞ্চলি অঞ্চলি পান করেছেন তিনি। আজ মৃত্যু-কোলাহ হলের সন্মুথে এই প্রাণ দিয়ে থিরে রাখার আকৃতির মধ্যে সে অমৃত উথলে পড়ে বুকে প্লাবন ত্লেছে। আজ বিশ্বস্থাতে মৃত্যুর মধ্যেও তিনি একা নন। এ কী আনন্দ!

মাধবানন্দের চোথ থেকে জলের ধারা নেমে এল। বলতে চাইলেন—
ভূমি রাধা, ভূমি রাধা, ভূমি রাধা। কিন্তু পারলেন না।

কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হরে গেছে। বুকের ভিতর হৃৎপিও মহা নাচনে নাচছে। দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি কোষ-মুখ থেকে উল্লাসের কলোল প্রস্রবাবে ধারার মৃত বেরিয়ে আসছে। সৃষ্টির আদিপ্রাস্থের অনাবিষ্ণুত ক্ষার-মুখ থেকে জীবন-স্রোতের নির্গমন কলরোল। তার ফেনিল আবর্তে আনন্দের জ্যোতির ছটার প্রতিফলনে হাজার ইন্দ্রধন্ত ফুটে উঠছে। তাঁকে যে সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে কামনা করেছে সে তাঁর সম্মুখে; তিনি যাকে অবচেতনে মনের কোণে কোণে খুঁজেছেন—পান নি, সে আজ বাইরে এসে বিচিত্র ভাবে দাড়িয়েছে।

মোহিনী তার সামনে দাঁড়িরে আছে পূর্ণকুন্ত কাঁথে নিয়ে, পথের শেষ প্রান্তে এসে সে আর পারছে না। তার চোথে বিচিত্র দৃষ্টি। মুখে শোণিতোচ্ছাসের প্রতিচ্ছটা। সে আত্মবিহ্বলা। বিপ্রস্ত বেশবাস। তার বক্ষাবরণ কাঁথের কাছটার ছিঁড়ে গিয়ে সে অর্ধ অনাবৃত। অতিশুল্রনবনীত তমু-লাবণ্য প্রদীপের আলোয় গলে গলে তাঁর জীবন হোমের শিথার সন্মুখে মৃতধারার আছতির মত উন্নত হরে রয়েছে।

অকল্য আনন্দে অসঙ্কোচ বাহু বিস্তার করে প্রার্থীর মত নতজাত হয়ে বসলেন, এতক্ষণে কথা বের হল, তুমি রাধা—আমার রাধা!

মুহুর্তে উল্লাদে আত্মহারা হয়ে ছুটে এদে ঝাঁপিরে পড়ল মোহিনী।

পূর্ণকুম্ব আছাড় খেয়ে পড়ল বিগ্রহের মাথার। এক মৃহুর্তে প্লাবনে সুর্বান্ধ অভিষ্ঠিক করে ছড়িরে পড়ল।

মোহিনী বললে, গোসাঁই, বড় ছাথ না হলে সাধনে মন বসে না। ছাথের আসনে না বসলে রাধারাণীর দয়া হর না। ঠোঁটটা কেটে গেল, তুমি বললে—ভোর হলেই চলে যেয়ো, তোমার মুখ যেন না দেখতে হয়।

—মোহিনী!

া না, মোহিনীর মৃথ তো এ নয়। এ মৃথ বাধাবাণীর স্নানজলে ধুয়ে ধুয়ে অক্ত মৃথ—ভাম।

— তু:থে অভিমানে সেই তথনই বেরিব্রে গেলাম। বনের পথ যে দিকে যার সেই দিকে চলেছিলাম। কেমন করে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এসেইছুলাম জানি না। তারপর পড়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে। জ্ঞান ব্যন্ত তথন মাথার কাছে দেখলাম, বড় স্থলার এক বৃড়ী মাকে।
জ্ঞামাকে চোধ মেলে চাইতে দেখে শুধু বললে, বেটা! জামার মনে হল,

পোনাই, আমার সব হারিয়েছিল, আমি সব পেলাম। সেই বৃড়ী মান্তের
এই আশ্রম। সে ছিল কাশীর মস্ত বড় বাঈজী। সন্তান ছিল একটি,
তাকে হারিয়ে মান্দারে গোপালের সাধনার সন্ন্যাসিনী হয়ে ভন্তন করত।
বাদশাহী সড়ক ধরে যাচ্ছিল বিষ্ণুপুরে হরিনামের বেগার-লেনেওলা রাজা
হর্জন সিংহের বাড়ি মদনমোহনের আভিনায় ঝুলনে ভন্তন গাইতে।
আমার ভাগ্য গোসাই, উটের গাড়ির উপর থেকে ভন্তনওরাগী নন্দরাণী
মা আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়েছিল যশোদার মত। সে আমাকে
গান শিখিয়ে নাচ শিখিয়ে বলেছিল—এই তোর সাধন। বাঁশের বাশী
বাজাতে শিখেছিলাম, তাই বাশী হাতে দিরে বলেছিল—তুই বাঁশরীওয়ালী
প্যারী। মন্তর না, তন্তর না, ধরম না—এই মন্তর, এই ধরম। ভগ্নান
চাস না, মিলবে না। মান্থব যাকে চাস তাকে চাইবি। পাস না-পাস
তার জন্ম প্রাণণাত করবি, মরবি, তথন আপনি আসবে ভগ্বান।
আমি পেয়েছি গোসাঁই।

মাধবানন্দ বাক্যহারা। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার মৃথের দিকে চেক্লে আছেন।

বাইরে কোলাহল বাড়ছে।

হেমস্ত-শুক্লা-চতুর্দশীর জ্যোৎস্নাকে নিম্প্রভ করে দিগল্তে আকাশে আগুনের ছটা ফুটেছে। আগুন লেগেছে। গ্রাম পুড়ছে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা।

আকাশে রাস-পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

কোলাহল উঠছে বাশরীওরালী প্যারীর আশ্রমে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসছে লোক। বাশরীওরালী বৃন্দাবন যাছে। সাধন পূর্ণ হয়েছে। সাধ্র বেশে শ্বরং শ্রাম এসেছিলেন নিতে। মন্দিরের সামনে রাশি-রাশি-ফুলে-ঢাকা ছটি শব।

वानदी अश्रानी भगात आंत्र माध्यानम ।

উদয়-মৃহুর্তে মারা গেছেন মাধবানন্দ; তাঁর দেহের উপর পড়ে দেহত্যাপ করেছে বাঁশরীওয়ালী। মাধবানন্দের দেহখানা দলিত পিট মাংস্পিতে শ্রিষ্ট হয়েছে। তাঁর নিজের দলের হাতী তাঁকে পায়ে দলে দিয়ে। শিরেছে।

ষুদ্ধোন্মত হাতীর সামনে গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাধবানন।

সারারাত্তি এই গ্রামের ও-প্রাস্তে নবাবী ফৌজ আর সন্মাসীর মলে লড়াই হয়েছে। গোকুলানন্দকে গ্রেপ্তারের সংবাদ সন্মাসীদের কাছে পৌছেছিল, গ্রামের লোক তাকে ধরিরে দিয়েছে। তারা কঠিন আক্রোপে ফিরেছিল, গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ওদিকে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল নবাবী ফৌজ। তু দলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলেছে শেষরাত্তি পর্যন্ত পর্যন্ত নবাবী ফৌজের কাছে হটে গিয়ে সন্মাসীরা মান্দার পাহাড়ের কোলে বনের দিকে পালাবার পথে সন্মুথের গ্রাম লুঠে জ্ঞালিয়ে হাতী দিয়ে ভূমিসাৎ করে চলে যাছিল। গ্রামবাসীর আর্তনাদে আর থাকতে পারেন নি মাধবানন্দ। তিনি বেরিয়ে এসে পথের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন জলোয়ার হাতে। যুদ্ধোন্মন্ত হাতী ছিল সর্বাগ্রে। সে শুঁড় দিয়ে চাল টেনে নামাছিল; মাথা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল দেওয়াল। আবার ছুটছিল সন্মুথে। সে রূপ ভীষণ রূপ! হাতীর উপর বসে চিৎকার করছিল কেশবানন্দ: হরি-হর! হরি-হর!

পথের উপর লাফ দিরে পড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন মাধবানন্দ: না। না। রোখো। কেশবানন্দ!

সে ভাক বোধ হয় শুনতে পায় নি কেশবানন্দ। পাগলা হাতী শুঁড় ছুলিয়ে ভয়ানক চিংকার করে ছুটে এদেছিল। সে মানবে কেন? মাধবানন্দ এক পাশে সরে গিয়ে সবলে ভলোয়ারের আঘাত করেছিলেন তার শুঁড়ে। প্রচণ্ড চিংকার করে হাতী ঘ্র্বার বেগে দলের গুরুকে পায়ে দলে সম্ম্বণপথে ছুটে চলে গেছে। সম্মাসীর দল শেষ মূহুর্তে তাঁকে চিনেছিল, কিছে দাঁড়াবার তাদের উপায় ছিল না। পিছনে ছুটে আসছে হয়তো নবাবী ফৌজ।

আপ্রমের দরজার দাঁড়িরে ছিল, বাঁশরীওরালী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল। স্থাতীটা ছুটে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে এসে মাধবানন্দের দলিত ক্রেছের উপর আছাড় থেয়ে পড়েছিল। তারণর আর ওঠেনি।

পিছনে আসছিল উন্মন্ত গ্রামের লোক। নবাবী ফৌজ ক্লাল্ড। তারা বিশ্রাম নিচ্ছে। গ্রামের লোক পিছু নিছেছিল সন্ন্যাসীদের। বিদ্ধ বাঁশরীওয়ালীর বিচিত্র মৃত্যু দেখে তারা থমকে দাঁড়িরেছিল।

বাঁশরীওয়ালী প্যারীর সাধন পূর্ণ হয়েছে রাস-পূর্ণিমার প্রভাতে। খ্রাফ তাকে নিতে এসেছিল সম্ন্যাসীর বেশে। খ্রাম হাতীকে বধ করে বৃন্ধাবন ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশরীওয়ালী প্যারী।

হাতীটা গ্রামপ্রান্তে গিয়ে পড়েছে। সন্ন্যাসীরা পারদল পালিয়েছে উত্তর মুখে।

পালাক। পালাতে দাও তাদের। গাঁয়ের লোকেরা, এস। ফুল আন, ধূপ আন, চন্দন আন, সোনা আন, রূপা আন, বেনার্মী শাড়ি আন, ভারে ভারে আন গঙ্গাজল। প্রণাম কর।

শ্রামের সঙ্গে বাঁশরীওয়ালী প্যারে যাচ্ছেন বৃন্ধাবন।
ও সে গোপন মনের গুপ্ত বৃন্ধাবন।
হোক না লক্ষ কুরুক্ষেত্র
বৃন্ধাবনে অহ-রহ যুগল-মিলন।
লোকে আন্ধ্রণ গান গায়। গায় ওই বাউলের।